Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্ত্র পরিচয়

সত্যবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/98

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1
No. 1/98
Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

10.12.78				
21/1/79				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্ত্র-পরিচয়

LIBRARY
No........ 1/98
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

সত্যবান

মহেশ লাইব্রেরী
পুস্তক [illegible]
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

লিপিকা
৩০।১, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া, ১৩৭৬

মূল্য ৭·০০ টাকা

লিপিকা, ৩০।১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও প্রিন্টস্মিথ, ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ উৎসর্গ ॥

জনক-জননীকে

—সত্যবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ লেখকের নিবেদন ॥

মৎপ্রণীত "বেদ-পরিচয়" পুস্তকখানি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক মহাশয়ের আগ্রহে বর্ত্তমান পুস্তকখানি সেই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'বেদ পরিচয়ে' যা ছিল আভাস মাত্র, এই পুস্তকে তারই বিস্তৃততর আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। সাধ্য আমার সীমিত। শুধু কোনো রকমে মনের সাধকে উপস্থাপিত করেছি সহৃদয় পাঠকদের সমীপে। তাঁদের কাছে আশা করি আরও উপদেশ ও নির্দ্দেশের, যাতে আমার এই সাধকে সার্থক করে তুলতে পাই। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সবায়ের সাহায্য ও সহানুভূতি ছাড়া কোনো একক মানুষের চেষ্টা সফল হয় না। এই পুস্তকখানিও তো বহুর সংসর্গে বহু চিন্তার আদানপ্রদানের ফলশ্রুতি। বাস্তবিকপক্ষে এ জগতে আমরা কেউ তো কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নই, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সর্বতোভাবে বিজড়িত।

আর বলে নিই, এ পুস্তকের পরিশিষ্ট দু'টির প্রথমটি, বর্ধমান থেকে প্রকাশিত 'বর্ধমান' পত্রিকায় আর দ্বিতীয়টি এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'মাতৃবাণী' পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল।

ইতিমধ্যে আমার অনুজপ্রতিম প্রকাশক শ্রীমান্ শান্তিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, যিনি "বেদ পরিচয়" প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি এই পুস্তকখানিও প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলেন। সেই উদ্যোগে সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এলেন, আমার অন্য এক অনুজতুল্য সুহৃৎ কবি শ্রীমান্ রাণা বসু। এঁদের দু'জনের অকুণ্ঠ সহযোগ ছাড়া এ পুস্তক এরই মধ্যে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এঁরা আমার এতই কাছের জন যে, এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতেও সংকোচ বোধ করি। তবু এ পুস্তক প্রকাশের ক্ষণে এঁদের কথা উল্লেখ না করে কি পারি? এঁরাই যে আমার এ আনন্দের প্রত্যক্ষ কারণ।

দেবীপক্ষ,
১৩৭৬ বাংলা সাল। } সত্যবাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
সূচনা	....	১
প্রথম পর্ব :		
শক্তিপূজার ও তন্ত্রমতের প্রাচীনতা ও বিস্তার	....	৫
দ্বিতীয় পর্ব :		
শক্তির উপলব্ধি ও দেহতত্ত্ব	....	২৩
তৃতীয় পর্ব :		
শক্তির রূপকল্পনা	....	৫৩
চতুর্থ পর্ব :		
শক্তিপূজা পদ্ধতি বা প্রাণতত্ত্ব	....	৭৯
পঞ্চম পর্ব :		
দেবী দুর্গা	....	১৩০
প্রথম পরিশিষ্ট :		
শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী পাঠের রহস্য	....	১৮১
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট :		
শ্রীশ্রীদশ মহাবিদ্যা রহস্য	....	১৮৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই লেখকের আর একখানি বই ঃ

বেদ-পরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্ত্র-পরিচয়

॥ সূচনা ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু
শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

—যে দেবী এই বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে শক্তিরূপে প্রকাশমান, তাঁকে নমস্কার তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

সেই শক্তিকে আমরা সবাই পেতে চাই। ঐ মন্ত্রটিতে সেই শক্তিকে পাঁচবার নমস্কার জানিয়েছেন দেবতারা; প্রথম তিনবার তিনি অর্থাৎ যিনি সম্মুখে উপস্থিত নেই তাঁর উদ্দেশে পরোক্ষ আর শেষ দু'বার যেন প্রত্যক্ষভাবে বা অপরোক্ষভাবে। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। এইভাবে কেন তাঁকে নমস্কার করতে হয়, তা জানতে হলে আমাদের তন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করা প্রয়োজন। কারণ তন্ত্রের মধ্যে দিয়েই শক্তিকে নিশ্চয় করে আমরা জানতে পাই। তন্ত্র আমাদের জানান যে, মাটি, জল ও আগুন এই তিন রূপে সেই শক্তি সাকার অথচ পরোক্ষ—আর বাতাস ও আকাশ অবস্থায় সেই শক্তি নিরাকার অথচ অপরোক্ষ। এ বড় বিচিত্র কথা।

॥ তন্ত্র কি ॥

তার আগে তন্ত্র কি তাই জানা দরকার। বিস্তারার্থক তন্ ধাতু থেকেই তন্ত্র শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এই তন্ত্রই মানুষের সম্মুখে পরম বিস্তার এনে দেয়, ওই শক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে।

আবার তনু অর্থাৎ শরীরকে ত্রাণ করে বলেই তন্ত্র নাম রটেছে। তবে কি এই শরীর আমাদের বাধা? তাই কি তা থেকে ত্রাণ পাওয়ার প্রয়োজন? হ্যাঁ—সত্যই শরীর আমাদের বিষম বাধা। এই শরীরে রোগ দেখা দেয়, এই শরীরের গণ্ডিতে থাকার ফলে প্রাণে জাগে সঙ্কোচ, আর মনে জাগে শোক। তাই যে বিস্তার আমরা নিত্য কামনা করি, তা লাভ করা সম্ভব হয় না, যদি শরীর থেকে ত্রাণ না পাই।

ত—১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্ত্রই আমাদের সবাইকে সেই শরীর সম্বন্ধে সচেতন করেন, জানিয়ে দেন কোথায় শরীরের বাধা আর কি করেই বা তা থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, শরীর যখন বাধা তখন তাকে ত্যাগ করলেই আমরা মুক্তি পাব। আসলে এই দেহ ধারণ করেই লাভ করতে হবে সেই পরম মুক্তি। তন্ত্রই সেই পথ প্রসারিত করে দেন। জানতে পাই আমরা কি শক্তি নিহিত আছে আমাদের মধ্যে। তখনি তো চোখ ফোটে আমাদের, দিব্য-চক্ষে দেখতে পাই আমরা পরস্পরের মধ্যে কি শক্তি নিহিত রয়েছে। সুযোগ পাই সবায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেশবার, সম্ভব হয়ে ওঠে বিশ্বমৈত্রী, যার স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি। তখনি তো পারি প্রাণ খুলে উচ্চারণ করতে সেই আপ্তবাক্য—

মাতা চ পার্বতী দেবী
পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ পিতৃভক্তাশ্চ
স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

—মা আমাদের দেবী পার্বতী, বাবা আমাদের দেব মহেশ্বর, যারাই পিতৃভক্ত তারা আমাদের বন্ধু আর স্বদেশ আমাদের তিন ভুবন।

॥ শক্তির কথা ॥

ঐ শক্তি শব্দটির প্রথম প্রয়োগ দেখতে পাই ঋগ্‌বেদের সপ্তম মণ্ডলে। সেখানে ঋষি বসিষ্ঠ বা বশিষ্ঠ বিংশসংখ্যক সূক্তে ইন্দ্রের স্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন—

বস্বী ষু তে জরিত্রে অস্তু শক্তিঃ॥

—শক্তি হোক তোমার স্তোতাদের অতি প্রশস্ত স্তুতি করবার।

পরবর্তীকালে ঐ বশিষ্ঠ গোত্রেরই একজন তন্ত্রমতকে প্রসারিত করে দেন। তাই বেদের মধ্যে ঐ যে বসিষ্ঠ ঋষি 'শক্তি' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তা সমধিক অর্থপূর্ণ। আবার ঐ ঋষির পুত্রের নামও শক্তি। কে জানে, শক্তিকে উপলব্ধি করে হয়তো ঐ বসিষ্ঠ ঋষি এমনি পরিতৃপ্তি লাভ করেন যে, তাঁর প্রথম সন্তানেরই নাম দেন—শক্তি। আমরা জানি ইষ্টদেবতার নাম বেশী উচ্চারণ করতে পাবার আশায় মা-বাপ ছেলে-মেয়ের নামকরণ করেন ইষ্ট দেবদেবীর নামেই। যাই হোক, তন্ত্র-সাধনার মূল লক্ষ্য যে শক্তি সাধনা তা আমরা কিছু জেনেছি এবং আরো জানতে পাব ক্রমশ।

আর এই শক্তি যে আমাদের এই শরীরের অভ্যন্তরেই বর্তমান—তার খবর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা প্রথম পাই অথর্ববেদে। সেখানে দশম কাণ্ডের দ্বিতীয় কাণ্ডিকায় নারায়ণ ঋষি বলেছেন—

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরয়োধ্যা।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥

—আটটি চাকা ও ন'টি দরজা লাগানো দুর্ভেদ্য পুরী হচ্ছে দেবতাদের, সেই স্বর্ণময় কোশ বা আধারে আছে জ্যোতিতে আবৃত স্বর্গের স্থান।

আবার ঐ অথর্ববেদের নবম কাণ্ডের সপ্তম কাণ্ডিকায় ব্রহ্মা ঋষি বলেছেন—

বৃহতীঃ কীকসাঃ॥—কীকস অর্থাৎ মেরুদণ্ড, বৃহতী অর্থাৎ ছত্রিশটি অক্ষরযুক্ত।

যাঁরা শারীরবিদ্যায় পারদর্শী তাঁরা জানেন মেরুদণ্ড ও করোটিতে ছত্রিশখানি হাড় বর্তমান। আমরা জানি, অথর্ববেদের উপবেদ হচ্ছে আয়ুর্বেদ। বাস্তবিক পক্ষে শরীর নিয়ে চর্চার একটি বিশেষ রীতির খবর পাই ঐ অথর্ববেদে। ক্রমে তারি পরিণতি দেখা দেয় আয়ুর্বেদে। একথা সূচনায় উল্লেখ করার কারণ এই যে—যতই আমরা অগ্রসর হবো, ততই দেখব যে, আয়ুর্বেদের তথা অথর্ববেদের সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঐ তন্ত্রের।

তন্ত্রকে বুঝতে হলে শুরু করতে হয় শক্তির পূজা কিভাবে হয়—তার থেকেই। এখন দেখা যাক ইতিহাস থেকে আমরা শক্তিপূজার কি ও কতদূর খবর পাই বা এ পূজা কোন দেশে কোন কালে চলতো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম পর্ব

॥ শক্তিপূজার ও তন্ত্রমতের প্রাচীনতা ও বিস্তার ॥

॥ বাংলায় শক্তিপূজা ॥

প্রথমেই বলি আমাদের বাংলা দেশের কথা। বাংলা দেশে শক্তিপূজার কথা বলতে গেলে উজ্জ্বল হয়ে জেগে ওঠে আমাদের চোখের সামনে দেবী দুর্গার অসুর-নাশিনী মূর্তি। এই শারদীয়া পূজা বা দুর্গোৎসব তো বাঙালীর জাতীয় উৎসব।

সেই পূজার মন্ত্র থেকে জানা যায় যে—ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালবোধন করে দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন। আবার ইন্দ্রও স্বর্গরাজ্য লাভ করেন তাঁর পূজা করে।

অবশ্য রামের দুর্গাপূজার উল্লেখ বাল্মীকি বা তুলসীদাস কৃত রামায়ণে নেই। তামিল ভাষায় যে কম্বনকৃত রামায়ণ আছে, তাতেও এ প্রসঙ্গ আছে বলে শুনি নি। তবে বেদের চর্চা নিবিষ্টভাবে করলে বেশ বোঝা যায় যে—ইন্দ্রই ছিলেন গণশক্তির প্রথম উদ্বোধনকারী। তবে সে কথা বেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাষায় বলা নেই, যদিও ইন্দ্রকে মরুত্বান্ বলা হয়। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে কবি কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের দেবীপূজার উল্লেখ সবিস্তারে করেছেন। তা ছাড়া কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ প্রভৃতি যে সব গ্রন্থে দুর্গাপূজার মন্ত্রগুলি আছে, তার থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে—রামচন্দ্রই শারদোৎসবের প্রথম প্রবর্তক। যদিও মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী সপ্তশতী থেকে পাই যে—রাজা সুরথ মেধস্ মুনির নির্দেশে বসন্তকালেই দেবীর পূজা করেন এবং তার ফলে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। সে সব কথা আমরা পরে আরো জানতে পাব—এখন বাংলা দেশের প্রচলিত পূজার কথাই বলি।

ইতিহাস থেকে পাই যে, মোগল সম্রাট সাজাহানের (মতান্তরে আকবরের) রাজত্বকাল থেকে বাংলার অন্যতম রাজা কংস-নারায়ণই প্রথম দুর্গোৎসবের প্রবর্তন করেন।

মনে পড়ে গেল, আমরা ছেলেবেলায় একটি ছড়া শিখেছিলাম। দুর্গাপ্রতিমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিসর্জনের সময় যখন ঢাক্, ঢোল, কাঁসি প্রভৃতি বাজতো—তার তালে তালে আমরাও তখন দলবেঁধে আবৃত্তি করতাম—

দাদা ঠাকুর বিসর্জন।
দাদা দর্পনারায়ণ॥

ছড়াটিতে ঐ যে দর্পনারায়ণ নামটি রয়েছে, তার সঙ্গে দুর্গোৎসবের প্রতিষ্ঠাতা কংসনারায়ণ নামটির সাদৃশ্য অত্যন্ত পরিস্ফুট। আমাদের দেশের পণ্ডিতজনেরা তো প্রায়ই বলেন যে—ঐ সব বহুপ্রচলিত ছড়াগুলির মধ্যে আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বহু ভগ্নাংশ ছড়িয়ে আছে। ছড়াগুলিকে তাই কেবল ছড়ামাত্র বলে উপেক্ষা করা যায় না।

আবার ইতিহাসে দেখি—রাজা নরসিংহ দর্পনারায়ণের সভায় এক সময়ে প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি যুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি "ব্যাড়ীভক্তিতরংগিণী" ও "দুর্গাভক্তিতরংগিণী" নামে দু'খানি পুঁথি তৈরি করেন। ব্যাড়ী বা ব্যালী হচ্ছে দেবী মনসার এক নাম। তখনকার দিনে দেবী মনসাও যে দেবী দশভুজা দুর্গার মতই মহাসমারোহে পূজিত হতেন—তা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। যাই হোক, কবি বিদ্যাপতি তো মোগলদের আমল আরম্ভ হবার বহু পূর্বে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং দেবী দুর্গার পূজা যে সেই পাঠানদের আমলেও চলতো—তাও জানা যাচ্ছে।

সেই পাঠান আমলের অন্যতম কবি তুলসীদাসও দেবী দুর্গার খবর ভাল করেই জানতেন। তার প্রমাণ পাই তাঁর লেখা—"রামচরিত মানস"-এর উত্তরকাণ্ড থেকে। সেখানে রামের বর্ণনা দিতে তিনি বলেছেন—

রাম কাম শত কোটি সুভগতনু।
দুর্গা কোটি অমিত অরি মর্দনু॥

—রামের দেহসৌন্দর্য শতকোটি কাম বা মদনের তুল্য, আর তাঁর শক্তি কোটি দুর্গার তুল্য অসংখ্য অরিকে বা অসুরকে মর্দিত করে।

স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মশায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস"-এ যা জানিয়েছেন, তাও বলি। চণ্ডীমঙ্গল পাঞ্চালীর ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

"প্রথম দুর্গাচণ্ডীর পূজা শিক্ষিত ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি পাইয়া মুসলমান-অধিকারের অনেক আগেই স্মার্তবিধিতে স্থান পাইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের মহাধর্মাধিকরণিক হলায়ুধ তাঁহার 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব'-এ চণ্ডীপূজা ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্যের মধ্যে ধরিয়াছিলেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, আজো বাংলার গ্রামে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির সামনেই যে আটচালা তৈরি হয় বৈঠকখানা হিসেবে, তার নাম চণ্ডীমণ্ডপ। বাংলার ওপর দিয়ে তো নানা ধর্ম-আন্দোলন চলে গিয়েছে তবু ঐ চণ্ডীমণ্ডপ নামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

অনেকেই মনে করেন আমাদের দেশে দুর্গোৎসব আরো প্রাচীনকাল থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশেষ করে দেবী বা শক্তিপূজা ভারতীয় সাধনার একটি অতি আদিম অঙ্গ, এ সম্বন্ধে তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাসী। স্বর্গত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী তাঁর রচিত "চিন্ময় বঙ্গ"—পুস্তকে বাংলার তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যায়ে লিখেছেন—

"কাহারও কাহারও মতে ষষ্ঠ্যাদিকল্প দুর্গাপূজা খৃস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর।"

মোট কথা, আমাদের দেশের অন্য সব দিকের ইতিহাস যেমন ছায়াচ্ছন্ন, এই দুর্গা-পূজার ইতিহাসও সেই অবস্থায় আছে। তাই এ পূজার ইতিহাস নতুন করে লেখার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সে ইতিহাস গড়ে তুলতে হবে পারিপার্শ্বিকের ভিত্তিতে, নানাস্থান থেকে সংগৃহীত তথ্যের টুকরো নিয়ে, যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের গাঁথুনীতে। এ চেষ্টার মস্ত সহায় আছে আমাদের বর্তমান—তাকেই বিশ্লেষণ করে আমরা সেই বিস্মৃত অতীতের দ্বার উদ্ঘাটন করতে পারবো আশা করি।

॥ বর্তমান তথ্য ॥

বর্তমানে শক্তির পূজা হয় তন্ত্রমতে। কিন্তু মন্ত্র ও প্রক্রিয়াগুলি পাওয়া যায় বিশেষ করে পুরাণের মধ্যে। অনেক মনে করেন, যে সব পুরাণে ঐ দেবী-পূজার মন্ত্র পাওয়া যায়, তা আসলে পুরাণ নয়, উপপুরাণ অর্থাৎ আরো আধুনিক কালের রচনা। সুতরাং তাতে যা মন্ত্র পাই, তাও আধুনিক। কিন্তু এ কথা মেনে নেয়ার পথে অন্তরায় আছে। কেন না অগ্নিপুরাণ, যা নিশ্চিতরূপেই পুরাণ বলে গণ্য—তার মধ্যেও মন্ত্র তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে নানা অভিচার ক্রিয়ার নির্দেশ। এখানে অথর্ববেদে কথিত অভিচার ক্রিয়ার উল্লেখ আর নাই করলাম। বলতে চাই তন্ত্রে যে বীজমন্ত্র আছে—তার প্রকাশ ওই অগ্নিপুরাণেও দেখি।

সে যাই হোক, বর্তমানে পণ্ডিতজনেরা তন্ত্রকে বলেন—অর্বাচীন শাস্ত্র। তাঁরা প্রমাণ দেন যে—তন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে—গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা—অর্থাৎ গৌড় দেশ থেকে এই তন্ত্রের বিদ্যা জেগেছে।

এই গৌড় ছিল তখনকার দিনের পালবংশীয় রাজাদের রাজধানী। গৌড় দেশ যে সে যুগে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতো সার্বিক সংস্কৃতিতে, তার একটি প্রমাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাই সংস্কৃত সাহিত্যের অলংকারশাস্ত্র থেকে। সেখানে 'গৌড়ী-রীতি' নামে একটি বিশেষ রচনাশৈলীর উল্লেখ আছে। গৌড়ী সুরাও ছিল সে কালের একটি বিশেষ বিখ্যাত মদ্য। আবার ঐ গৌড় দেশে বসেই পাল রাজারা শাসন করতেন বৃহৎ বঙ্গকে, যে বঙ্গের বিস্তার কেবল ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমুদ্র পার হয়ে দ্বীপাঞ্চলেও এগিয়ে গিয়েছিল।

বিশেষ করে মনে পড়ে সেই পালবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল দেব, যাঁকে নির্বাচন করেছিল সাধারণ প্রজাবৃন্দ বা জনগণ বা গণশক্তি মাৎস্যন্যায়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে। ওই গণশক্তি বা গণ-আন্দোলনের প্রতীক যে দেবী দুর্গা বা শক্তিদেবীগুলি মাত্রেই আমরা তা আরো জানতে পাব।

কিন্তু যা বলছিলাম—ঐ পালবংশ ছিলেন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী, যদিও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ঐ পাল বংশের প্রেরণায় তন্ত্রমত প্রসার ও প্রচার লাভ করে দ্বীপময় ভারতে অর্থাৎ সুমাত্রা, জাভা, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের দ্বীপগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে তো হলো অষ্টম শতাব্দীর কাহিনী। আমরা তো আগেই জেনেছি যে, শক্তিপূজা তথা তন্ত্রমত তারও ঢের আগে থেকেই চলে আসছে। দেখা যাক, তন্ত্রমত সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রে কি পাওয়া যায়।

॥ তন্ত্রমত ও তন্ত্রশাস্ত্র ॥

'রুদ্রযামল' তন্ত্রশাস্ত্রের একটি প্রাচীন পুঁথি। তাতে একটি অদ্ভুত কথা পাই। সে হচ্ছে—

বশিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রোঽপি চিরকালং সুসাধনম্।

* * * *

জগাম চীনভূমৌ চ যত্র বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিতঃ॥

—ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ যিনি চিরকাল সাধনা করতেন, তিনি গিয়েছিলেন চীনদেশে যেখানে বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সেই চীনদেশের বুদ্ধই বশিষ্ঠকে শেখান তন্ত্রের যা কিছু তত্ত্বাদি। অর্থাৎ বুদ্ধদেবকেই বলা হচ্ছে তন্ত্রের আদি গুরু।

কিন্তু ইতিহাস তো কই সে সাক্ষ্য দেয় না। আবার বুদ্ধদেব কখনো চীনদেশে ছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই, বরং বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধতীর্থ দর্শন ও বৌদ্ধ-দর্শন শিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে চীন থেকে পরিব্রাজকরা আসতেন ভারতে, বহু ভারতীয় বৌদ্ধ, বিশেষ করে বাঙালী বৌদ্ধরাও যেতেন চীনদেশে, চীনা ভাষায় বৌদ্ধধর্মের নানা পুঁথির অনুবাদ করতে—এ কথা ইতিহাসেই পাই।

আরো এক কথা, ব্রহ্মার পুত্র পৌরাণিক বশিষ্ঠ কি করে ঐতিহাসিক বুদ্ধদেবের কাল পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারেন? তবে যদি জানা যেত যে—কপিলাবাস্তুর সিদ্ধার্থ গৌতমের পূর্বে আরো বহু বুদ্ধদেব ছিলেন—তাহলে সমস্যা মেটে। কিন্তু তেমন কোন বুদ্ধদেব ছিলেন বলে তো প্রমাণ পাই না। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন বুদ্ধদেবের পূর্বে নাকি আরও আটাশ জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে এমন হওয়া সম্ভব যে, বশিষ্ঠ গোত্রের কোন সাধক ছিলেন বুদ্ধদেবের কালে। তাতেও তো 'রুদ্রযামল' বর্ণিত তথ্য থেকে তন্ত্রমতকে সুপ্রাচীন বলা যায় না। অবশ্য একথা সত্য যে, মহাচীনেও বহুকাল থেকে তন্ত্রমতের রীতিমত চর্চা ছিল। একখানি পুঁথিও আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে যার নাম—মহাচীনাচারতন্ত্র।

বহু পণ্ডিত মনে করেন যে—তা-রা, রু-দ্-র, তন্-ত্-র প্রভৃতি শব্দ এসেছে চীনা ভাষা থেকে। তার থেকেও বিচিত্র কথা এই যে, শক্তি বা দেবীপূজায় যে ফুলটি না হলেই নয়, সেটি হচ্ছে জবা। সেই জবা ফুলের একটি ইংরাজী নাম হচ্ছে—চায়না রোজ—অর্থাৎ চীনে গোলাপ। কে জানে—ওই ফুলটি শক্তিপূজা-পদ্ধতির সঙ্গে চীনদেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছে কি না! তবে চীনের সঙ্গে ভারতের সংযোগ যে মহাভারত লেখার যুগেও ছিল, তার প্রমাণ পাই 'চীনাংশুক' শব্দটি থেকে যার অর্থ চীনে তৈরি রেশমী কাপড়। সেই মহাভারতের যুগেও সেই রেশমী কাপড়ের প্রচুর আমদানী হতো চীনদেশ থেকে।

॥ ভাগবত পুরাণে ও মহাভারতে তন্ত্রের উল্লেখ ॥

ভাগবত মহাপুরাণেও তন্ত্র শব্দের উল্লেখ পাই। তবে তার থেকেও চমৎকার একটি তথ্য পাই মহাভারতের আনুশাসনিক পর্ব থেকে, সেখানে শিবের যে সহস্রনামস্তোত্র আছে—তার একটি শ্লোক হচ্ছে—

অথর্বশীর্ষঃ সামাস্যো
ঋক্‌সহস্রামিতেক্ষণঃ।
যজুঃ পাদ ভুজোগুহঃ
প্রকাশো জংগমস্তথা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—মাথা যাঁর অথর্ববেদ, মুখ যাঁর সামবেদ, সহস্র সহস্র চক্ষু যাঁর ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ যাঁর পা, আর গুহ বা তন্ত্র যাঁর হাত, তিনিই জঙ্গমরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন বিশ্বে।

এই শ্লোকটি থেকে যেন মনে হয় যে—শিবের থেকেই পেয়েছি আমরা চতুর্বেদ ও তন্ত্র।

॥ শিব কে ॥

এই শিব কে ? এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। ওদিকে তো বেদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা বা প্রজাপতিই হচ্ছেন বেদগুলির প্রথম উদ্‌গাতা। কিন্তু আহ্নিকমন্ত্রে গায়ত্রী জপের শেষে যে মন্ত্রটি পাই তা থেকে বড় বিচিত্র তথ্য প্রকাশ পায়। মন্ত্রটি হচ্ছে—

মহেশ-বদনোৎপন্না
বিষ্ণো হৃ্দয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা
গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥

—জেগেছ তুমি মহেশের মুখ থেকে, বিষ্ণু তোমায় হৃদয়ে অনুভব করেছেন আর ব্রহ্মা তোমায় অনুমোদন করেছেন, এখন তুমি দেবী তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর।

তাহলে কি এই সত্য যে বিষ্ণু যদিও বেদমাতা গায়ত্রীকে মনে মনে জানতেন এবং ব্রহ্মাও তাঁর অনুমোদন করতেন কিন্তু তাঁকে মুখ দিয়ে প্রথম প্রকাশ করেন ঐ মহেশ বা শিব ?

তন্ত্রশাস্ত্রেও তো একটি মন্ত্র পাই—

'আগতো শিববক্ত্রেভ্যঃ
গতশ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্ত
তস্মাদাগমো উচ্যতে॥

—শিবের মুখসকল থেকে এসে, যা গিয়েছে গিরিজার অভিমুখে এবং বাসুদেবের যা মত—সেই হচ্ছে আগম।

লক্ষ্য করার যে ঐ 'আগতঃ', গতঃ ও 'মতং' এই তিনটি শব্দের প্রথম অক্ষর তিনটি হচ্ছে আ+গ+ম বা আগম।

কিন্তু এ মন্ত্রেও তো দেখছি শিবকেই বক্তা বলা হয়েছে। ভারি মজার কথা যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবকে আবার পঞ্চাননও বলা হয় ; তার অর্থ কি এই যে, শিবই চারমুখে চারটি বেদ ও পঞ্চম মুখে তন্ত্র প্রচার করেছিলেন বলেই 'পঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন ?

আরো একটি তথ্য পাই যে—যখন তিনি পূর্বদিকে মুখে ফিরিয়ে বসেন তখন তাঁর মুখে সামবেদ উচ্চারিত হয়, যখন দক্ষিণ দিকে মুখ ফেরান তখন যজুর্বেদ উচ্চারিত হয়, যখন পশ্চিম দিকে মুখ ফেরান তখন অথর্ববেদ উচ্চারিত হয় আর যখন উত্তরদিকে মুখ ফেরান তখন ঋগ্‌বেদ উচ্চারিত হয়, সর্বশেষে অধোমুখে উচ্চারিত হয় তন্ত্র। এর আভাস আছে অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যসূক্তে।

কিন্তু এ কথা আজকে আর বলা যায় না ঐ শিব বা মহেশ ঠিক কোন যুগে বর্তমান ছিলেন।

এবার বরং দেখা যাক তন্ত্রের যে পুঁথিগুলি আছে, আগম, যামল ও তন্ত্র নামে—যার সবগুলিই ওই শিবের মুখ থেকে জেগেছে তাঁর অর্ধাংগিনী গিরিজার জন্যে—তার মধ্যে তন্ত্রমতের প্রসার সম্বন্ধে কি খবর পাই।

॥ ক্রান্তা বিভাগ ॥

তন্ত্রমতে তখনকার পরিচিত পৃথিবীকে বিভাগ করা হয়েছিল তিনটি ক্রান্তায়। তার নাম ছিল অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা। শোনা যায়, প্রত্যেকটি ক্রান্তায় একই নামের চৌষট্টিখানি করে পুঁথি ছিল তন্ত্রের। যদিও পাঠক্রম ছিল ক্রান্তাবিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন, তবে মূল বক্তব্য ছিল একই। অর্থাৎ সর্বসমেত একশো বিরানব্বুই-খানি ছিল তন্ত্রের পুঁথি, তা ছাড়া ছিল আগম ও যামল নামে বহু পুঁথি—যার পরিচয় পাই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বিশ্বকোষ" গ্রন্থে।

যাই হোক—ক্রান্তাবিভাগ সম্বন্ধে যা জানা যায় তাই বলি। বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকায় জানিয়েছেন যে—শক্তিমঙ্গল তন্ত্রে আছে; বিন্ধ্য পর্বত থেকে পূর্বদিকে যবদ্বীপ পর্যন্ত বিষ্ণুক্রান্তা, পশ্চিমে পারস্য, মিশর, রোডেসিয়া পর্যন্ত অশ্বক্রান্তা, আর উত্তরে নেপাল, মহাচীন পর্যন্ত রথক্রান্তা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে দক্ষিণদিকের কোন উল্লেখ ছিল না—তবে অষ্টম সংস্করণে আছে। সেখানে পাই বিন্ধ্যাচল থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রদেশ অশ্বক্রান্তা বা গজক্রান্তা। কিন্তু পৃথিবীর গজক্রান্তা নামে কোন বিভাগের কথা জানা যায় না। পৃথিবীর সম্বন্ধে যে মন্ত্রটি পাওয়া যায়—তাতে দেখি পৃথিবীকে অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে—গজক্রান্তা বলা হয় নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ ক্রান্তা বিভাগের মূল কথা হচ্ছে, যে ধরনের বাহনে যে বিভাগ অতিক্রম করা যেত—সেই বিভাগ সেই নামে চিহ্নিত হোতো। যেমন বিষ্ণুক্রান্তা বলতে বোঝাত সেই সব দেশ যা বিষ্ণু বা পোত-বাহনে অতিক্রম করা যেত, জাভা প্রভৃতি অঞ্চল তো সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপ, তাই পোত বা জাহাজ ভিন্ন অন্য বাহনে সে সব দেশে যাওয়া যায় না। তেমনি রথক্রান্তা হচ্ছে সেই সব দেশ যেখানে রথবাহনে যাওয়া যায়। পূর্বে মহাচীন পর্যন্ত যে প্রশস্ত পথ ছিল—যাতে রথও চলতো, তার খবর পেয়েছি আমরা গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। আর অশ্ব ছাড়া অন্য কোন বাহনেই পশ্চিম দিকে পারস্যাদি অঞ্চলে যাবার উপায় ছিল না। কারণ ঐ পশ্চিমদিকে দুটি গিরিপথ আছে, তাদের নাম খাইবার ও বোলান। সে পথে তাই দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকেও আসতে হয়েছিল অশ্ববাহনে, অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে। তাঁর সেই বুকিফেলাস অশ্বের নাম তো ইতিহাসে বিখ্যাত।

মোট কথা, সে যুগে রথ, নৌকা বা পোত, ও অশ্ব ছাড়া আর কোন বাহন ছিল না —এ কথা স্বভাবতই মনে হয় ঐ ক্রান্তাবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করলে। আরো লক্ষ্য করার যে, বিন্ধ্যপর্বতকেই কেন্দ্র ধরে বিভাগ নির্দেশ করা হয়েছে। এই বিন্ধ্য হচ্ছে ভারতের প্রাচীনতম পর্বত। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা বলেছেন, হিমালয়পর্বতের জন্ম হবার আগে থেকেই বিন্ধ্যপর্বত ছিল। সেই বিন্ধ্যপর্বতের সঙ্গে অগস্ত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—এ কথা পুরাণ থেকে জানা যায়। আবার সেই অগস্ত্য ছিলেন বশিষ্ঠের সমসাময়িক তার প্রমাণও ওই পুরাণেই আছে। সেই বশিষ্ঠকে তো তন্ত্রমতের প্রচারক বলা হয়। তবে কি তন্ত্রমত সেই অগস্ত্য-বশিষ্ঠের কাল থেকেই প্রচলিত ?

অনেকে আবার মনে করেন যে—সপ্তশতী চণ্ডীতে উল্লিখিত মেধস্‌মুনি আসলে বশিষ্ঠের নামান্তর। এখানে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে—বশিষ্ঠ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'বশী' শব্দ থেকে। সেই বশী শব্দ জপ করতে গেলে উলটে হয়ে যায় শীব বা শিব। এই ভাবেই কি শিব শব্দটি এসেছে ?

যাই হোক, বশিষ্ঠ যে সে যুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি প্রথম চাষ ও বাণিজ্যের প্রবর্তন করেন, অগ্নিরও আবিষ্কার করেন ও তার যোগ্য যা কিছু যন্ত্রপাতি যথা হল, লাঙল, অর্ণবপোত, অরণীকাষ্ঠ প্রভৃতির ব্যবহার জানতেন তার প্রমাণ পুরাণে আছে। আর সেই বশিষ্ঠই যে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বার এক নাম বা উপাধি তার আলোচনা করেছি 'বেদপরিচয়' পুস্তকে। শক্তিই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসঙ্গত বলি, স্বামী শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, তাঁর প্রণীত "জ্ঞানপ্রদীপ" গ্রন্থে বলেছেন যে—কপিলকৃত সাংখ্য শাস্ত্রই তন্ত্রের অপর নাম—যদিও বক্তা তার শিব।

॥ তান্ত্রিক পীঠস্থান ॥

এখন তান্ত্রিক পীঠস্থানগুলির কথাও কিছু বলি। পীঠস্থানগুলির সংখ্যা সর্বসমেত একান্নটি। ধর্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই জানেন, সেগুলি কত পুণ্যতীর্থ। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করবার যে—পূর্বে কালীঘাট বা কামরূপ, দক্ষিণে সিংহল, পশ্চিমে মরুতীর্থ হিংলাজ ও উত্তরে নেপাল পেরিয়ে আর কোথাও তান্ত্রিক পীঠস্থান নেই। তা হলে কি এই সত্য যে, তন্ত্রের প্রসার ও প্রচার প্রকৃতভাবে ঘটেছিল এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে? যদিও দেশান্তরেও তন্ত্রমত গিয়ে পৌঁছেছিল নানা উপায়ে—কিন্তু মূল পীঠস্থান বা কেন্দ্র আর কোথাও গড়ে উঠে নি?

কিন্তু বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে শক্তি বা দেবীপূজার যে খবর দেখতে পাই—তাতে তো মনে হয় তন্ত্রমতের পীঠস্থান দেশ-দেশান্তরেও ছিল—যদিও কালধর্মে তা অবলুপ্ত হয়েছে। দেশ-দেশান্তরে দেবীপূজার কি তথ্য পাই, এবার তারই কথা বলি।

॥ ইওরোপে শক্তিপূজা—রোম ॥

প্রথমে বলি রোমের কথা। ইতিহাসে পাই আজকে যে ইস্টারপর্ব ইওরোপের সর্বত্র খৃষ্টীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়; তা মূলে খৃষ্টীয় ছিল না—ঐ নাম থেকেই তা জানা যায়। খৃষ্টজন্মের বহুকাল আগে থেকেই দেবী ইস্তার বা ইস্তারার নামেই ঐ উৎসব সমগ্র ইওরোপে প্রচলিত ছিল। এই দেবী ইস্তারা ছিলেন কৃষির অধিষ্ঠাত্রী। এই দেবীকে প্রাচীন বাবিলন ও মিশর বা ইজিপ্টের থেকেই ইওরোপের বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ রীতিতে পূজা করতে প্রেরণা পান বলে অনেকেই মনে করেন। পরে যখন রোম সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, তখনই ঐ ইস্টারপর্বদিবস খৃষ্টীয় উৎসব হয়ে যায়, কারণ ঐ পর্ব-দিনেই খৃষ্টের পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল। কিন্তু ঐ উৎসবের আদি নামটি আর বদলাল না। রাজার আদেশেই যে এমন কাণ্ড ঘটেছিল, তা স্বভাবতই মনে হয়। বিশেষ করে সেদিনকার রোম সম্রাট তো প্রকাণ্ড রাজ্যখণ্ডের অধিকারী ছিলেন—সব দেশের মানুষই সেদিন রোমের আদর্শকে অনুসরণ করতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ ইস্তারা শব্দটির সঙ্গে শ্রীতারা শব্দটির যেন বিশেষ নৈকট্য লক্ষ্য হয়। তন্ত্রশাস্ত্রেও তো তারা বা শ্রীতারা নামে একটি দেবীর উল্লেখ পাই—সেখানে তাঁকে দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বলা হয়েছে। রোম্যানরা যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার আগে বহু দেবদেবীর পূজো করতেন—তার খবর জানতে পাই আমরা ঐ দেশের লিজেনডস বা পুরাণ কথা থেকে। তাতে বিশেষ বিশেষ দেবীকে বিশেষ বিশেষ শক্তির অধিষ্ঠাত্রী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর থেকেই তো বেশ বোঝা যায় যে, শক্তি বা দেবী পূজার প্রচলন সেই রোম-সভ্যতার সমকালীন।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে বিশ্বকোষকার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মশাই একটি অপূর্ব তথ্য রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্যে। তাঁর 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থ থেকে পাই যে; বাসন্তী-শুক্লা অষ্টমীতে যখন ভারতে অন্নপূর্ণার পূজো হয়, ঠিক সেই সময়েই রোম্যানরা এক দেবীর পূজো করতেন—তাঁর নাম অ্যানা পোরেনা। দেবী দুটির নামের সমতা অত্যন্ত পরিস্ফুট। এ বিষয়ে তিনি সবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কে জানে—যে যুগে রোম্যানরা ভারতে বাণিজ্য করতে আসতেন, সেই যুগে ভারতের অন্নপূর্ণা দেবীকেও তাঁরা তাঁদের পূজনীয়া বলে মেনে নিয়েছিলেন কি না?

॥ ইওরোপে শক্তিপূজা—গ্রীস ॥

কিন্তু রোম সভ্যতা তো জেগেছিল গ্রীক সভ্যতার আদর্শে আরো পরবর্তীকালে। সেই গ্রীসদেশেও কি শক্তিপূজা চলতো? হ্যাঁ, গ্রীস দেশের লিজেনডস বা পুরাণ কথায়ও তো বহু দেবীর নাম পাই, যেমন হেরা, ভেনাস প্রভৃতি। আমাদের দেশের পুরাণাদির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তো ইরা বা পৃথিবী ও মনসা, ওই দু'টি গ্রীসের দেবীর সঙ্গে বেশ তুলনীয়।

ঐতিহাসিকরা তো বলেন গ্রীসের ওই সব দেবীই রোমে বিভিন্ন নামে পূজা পেতেন। যাই হোক, গ্রীসের একটি দেবীর কথাই এখানে বিশেষ করে বলবার আছে তাঁর নাম সিরিস বা দিমিতার। তিনি ছিলেন গ্রীস দেশের শস্যের অধিষ্ঠাত্রী। আমরা জানি—গ্রীক ভাষায় ওই যে শব্দের শেষে হসন্ত 'স' থাকে, আসলে তা আমাদের সংস্কৃত ভাষায় সজাত বিসর্গের সঙ্গে অভিন্ন। সংস্কৃত ভাষাতেও যেমন স্থলবিশেষে ওই বিসর্গগুলি অনুচ্চারিত থাকে বা লোপ পায়—গ্রীক ভাষাতেও ওই শব্দের অন্তস্থ হসন্ত 'স' গুলি সেই দশা লাভ করে। তাই সিরিস শব্দ থেকেই এসে যায় সিরি শব্দ। এই সিরি শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শ্রীশব্দের সাদৃশ্য স্বীকার না করে পারা যায় না। ওই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কৃত শ্রীশব্দ যখন পালি ভাষায় সিরি রূপ নেয়—তখন তো নিঃসন্দেহে জানা যায় গ্রীক ভাষার সিরি ও সংস্কৃত ভাষার শ্রী কতখানি সমান।

আর ঐ শ্রী হচ্ছে দেবী লক্ষ্মীর অপর নাম—সেই দেবীই তো হচ্ছেন আমাদের দেশে ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী।

বলাই বাহুল্য, আমাদের দেশ সেই আদিকাল থেকে কৃষিনির্ভর। সেই কারণেই আমরা অন্নজীবী—অবশ্য অন্ন ব্যতীত কোন জীবই বাঁচতে পারে না। আবার, সম্পদ বলতে আমরা চিরকাল ধান্যকেই বুঝি। ধন ও ধান্য এই দু'টি শব্দের মূল ধাতুও এক। মোট কথা—ধান্যকেই যে আমরা লক্ষ্মীর সঙ্গে একাত্ম বলেই মানি, তার প্রমাণ পাই দুর্গোৎসবের সময় যে নবপত্রিকা প্রবেশ অর্থাৎ যে ন'টি গাছের পূজো করতে হয় প্রথমে—তার মন্ত্র থেকে। নবপত্রিকার মধ্যে ধানগাছও একটি—তাকে পূজো করার মন্ত্রটি হচ্ছে—

লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি
প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী॥

—হে লক্ষ্মী তুমি ধানেরই প্রতিমূর্তি—তুমিই প্রাণীমাত্রকে প্রাণদান করো অর্থাৎ জীবন ধারণ করায় সাহায্য করো।

আবার দুর্গাপ্রতিমায় যে লক্ষ্মীদেবীর মৃন্ময়মূর্তি দেখি, তাঁরও হাতে ধানের মালা দিয়ে সাজাতে হয়। কিংবা চৈত্র, ভাদ্র ও পৌষ মাসে গ্রামাঞ্চলে যে 'খন্দপালা' লক্ষ্মীর পূজো হয়—তাতেও ধানের রাশি ঢেলে দেবীর চৌকী পাতা নিয়ম। খন্দপালা শব্দের অর্থও হচ্ছে তিন মাসের পালা করে খন্দ বা সবজী চাষ করা। প্রত্যেক খন্দ শেষ হবার পরেই দেবী লক্ষ্মীর পূজো করতে হয়—তিনিই তো সব ফসলের অধিষ্ঠাত্রী।

সুতরাং বলা চলে না কি যে, শক্তিপূজার প্রচলন গ্রীক সভ্যতার যুগ থেকেই ছিল? সেই গ্রীক সভ্যতা তো খৃষ্টজন্মের বহুকাল আগেই জেগেছিল।

॥ মিশরে শক্তিপূজা ॥

গ্রীক সভ্যতারও পূর্বকালে জেগেছিল মিশরসভ্যতা। সে দেশেরও খবর নেয়া যাক।

ঐতিহাসিকরা তো বলেন—মিশরসভ্যতা নীলনদের দান। ওই নীলনদের কল্যাণেই মিশর দেশে কৃষিকর্মের প্রসার দেখা দিয়েছিল। সেখানে ছিলেন দেবী আইসিস—শস্যের অধিষ্ঠাত্রী। আরো বহু দেবীর পূজো হতো মিশরে। কিন্তু দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আইসিসের যা বর্ণনা পাই—তা আমাদের দেশের পৃথিবী সম্বন্ধীয় পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে ভারি মিলে যায়। একবার দেবী আইসিস এক অভিশাপের ফলে গাভীরূপ ধারণ করতে বাধ্য হন। এ বর্ণনা শুনলেই তো মনে পড়ে আমাদের পুরাণের বর্ণনা—দৈত্যদানবদের প্রবল অত্যাচারে দেবী পৃথিবী গোরূপ ধারণ করে দেবতাদের শরণ নিতেন। বৈদিক সাহিত্যে তো গো শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে পৃথিবী। এই পৃথিবীর মাটি ছাড়া আর কোথায় ফলবে শস্যাদি ?

আমাদের পুরাণে আরো পাই যে, রাজা পৃথু যখন পৃথিবীকে দোহন করে ধনলাভ করতে চাইলেন—তখন গাভী রূপ ধারণ করেই মা বসুন্ধরা পৃথুর বাসনা পূর্ণ করেন। সেই থেকেই বসুন্ধরার নাম রটে যায়—পৃথিবী ও পৃথ্বী—ওই পৃথু রাজার নামানুসারে।

মিশরের আইসিস দেবী কিন্তু কেবলি যে শস্যের দেবী ছিলেন তাই নয়—বিদ্যা, বুদ্ধি, ইন্দ্রজাল, জাদুবিদ্যা, শিল্প ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন তিনিই। এ কথা জানতে পেয়ে কেবলি মনে পড়ে আমাদের দেশে চণ্ডী সপ্তশতীতেও দেবীকে বলা হয়েছে—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তবদেবী ভেদাঃ ॥

—হে দেবী! জগতে যত প্রকারের বিদ্যা আছে—সবই তোমার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।

আরো জানা যায় যে, ওই আইসিস দেবীকে সাইপ্রাস দেশে ভেনাস নামে, এথেন্স দেশে মিনার্ভা নামে, ফ্রিজিয়া দেশে সাইবিল নামে, ইলিউসিয়া দেশে সিরিস নামে, সিরিয়া দেশে প্রসারপাইন নামে, ক্রীট দেশে ডায়ানা নামে, আর রোম দেশে বেলোনা নামে অর্চনা করা হতো। শক্তি বা দেবীপূজার ব্যাপকতা কতদূর পর্যন্ত ছিল সেই অতীত যুগে—তারই তো প্রমাণ এইগুলি।

॥ প্রাচীন আরবে শক্তিপূজা ॥

হজরত মহম্মদের একেশ্বরবাদী ইসলামধর্ম প্রচার হবার পূর্বকালে, আরব দেশে বহু দেবদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। তখনকার দিনের কোরায়েস ও কোনান জাতির সবাই 'আল্ উজ্জ্' দেবীর পূজো করতেন। সে দেবীর বৃক্ষমূর্তিই পূজা হতো। মনাৎ ও নৈলা নামে আরো দু'টি দেবী ছিলেন আরব দেশে, কিন্তু তাঁদের পূজা ইত্যাদির বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ সুমেরিয়ায় শক্তিপূজা ॥

সুমেরিয়ার আদিমতম অধিবাসীরাও ছিলেন কৃষিজীবী। তাঁদের সভ্যতার যে পরিচয় পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা, তার সঙ্গে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো থেকে খুঁড়ে বের করা সভ্যতার মিল দেখে পণ্ডিতজনেরা বিস্মিত হন। সেই সুমেরিয়ায় যাঁরা ছিলেন দক্ষিণ বাবিলন বা সুমের অংশের অধিবাসী এবং যাঁদের কাছে থেকেই বাবিলন বা অক্কাদের অধিবাসী বিজয়ী অক্কাদিয়ানরা নিজেদের সভ্যতার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে নিতে পেরেছিলেন—তাঁদের আদি উৎপত্তিস্থান ও বংশপরিচয় সম্বন্ধে আজো কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি প্রত্নতত্ত্ববিদরা। কে জানে, তাঁরাও ভারতবর্ষের প্রাগার্য বা দ্রাবিড় জাতির সগোত্র কি না?

যাই হোক—তাঁরাও দেবী ইস্তারের পূজো করতেন। সব থেকে বিস্ময়ের কথা—সে পূজোর পুরোহিত হতেন মেয়েরাই। বাংলা দেশে বারব্রত উপলক্ষে যে লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীদের পূজো হয়, আজো তো তার পুরোহিতগিরি মেয়েরাই করেন। সুমেরিয়ার অধিবাসীদের সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে মনে হয় তাঁরা বাস করতেন নারীপ্রধান সমাজে।

দেবী ইস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি কবিতা রচনা করেছিলেন—হয়তো এটি ছিল পূজারই মন্ত্র। সেটি হচ্ছে—

হে দেবী ইস্তার, সকল দেবতার দেবী!
তুমি নিরুপমা!
সকল মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রী তুমি;
স্বর্গমর্ত্যের তুমি মহিমান্বিতা রাণী,
তুমি জ্যোতির্ময়ী,
স্বর্ণোজ্জ্বল মহিমায় তুমি বিরাজ কর পৃথিবীতে—
চাঁদের কন্যা তুমি, তুমি বীরাংগনা।

ইবনে ইমাম সাহেব এই তথ্য প্রকাশ করেছিলেন তাঁর একটি প্রবন্ধে বাষট্টি সালে আনন্দবাজার পত্রিকায়।

দেবী ইস্তারার ঐ যে কবিতা বা মন্ত্রটি পাচ্ছি, ওর সঙ্গে তুলনা করতে সাধ যায়—আমাদের দেশের যে-কোন দেবীর পূজামন্ত্র। তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই ওই ভাবে বলা হয়েছে যে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে দেবি ! তুমি সবায়ের বরেণ্য ।
তোমার রূপের তুলনা নেই,
তুমি তিন ভুবনের অধীশ্বরী ।
প্রভাত সূর্যের দ্যুতি তোমার অঙ্গে
মাথায় তোমার চাঁদের মুকুট
তুমি শত্রুভয় নাশ করো ।—ইত্যাদি ।

॥ আমেরিকায় শক্তিপূজা ॥

আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও শক্তিপূজার প্রচলন ছিল বলে ধারণা করবার প্রচুর অবকাশ আছে। কারণ ওই রেড-ইণ্ডিয়ানদের সভ্যতাও ছিল কৃষিভিত্তিক। তাঁরা আকাশকে বাবা ও পৃথিবীকে মা বলে জানতেন—এ সত্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। সব থেকে বড় প্রমাণ এই যে, মেক্সিকো শহরে আজো বর্তমান আছে বৃহৎ শিবমন্দির।

তন্ত্রশাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পাই যে, শিব ও শক্তির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। তাই তান্ত্রিক পীঠস্থান মাত্রেই আছে শক্তির মন্দিরের সন্নিকটে সেই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা বা ভৈরব একটি শিবের মন্দির। কাজেই যেখানে শিবের মন্দির বর্তমান, সেখানে যে তার পরিপূরক শক্তি-মন্দিরও থাকা সম্ভব—তা বলাই বাহুল্য। তবে মেক্সিকোর শক্তি মন্দিরের অবস্থান সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ আজো জানা যায় নি।

॥ আফ্রিকায় শক্তিপূজা ॥

মিশর দেশে শক্তিপূজার কথা আগেই বলেছি। আফ্রিকায়ও যে মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে - তার উল্লেখ পাই উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত স্বামী জগদীশ্বরানন্দের সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকায়। সেই ভূমিকাটিতে আরো বহু মূল্যবান তথ্যই বিধৃত আছে—যা থেকে জানা যায় শক্তিবাদ বা শক্তিপূজার প্রচলন কত প্রাচীন।

অনেকে আবার অনুমান করেন যে, কালীমূর্তির রূপকল্পনা জেগেছে কোন আফ্রিকা-বাসিনীর আদর্শে। এ সম্বন্ধে অবশ্য কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ কৃষি ও শক্তিপূজা ॥

শক্তিপূজার খবর নিতে গিয়ে যা কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে—তার মধ্যে থেকে একটি সত্য উজ্জল হয়ে উঠছে যে, শক্তিপূজার সঙ্গে কৃষির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে—মানববিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, কৃষির প্রবর্তন করেন নারীরা। পুরুষ নাকি কেবল শিকারকেই জীবিকা বলে বুঝতেন। কৃষির প্রবর্তন করে নারীরাই মনুষ্যসভ্যতার পথকে প্রসারিত করে দেন। কে জানে—সেই কথা স্মরণে রেখেই মানুষ নারীকেই শস্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পনা করেছিলেন কিনা সেই স্মরণাতীত যুগে। আর এও আমরা জানি যে, শস্যের উৎপাদন ব্যাপারে চন্দ্রের প্রভাব কতখানি—তাই কি চান্দ্রমাসেই দেবীর পূজাতিথির গণনা হয়—আর দেবীর মাথায় চন্দ্রের স্থান নির্দেশ করা হয়?

॥ ভারতে শক্তিপূজা ॥

এবার আবার ভারতের দিকে ফিরি। বর্তমানে যে কেবল বাংলা দেশেই শক্তিপূজা হয় তা নয়, ভারতের প্রায় সর্বত্রই এ পূজার প্রচলন আছে। যেমন দেখি দাক্ষিণাত্যে। বাংলায় যে পক্ষে দুর্গোৎসব পড়ে—সেই পক্ষের প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত ন'টি তিথিতে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গার পূজা হয় সেখানে তিন তিন তিথিতে।

মহারাষ্ট্রেও তো ভবানীদেবীর পূজা বিখ্যাত। উত্তরাপথের অন্যান্য অঞ্চলেও শক্তিপূজার যথেষ্ট প্রচলন আছে। তবে অনেকে মনে করেন যে, বাংলা দেশের মানুষরাই নানা দেশে গিয়ে প্রথম কালীমূর্তি স্থাপন করে শক্তিপূজার পথ দেখান।

কিন্তু কতকাল থেকে যে এ পূজা চলছে ভারতবর্ষে সেইটিই তো প্রশ্ন। এ প্রশ্নের কিছু উত্তর পাই প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মশায়ের লেখা—'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' বইখানিতে। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, স্বয়ং বুদ্ধদেব শক্তিপূজা করেই সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি যে দেবীর উপাসনা করেছিলেন তাঁর নাম—জংগুলী তারা, যা নাকি দেবী মনসার অপর নাম—অর্থাৎ বুদ্ধদেবের যুগেও ভারতে দেবীপূজার প্রচলন ছিল।

আগেই বলেছি কবি বিদ্যাপতির কথা যিনি দুর্গা ও মনসার সমপর্যায়ের পূজার বিধান দিয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ তখনো দেবী মনসা স্থানচ্যুত হয়ে গ্রাম্যদেবীর পর্যায়ে নেমে যান নি। কবি বিজয় গুপ্ত তো তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন যে, দুর্গা ও মনসা একই রথে চেপে দর্শন দান করেন চাঁদ সদাগরকে। তখন চাঁদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদাগর তাঁদের অভিন্ন মূর্তি দেখে বিস্মিত হয়ে যান। অনেকে মনে করেন যে, দেবী দুর্গার যেমন দশটি বাহু আছে, দেবী মনসারও সেইভাবে দশ বাহু ধরা যেতে পারে—দু'টি বাহু মনসার নিজস্ব, বাকী আটটি অষ্টনাগের দ্বারা পূর্ণ হয়।

॥ শক্তি সাধনা লোকায়ত ধর্ম ॥

যাই হোক, বুদ্ধদেবের শক্তি-সাধনার কথা শুনলেই মনে এসে যায় যে,—অনেকেই এক সময়ে বলতেন যে,—বুদ্ধদেব বেদ মানতেন না, প্রচার করেছিলেন বেদবিরুদ্ধ ধর্ম। কিন্তু সন্ধানীরা জানেন যে, বুদ্ধদেব রীতিমত ভাবেই বেদচর্চা করেছিলেন এবং তার সারভাগ গ্রহণ করে প্রাণিহত্যা-বিরোধী ধর্মই প্রতিষ্ঠা করেন।

জীবিকার দু'টি ধারা তো চিরকাল আছে জগতে—এক প্রাণীশিকার ও অন্য কৃষি। বুদ্ধদেবই আবার মানুষকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন কৃষিজীবিকার দিকে—তাই নিষেধ করলেন প্রাণীবধ, স্থাপন করলেন অহিংস উপায়ে জীবনধারণ-পদ্ধতি যা কেবল কৃষিকর্মের দ্বারাই সম্ভব।

তবে হ্যাঁ, বুদ্ধদেবের মত বিশেষ করে স্থাপিত অথর্ববেদের আধারে। এই অথর্বই যে আদিমতম বেদ তার কথা বেদের প্রথম ভাষ্যকার সায়ণাচার্যই স্বীকার করেছেন। অথর্ববেদের মধ্যে পাই আদিম মানবসমাজের যা কিছু রীতি, নীতি পদ্ধতির বিবরণ। সব থেকে মজার কথা অথর্বর বিভিন্ন ভাগের নাম দেয়া হয়েছে কাণ্ড। আমরা জানি কাণ্ড শব্দটি বৃক্ষের একটি অংশকেই বোঝায়। তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখি—ঋগ্‌বেদের ভাগগুলিকে বলা হয়েছে মণ্ডল, মণ্ডল শব্দটি তো প্রতিষ্ঠিত সমাজের অংশ-বিশেষকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের যুগে সমাজ সুগঠিত হয়েছিল। যজুর্বেদের ভাগগুলিকে বলা হয়েছে অধ্যায়, অর্থাৎ যজুর্বেদের যুগেই মানুষ অধ্যয়ন করার দিকে ঝুঁকেছিল আর সামবেদের ভাগকে বলা হয় আর্চিক—অর্থাৎ সামবেদের যুগে মানুষ অর্চনার তত্ত্ব বুঝেছিল—এই ধারণাই তো মনে জাগে—বিভিন্ন বেদের ভাগগুলির নামকরণকে বিচার করলে। কিন্তু সে অন্য কথা।

অথর্ববেদই যে ছিল লোকায়ত বেদ এবং বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মও ছিল লোকায়ত ধর্ম এ কথাটি স্মরণে রাখবার। ঋক্, যজু ও সাম—এই তিনটিকে একত্রে 'ত্রয়ী' বলে বহু প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই 'ত্রয়ীর' সঙ্গে অথর্ববেদের যে বিরোধ ছিল, তাও জানা যায়—আচার্য সায়ণকেও তাই অথর্ববেদের ভাষ্য-ভূমিকায় নানাভাবে অথর্ববেদের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলতে হয়েছে। কেউ কেউ বলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথর্ববেদকে প্রথম সবায়ের সামনে তুলে ধরেন আপস্তম্ব ঋষি– যদিও এই বেদ আদিকাল থেকেই ছিল লোকায়ত—যাঁরা 'ত্রয়ী'র শাসন মানতেন না তাঁরাই বিশেষ করে পালন করতেন অথর্ববেদের ধর্ম এবং এখনো করেন। কেন অথর্ববেদ সম্বন্ধে এতো আলোচনা করা দরকার তা ক্রমশই প্রকাশ পাবে।

॥ অরণ্য ও চণ্ডী ॥

এখন চণ্ডীমঙ্গল পাঞ্চালীর ভূমিকায় প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মশাই যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তাঁর রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের 'ইতিহাস'-এ তাই বলি। তিনি লিখেছেন—

"বন্দনীয় রূপে এই বনদেবতা বৈদিক সাহিত্যের শেষকালে দেখা দিয়াছেন। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের শেষের দিকে (সূক্ত ১৪৬) তাঁহার একটি স্তব আছে। সেখানে তাঁহার নাম—অরণ্যানী।

প্রমাণরূপে শেষ শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি—

ন বা অরণ্যানির্হন্তি
অন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায়
যথাকামং নিপদ্যতে ॥

– অরণ্যানী কখনো হিংসা করেন না, যদি পরস্পর হিংসা না করে. (তাঁহার অধিকারে যে কেহ) স্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া যথা ইচ্ছা বিশ্রাম করিতে পারে।

আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং
বহ্বান্নামকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরং
অরণ্যানিমশংসিষম্ ॥

—কৃষিকর্ম ব্যতিরেকেও যাঁহার প্রচুর সুগন্ধ সুরভিগন্ধী অন্নভাণ্ডার, সেই পশুমাতা অরণ্যানীকে আমি প্রকৃষ্টভাবে স্তব করিতেছি।"

এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বৈদিক যুগেও ছিল কিছু দেবীপূজার প্রচলন। এ সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যের ঊষাদেবী ও উপনিষদের হৈমবতী উমার কথাও বলতেই হয়। যাই হোক, ঐ অরণ্যানী সম্বন্ধে আর একটু বলে নিই।

অরণ্য সেই অঞ্চলেই স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে– যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকে বলেন, গ্রীষ্মমণ্ডলের দক্ষিণসমুদ্রসেবিত অঞ্চলই হচ্ছে অরণ্যের উদ্‌গমক্ষেত্র। এ বিষয়ে অতি সারগর্ভ আলোচনা করেছেন আমেরিকার লেখক—মার্স্টন বেট্‌স্ সাহেব—তাঁর লেখা—'হোয়ার উইণ্টার নেভার কাম্‌স'—গ্রন্থে 'রইন ফরেস্ট' অধ্যায়ে।

সেই অরণ্যের কোলেই বড় হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা, আজকের দিনে যাঁরা আদিবাসী নামে চিহ্নিত হয়ে জঙ্গলে পর্বতে নিজেদের মতো গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বেঁচে আছেন। প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই তো বলেন, অমনি এক আদিবাসী-গোষ্ঠী সাঁওতালদের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি 'চণ্ডী' নামটি। আজও ওই সাঁওতালরা 'চ্যাণ্ডী' নামে এক দেবীর পূজো করেন—তাঁর মূর্তি ঠিক আমাদের পূজিত কালীর মতোই। দুর্গোৎসবের সময় মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী পাঠের যে ব্যবস্থা হয়—সেই চণ্ডী শব্দটিই আমরা পেয়েছি সাঁওতালী ভাষার কাছে।

অবশ্য চণ্ডী শব্দের আরো একটি নির্বচন পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে চনং দাতি, দদাতি বা অর্থাৎ চন বা অন্ন যিনি দান করেন তিনি চণ্ড—তাঁরই স্ত্রীলিঙ্গে হয় চণ্ডী।

আবার জাপান দেশে বৌদ্ধদেবী 'চনষ্টী'র পূজো হয়। পণ্ডিতেরা বলেন—ঐ চনষ্টী শব্দ সংস্কৃত চণ্ডী শব্দের সমার্থক।

ইতিহাসবেত্তারা আমাদের জানিয়েছেন যে, আর্যদের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্বকালে এই ভারতবর্ষ ছিল দ্রাবিড়দের অধিকারে। সেই লুপ্ত সভ্যতার নানা পরিচয় প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুঁড়ে বের করেছেন এবং এখনো করছেন। তার থেকে জানা যাচ্ছে যে, দেবীপূজার প্রবর্তন সেই দ্রাবিড়সমৃদ্ধির কালেও ছিল। আরো একটি সন্দেহ করবার অবকাশ জাগে যে, রোম্যান সভ্যতার মূলে যেমন এট্রুসক্যান জাতির দান ছিল অপরিমিত—যদিও সেই এট্রুসক্যানদের প্রকৃত পরিচয় আজকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না ভারতে আর্যসভ্যতার মূলে ঠিক তেমনি আছে প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির অপরিমেয় দান—যদিও দ্রাবিড়দের সমগ্র পরিচয় আজ পূর্ণরূপে নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্য। এ সন্দেহ আরো জাগে চতুর্বেদের মধ্যে মুনিগ্রথিত ও ঋষিগ্রথিত মন্ত্রের সহাবস্থান লক্ষ্য করে। মুনি ও ঋষি বলতে যে দু'টি বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বোঝাতো সেই অতীত যুগে, তার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি 'বেদ-পরিচয়' গ্রন্থে। তাই এখানে আর তার অবতারণা করছি না।

এতক্ষণে বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে,—ভারতে আর্যপ্রবাহ জাগবার বহুবহু কাল আগে থেকে শক্তি বা দেবী পূজার ধারা চলে আসছে—ভারতের মাটির সঙ্গেই যে এই সংস্কৃতি ও সাধনার অচ্ছেদ্য যোগ তাও আমরা ক্রমেই জানতে পাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পর্ব

॥ শক্তির উপলব্ধি ও দেহতত্ত্ব ॥

॥ শক্তির তত্ত্ব বিচার ॥

কাউকে পূজা করতে হলে প্রথমেই তো প্রয়োজন - তাকে বুঝে নেয়া। ঠিক সেইভাবে শক্তিকেও পূজা করার আগে প্রয়োজন—তাঁকে উপলব্ধি করা। দেখা যাক, শক্তি বলতে আমরা কি বুঝি।

প্রথম বলি, আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিকরা শক্তির যা সংজ্ঞা বের করেছেন। তাঁরা বলেন —এ জগতে বস্তুমাত্রেরই আছে শক্তি, আর রূপ যেখানেই বদলাচ্ছে—সেখানেই ঘটছে শক্তির ক্রিয়া। এ হলো তাঁদের মতে স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

এবার বলি আমাদের দেশে তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে। তাতে পাই—এই যে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে - যাকে ভারতীয় দর্শনের ভাষায় প্রপঞ্চ বলা হয়—তার মূলীভূত কারণ হচ্ছেন আদ্যাশক্তি - যাঁর অন্য নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে সর্বশাস্ত্রেই প্রধান বলে মেনে নেয়া হয়েছে। যখন সেই প্রকৃতিকে নাম দেয়া হলো কালী—তখনও সাধকরা বললেন—'কালী প্রধানা হৈ।'

আবার বিজ্ঞান এ কথাও প্রমাণ করেছে যে, শক্তি যেখানে ক্রিয়াশীল নয়, সেখানে বস্তুর কোন রূপান্তর ঘটে না। তন্ত্রশাস্ত্রেও পাই—শক্তিকে স্তম্ভিত করে রাখার প্রক্রিয়া—সে প্রক্রিয়ায় সাধক চিরযৌবন লাভ করতে পারেন, ইচ্ছামৃত্যুও লাভ করতে পারেন পরমায়ুকে দীর্ঘায়ত করে। কিন্তু সে সাধনার কথা থাক—আগে দেখি, শক্তিকে কি উপায়ে মানুষ উপলব্ধি করলো।

তন্ত্রশাস্ত্রে ঐ ক্রিয়াশীল শক্তিকে বলা হয়েছে সগুণ, যা নির্গুণ ভাবকে রূপায়িত করে। পদার্থবিদ্যায় যে স্ট্যাটিক ও ডিনামিক এনার্জির উল্লেখ আছে, ঐ ক্রিয়াগত শক্তি আর ভাবগত শক্তির পার্থক্য যেন তেমনি ধরনের—যদিও তারা পরস্পর অচ্ছেদ্য।

এ কথাটা বোধ হয় আরও এক ভাবে বলা যায় যে, স্ফুরণ যার নেই সেই শক্তিকেই আমরা ভাবমাত্র বলতে পারি - যার সত্তা আছে কিন্তু আকার বা প্রকাশ নেই। সে যেন জ্যামিতির বিন্দু, যার অবস্থান আছে কিন্তু আয়তন নেই। সেই ভাব বা নিষ্ক্রিয় শক্তিকে রূপ দিতে গেলেই প্রয়োজন হয় সক্রিয় শক্তির। বাস্তবিকপক্ষে ভাব-মাত্রেই হচ্ছে নির্গুণ আভাস মাত্র, যা একেবারেই অনির্বচনীয়। যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় না, দান বা গ্রহণ করাও যায় না—যতক্ষণ সেই ভাবটিতে রূপ সঞ্চারিত না হয় সগুণশক্তির যোগে। যেমন দেখি—কবি কিছু অনুভব করলেন, কিংবা সুরকার কি চিত্রকর কি ভাস্কর কিছু অনুভব করলেন, অথবা আরো সাধারণ ক্ষেত্রের মানুষ কিছু কল্পনা করলেন। যতক্ষণ সেই অনুভব বা কল্পনা ব্যক্তিবিশেষের মনের মধ্যেই রয়ে গেল—ক্রিয়ার সাহায্যে তা কবিতায়, কি গানে, কি চিত্রে, ভাস্কর্যে অথবা কথাতে রূপলাভ না করলো—ততক্ষণ পার্শ্বস্থ অন্য কোনও ব্যক্তিই সন্ধান পেলেন না কোথায়, কখন, কে কি অনুভব বা কল্পনা করেছেন। আবার যতক্ষণ একের মনোগত ভাব অমনি কোন ক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যের অধিগত না হয়, ততক্ষণ গড়ে উঠতেই পারে না কোন পরিবার বা গোষ্ঠী; ধর্মসমিতি বা সমাজ কি রাষ্ট্র গড়ে ওঠা তো দূরের কথা। তাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন এই ক্রিয়াশীল শক্তিকে—তারি বলে ঘটছে সকলের সঙ্গে সকলের সংযোগ। একথা তান্ত্রিকরা ভাল করেই জানতেন—তাই শক্তিকে তাঁরা বলেছেন—'সংসারবন্ধহেতু যোগমায়া'।

॥ প্রথম শক্তি—বাক্ ॥

মানুষের দিক থেকে বিচার করলে দেখি—বাক্ই হচ্ছে প্রথমতম শক্তি, যা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের মূলসূত্র। দেবীসূক্ত, যা পাই ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে, তার দেবতা হচ্ছেন এই 'বাক্'। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে আত্মশক্তিরূপে বোধ করে এই সূক্তের প্রচার করেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, অম্ভৃণ শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে মুখব্যাদান করা। বাস্তবিকপক্ষে মুখ না খুলে কেউই পারেন না বাক্য উচ্চারণ করতে। যাই হোক, ঐ সূক্তটিতে আটটি মন্ত্র আছে। তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করি—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।

* * *

অহমেব বাত ইব প্রবামি
আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা॥ ইত্যাদি

—আমিই রাজ্যের অধীশ্বরী, আমিই এনে দিই সবায়ের কাছে ধনরত্ন, সমস্ত জ্ঞান আমারই অধিকারে, যজ্ঞের কাজে আমিই হচ্ছি প্রথম।........আমিই বিশ্বভুবন সৃষ্টি করে তার মধ্যে বায়ুর মতোই বিচরণ করি—ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ মন্ত্রগুলি রীতিমতভাবে বিশ্লেষণ করলে বেশ বুঝি যে, বাক্‌শক্তি কি রাষ্ট্র পরিচালনায়, কি সংসার রচনায় আর কি বা যাবতীয় জগৎকার্যে কি বিপুল সাহায্যই না করে। এই দেবীসূক্তটি পাঠ করার বিধি আছে শক্তিপূজাকালে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী সপ্তশতী পাঠের অঙ্গরূপে—এ কথাটি স্মরণে রাখবার।

আবার বাক্ হচ্ছে শব্দমাত্রেরি অন্য নাম। তাই দেখি—'অভিনয় দর্পণ' গ্রন্থের প্রথমেই নন্দিকেশ্বর শিবকে এই বলে প্রণাম করছেন—

আঙ্গিকং ভুবনং যস্য
বাচিকং সর্ববাঙ্ময়ং।
আহার্যং চন্দ্রতারাদি
তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্॥

—প্রণাম করি সেই সাত্ত্বিক শিবকে, সমস্ত ভুবন যাঁর অঙ্গ, শব্দমাত্রেই যাঁর বাক্য, চন্দ্রতারাদি যাঁর আভরণ।

বাস্তবিক শব্দমাত্রেই তো ঈশ্বরের বাক্য। এ সত্য কেবল আমাদের দেশেই নয়. ইউরোপেও প্রচলিত বাইবেলের মাধ্যমে। মানব অবশ্য বিশেষ সাধনা করতে পেরেছে সেই বাক্য নিয়ে, কারণ সৃষ্টিপর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দেহযন্ত্র তার অধিকারে। তাই স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণকে আয়ত্তে এনে মানব ভাষা সৃষ্টি করেছে।

শব্দ যে শক্তির কতখানিকে প্রকাশ করে তা গীতায় উক্ত 'শব্দব্রহ্ম' কথাটি থেকেই জানতে পারা যায়। আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখি—'বাগ্বৈ ব্রহ্ম'—বচনটি।

বর্তমানকালে পদার্থবিজ্ঞান তো এই শব্দকে পাঁচটি তত্ত্বের মধ্য বা কেন্দ্র বলেই স্বীকার করে। তাতে পাই হিট্ বা তাপ, লাইট বা আলোক, সাউণ্ড বা শব্দ, ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ ও ম্যাগনেটিজম্ বা চুম্বকশক্তি। আমাদের শাস্ত্রে যে পঞ্চতন্মাত্র আছে-শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নামে তার সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের ঐ পাঁচটি তত্ত্বের চমৎকার মিল। শব্দ কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানেও যেমন কেন্দ্রস্থান অধিকার করে আছে, আমাদের শাস্ত্রেও তেমনি প্রধান রূপে গণ্য।

এই শব্দ যার নেই, তার অন্যান্য গুণ অর্থাৎ তাপ, আলোক ইত্যাদি থাকলেও তাকে সাধারণত জড় বলেই গ্রহণ করা হয়, যদিও সেই জড়ও আঘাত পেলে শব্দ প্রকাশ করে। যাই হোক, ঐ শব্দই সবায়ের সঙ্গে সবায়ের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। যার কোন শব্দ নেই তার পরিচয় জানা যায় না—সে তাই অতি ভয়াবহ। শব্দই যে শক্তির এক বিশেষ প্রকাশ ও পরস্পরের সংযোগের হেতু এ তথ্য কি প্রাচীন আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি অর্বাচীন সমস্ত শাস্ত্রেই উদ্‌ঘাটিত। চণ্ডী সপ্তশতীর প্রথম চরিত্রে তাই দেখি, ব্রহ্মা দেবীকে স্তব করছেন—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি
বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা ॥

—তুমি সকলের আহ্বানযোগ্য, তুমি সকলের অন্ন, তুমি বষট্‌কার বা নমস্কারযোগ্য, তুমি উদাত্তাদি স্বরস্বরূপ।

মানুষ যেদিন সেই শব্দশক্তিকে আয়ত্তে এনে ভাষা সৃষ্টি করলো সেই দিন থেকেই চলেছে গোষ্ঠী বা সমাজ সৃষ্টির চেষ্টা। যুগে যুগে সেই সমাজের রূপ বিবর্তিত হয়ে চলেছে, আর হবেও, যতকাল ঐ সদাক্রিয়াশীল শব্দশক্তি থেকে বা ভাষা থেকে মানুষ বঞ্চিত না হয়। সেই শক্তি কিন্তু এই দেহযন্ত্রেরই একটি প্রকাশ। কি ভাবে এই দেহযন্ত্র থেকে বাক্য স্ফুরিত হয় তার দিকে তাই মানুষের দৃষ্টি অতি প্রাচীনকালেই আকৃষ্ট হয়। ক্রমে মানুষ এই দেহযন্ত্রটিকেই পরিপূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে থাকে—সে চেষ্টা যে আজো চলেছে তার প্রমাণ দেবেন আধুনিক কালের শরীর-বিজ্ঞানীরা।

ঠিক কবে থেকে যে মানুষ নিজের দেহকে বিশ্লেষণ করার দিকে ঝুঁকেছে, তা আজকের দিনে বলা সম্ভব নয়। কারণ সে যুগ আমাদের কাছে একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা যায়। কিন্তু এই দেহগত শক্তির উপলব্ধি করাই যে সদ্ধর্ম—তা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকরাও একবাক্যে স্বীকার করছেন। মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার তাই আজকে শেষ নেই। কঠিন প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা চাইছেন—মানুষ মাত্রকেই আরো কর্মক্ষম, আরো বুদ্ধিমান করে তুলতে। কারণ প্রত্যেকটি মানুষ হচ্ছে সমগ্র সমাজের মৌলিক অংশ—যদি প্রত্যেক অংশকে সর্বশক্তিমান করে তোলা যায়—সমগ্র সমাজ তবেই তো সমৃদ্ধিশালী হবে।

॥ তান্ত্রিক শক্তি ও বৈজ্ঞানিক শক্তি ॥

তর্ক উঠতে পারে যে, আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে যে শক্তিতে অধিকারী বা শক্তিমান করে তুলতে চাইছে, তা একেবারেই বস্তুতান্ত্রিক, বহিরঙ্গ ও বহির্মুখী—কিন্তু ভারতে যে শক্তিকে তন্ত্রমতে পূজা করা হতো, তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক, অন্তরঙ্গ, অন্তর্মুখী। তাই আধুনিক শক্তি সর্বক্ষয়কর, আর ঐ পৌরাণিক শক্তি সর্বশ্রেয়কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং বিজ্ঞানের তথাকথিত শক্তির সঙ্গে তন্ত্রপূজিত শক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করতে যাওয়াই মূঢ়তার পরিচয়।

কিন্তু পণ্ডিতজনের চরণে একটি নিবেদন জানাবার আছে। তাঁরা কি নিশ্চয় করে নির্ধারণ করতে পেরেছেন, এই জগৎ ও জীবন ব্যাপারের মধ্যে বস্তু কতটুকু আর ভাব কতটুকু, কিংবা বহিরঙ্গ কতটুকু আর অন্তরঙ্গ কতটুকু? অথবা আরো স্পষ্ট করে বলি—তারা কি জেনেছেন আত্মা কতটুকু আর দেহ কতটুকু? আজও তো দেখি যে কোন আধি বা মানসিক পীড়া এবং ব্যাধি বা দৈহিক পীড়া চিকিৎসা করতে হয় নানা বস্তুর সংমিশ্রণে ঔষধ প্রস্তুত করে। তাঁরা কি বুঝিয়ে দেবেন জড়শক্তির প্রয়োগ করলে কি করে তা চিৎশক্তির বা মানুষ প্রভৃতি প্রাণীর উপকারে আসে?

এ বিষয়ে তো পণ্ডিতজনেরা আজো নিজেদের মধ্যে তর্কে ব্যস্ত। কোন স্থির সিদ্ধান্তেই তো তাঁরা পৌঁছতে পারেন নি—যা সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্বসম্মতিসিদ্ধ। তাই দেখি একই ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করছেন তাঁরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে—ফলে গড়ে উঠছে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। এমন কোন মতই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না যা সামগ্রিক বা সার্বজনিক। এই কথাই তো বার বার মনে হয়—যাঁরা জীবজগৎকে ব্রহ্ম আর মায়া, পরমাত্মা ও জীবাত্মা, কিংবা আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা এই দুইভাগে ভাগ করেছেন—তাঁদের কোথাও না কোথাও মারাত্মক ত্রুটি আছে। তা যদি না থাকতো, তা হলে এতোদিনে তাঁরা নিশ্চয়ই একটি সর্বসম্মত স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন—যেমন পেরেছেন বৈজ্ঞানিকরা। আর সাধারণ মানুষও তাঁদের সেই উদার মত অনুসরণ করে বিভিন্ন ধর্মের গণ্ডি ও জটিলতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেত। তখনই তো তারা ধর্মকে নিত্যকর্মের অঙ্গীভূত করে জীবনে সিদ্ধিলাভ করতো।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল—ভাগবত মহাপুরাণে কৈলাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, সেই কৈলাসে পাঁচ প্রকার সিদ্ধ-সম্প্রদায়ের বাস তাঁদের নামগুলি অত্যন্ত বিচিত্র। সেই সিদ্ধরা হলেন—জন্মসিদ্ধ, ওষধিসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ ও যোগসিদ্ধ। এর মধ্যে ওই যে ওষধিসিদ্ধদের নাম করা হয়েছে—তার প্রকৃত অর্থ কি, তা বিশেষ বিচার্য বলেই তো মনে হয়।

॥ সাধারণের ধর্মজ্ঞান ॥

কিন্তু যা বলছিলাম—এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, আজকের মানুষ ধর্মকে সভয়ে পরিহার করে চলেছে, ঐ পণ্ডিতজনের গুরুগম্ভীর বাক্যাড়ম্বর আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনুষ্ঠানিক আতিশয্য দেখে। যে কোন একটি পথচারীকে যদি প্রশ্ন করা যায়—তিনি ধর্ম সম্বন্ধে কি ধারণা রাখেন—তৎক্ষণাৎ এই উত্তরই তিনি দেন যে, "অন্ন সমস্যার সমাধান করতেই অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছি; এখন কি ধর্মের দিকে মন দেবার সময় আছে? আর কোন ধর্ম না মেনেও তো বেশ দিন কেটে যাচ্ছে"।

সত্যিই কি ধর্মসাধনাকে বাদ দিয়েও মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে? তাই যদি সত্য হয়, তবে কি দরকার ধর্ম নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবার? আজকে তো আমরা কেবল ব্যবহারিক মূল্য বিচার করেই জীবনে ত্যজ্য কি আর গ্রাহ্য কি তার হিসাব করি। ধর্মের যদি কোন ব্যবহারিক মূল্যই না থাকে, সে যদি কেবল পণ্ডিত-জনের তর্কসেব্য ও সময়ক্ষেপণের বস্তুই হয়, তবে আর ধর্মপালনের কথা কেন ওঠে?

॥ ধর্মের প্রয়োজন ॥

তাই তো আজকে একান্ত প্রয়োজন জেগেছে ধর্মের যা কিছু অসার জটিলতা ভেদ করে—তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য শস্য কি আছে তারি বিচার করার। নিত্য এ জগতে যা ঘটে—তা থেকে এই সত্যই তো আমরা প্রত্যক্ষ করি যে,—ভাব থেকে রূপ বা বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে, আবার বস্তু থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে ভাব। এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ না করে পারা যায় না যে, যিনি যত বড় অধ্যাত্মবাদী হোন—দেহরক্ষার জন্যে প্রতিক্ষণেই তাঁকে নানা বাহ্যবস্তুর ওপরে নির্ভর করতে হয়। কারণ ভাবমাত্র আহরণ বা সম্বল করে থাকলে তাঁকে আর অধিক দিন দেহধারণ করে থাকতে হয় না, নিশ্চিহ্ন হয়ে তিনি ভাবেই বিলীন হয়ে যান।

আরো এক কথা, আজ পর্যন্ত যতো যাঁরা আধ্যাত্মিক শক্তি বা সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা তো কই কেউ সেই সিদ্ধি নিয়ে নিষ্ক্রিয়, নিরীহ হয়ে একা কাল কাটাতে পারেন নি; বরং বেশী করেই তাঁরা বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছেন, এই বস্তুবহুল সংসারের ধূলি-কলংকজঞ্জালমলিন মানুষকে। যদি আধ্যাত্মিকতা বা সিদ্ধি বা ভাব, বস্তুকে বাদ দিয়ে কিছু হয়, সংসারধর্মকে বাদ দিয়ে কিছু হয়, তা হলে যে অরবিন্দের দিব্যভাব জেগেছিল, যে রামকৃষ্ণের মহাভাব জেগেছিল বা যে চৈতন্যদেবের রাধাভাব জেগেছিল, কেন তাঁরা সবাই সেই ভাবে বিলীন হয়ে না গিয়ে ঘোর সংসারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নানা বিষয় ও বস্তুর মাধ্যমে তাদের আনন্দ ও শান্তি দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন? কিংবা কেনই বা বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিশুখৃষ্ট ও হজরৎ মহম্মদ সম্বন্ধেও ঐ একই প্রশ্ন করা যেতে পারে। আর বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিদের সম্বন্ধে তো বটেই।

ভাব লাভ করে কেউই কখনো পারেন নি—সেই ভাবকে সবায়ের কাছে না জানিয়ে। কারণ সেই ভাব হচ্ছে আবিঃ স্বরূপ—সর্বদা প্রকাশ হওয়াই তার ধর্ম। তাই কোন ভাবই কারো একার বস্তু নয়—তা জাগামাত্রই সবায়ের হয়ে যায়—এমনি তার রীতি। সেই ভাবকে কেন্দ্র করেই জগতে জেগেছে নানা ধর্মের বিধিনিষেধ মজা এই যে, সেই ভাব প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই নিত্য বিরাজমান। এর সম্বন্ধে চণ্ডী সপ্তশতীতে একটি চমৎকার মন্ত্র আছে—তাতে পাই—

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য
জন্তোর্বিষয়গোচরে ॥

—যা কিছু জগতে জন্মায়, তাদের সবায়েরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে।

সেই জ্ঞান হচ্ছে ঐ ভাবের অপর নাম। সে ভাব বা জ্ঞান কোথাও অস্ফুট, কোথাও অর্ধস্ফুট আর কোথাও বা পরিস্ফুট। সেই জ্ঞান বা ভাবকে সর্বত্র সুপরিস্ফুট করে তোলার জন্যেই ধর্মের প্রয়োজন।

॥ আত্ম শক্তির উপলব্ধি ॥

সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যেই প্রথম মানুষের দৃষ্টি পড়লো নিজের শক্তির দিকে। কি শক্তি আমার আছে,—তা না জেনে যদি সাধনা করতে ছুটি, তাতে তো কেবলি পাব বাধা আর বিঘ্ন। তাই আগে বুঝে নেয়া দরকার আমার শক্তি কতটুকু বা আমার আধার কতখানি ধারণ করতে পারে।

তবে মানুষের দৃষ্টি প্রথমেই তার নিজের শক্তির দিকে ফেরে নি। তাও আমরা জানতে পাই মানুষের জ্ঞানোদয়ের ক্রমবিশ্লেষণ করে। তা থেকে জানা যায় যে, জড়বস্তুর চর্চা করতে করতেই মানুষ ক্রমশ নিজের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে। মানুষ তো আদিকাল থেকে চোখের সামনে পেয়েছে নানা বস্তু, সেই বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে গিয়েই তারা পৌঁছে যাচ্ছে ভাবে। এ কথা বিজ্ঞানজগতের দিকেও যেমন সত্য, অধ্যাত্মজগতের দিকেও ঠিক তেমনি সত্য। আজকে কেউ যদি বলেন, যা বস্তুগ্রাহ্য তা ভাবগ্রাহ্য নয়, কিংবা তার বিপরীত প্রতিজ্ঞা—তা হলে স্বীকার করতেই হয় যে, তিনি খণ্ডিতবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরো এক কথা—যাঁরা বলেন যে, এক ও অদ্বৈত ব্রহ্ম বা নির্গুণ সত্তাই জগতের আদি কারণ, যখন তিনি ইচ্ছা করলেন—"একোঽহং বহু স্যাম" অর্থাৎ এক থেকে বহু হবো, তখন মায়া বা সগুণ শক্তিকে দিয়ে জগৎসৃষ্টি করিয়ে নিলেন; তাঁদের ঐ যুক্তি থেকেই তো প্রকাশ পাচ্ছে যে, ব্রহ্মের প্রকাশ বা বিবর্তন হচ্ছে মায়া বা শক্তি, আর সেই শক্তির প্রকাশ বা বিবর্তন হচ্ছে নানারূপময় জগৎবৈচিত্র্য। যদি মেনে নেয়া যায় যে, জগৎ নিত্য চলেছে ক্রমবিকাশের পথে, তা হলে তো বলতেই হয় যে, ব্রহ্মের পরিণতি শক্তিতে আর শক্তির পরিণতি জগৎসৃষ্টিতে। এ কথার প্রমাণ তো উপনিষদেই পাই সেই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—আপ্তবাক্যটিতে। আবার চণ্ডী সপ্তশতীতেও তো একটি মন্ত্র পাই—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তি-
ত্বয়া সর্বমিদং ততম্॥

—তিনিই নিত্য বিরাজমান, এই জগৎ হচ্ছে তাঁরই মূর্তি, এখানে যা কিছু আছে সবের মধ্যে তিনি প্রসারিত হয়ে আছেন।

মনে পড়ে যায়—পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে যে দর্শনবাদ প্রতিষ্ঠিত। পদার্থবিজ্ঞানে পাই, অদৃশ্য বায়ুভূত অবস্থা থেকে বস্তু বা ইলেকট্রন প্রোটনযুক্ত পরমাণুগুলি যখন ঘনত্ব লাভ করে, তখন দেখা দেয় তরল রূপ; আর সে তরল যখন আরো ঘনীভূত হয়, তখনি পেয়ে যাই কঠিন রূপটি। বলা বাহুল্য এই সত্যকে বৈজ্ঞানিকরা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেছেন। এর বিপরীত সত্যও সমভাবে প্রামাণ্য অর্থাৎ যে কোন কঠিন দ্রব্য তরল বা বায়ুভূত অবস্থা লাভ করতে পারে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা। এর একটি চমৎকার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় যে-কোন লোহাগলানোর কারখানায়। তাপের মাত্রা বৃদ্ধি করে কঠিন লোহাকে তরল করা হয় সেখানে। তখন সেই তরল লোহা জলের মত ফুটতে থাকে এবং বাষ্প হয়ে উড়েও যায়।

॥ দেহ ও আত্মার ভেদাভেদ ॥

সুতরাং যদি বলা যায় যে, আত্মা বা ভাব জমতে জমতে দেহরূপ ধারণ করে, আবার এই দেহই গলতে গলতে আত্মা বা ভাবে পরিণত হয়, তা কি অস্বীকার করা যায়?

বর্তমানকালে পদার্থবিদ্যা প্রমাণ করছে যে, যে কোন বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে পৌঁছনো যায় 'ইথারে'—যা অনন্ত শক্তিময়। আবার আমাদের দেশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসুও তিনটি মহাদেশে প্রমাণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, ধাতুমাত্রেই কি ভাবে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার ফলে ও সময়ের ব্যবধানে ক্লান্তি প্রকাশ করে থাকে। এমনকি কোন বিষ বা উত্তেজক ও অবসাদক বস্তুর সংস্পর্শে এলে আক্ষেপাদি সচেতনতা প্রকাশ করে। পদার্থমাত্রেরই মধ্যে যে প্রাণ নিহিত আছে বা জীবনীশক্তি আছে—তা তো আজকের দিনে প্রামাণ্য সত্য।

এ সম্বন্ধে স্বনামধন্য উইল ডুরাণ্ট সাহেব তাঁর সর্বজন পরিচিত রচনা—"দ্য ম্যানসনস অব ফিলজফি"-তে যা বলেছেন, তার উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। তিনি বলেছেন—

"দ্য নিউ কনসেপশান অব ম্যাটার অ্যাজ অ্যালিভ সফেন্‌স্ দ্য কনষ্ট্রাষ্ট, বিটুইন অর্গানিক অ্যাণ্ড ইনর্গানিক, অ্যাণ্ড রিডিউসেস দ্য ডিফিকালটি অব কনসিভিং কন্‌টিনিউয়াস এভলিউশান"।

স্যার জগদীশ যে গাছের মধ্যেও প্রাণস্পন্দন আবিষ্কার করেছেন—তাও এখানে উল্লেখযোগ্য। আর উল্লেখ করতে হয় ট্রানসফর্মেশান অব এনার্জির। বৈজ্ঞানিক মাত্রেই জানেন কি ভাবে মেক্যানিক্যাল ফোর্স বা কাইন্যাটিক এনার্জি পরিণতি লাভ করে পোটেনশিয়াল এনার্জিতে বা তার উলটোও ঘটে।

জীবতত্ত্ব-বিজ্ঞান থেকে জানতে পাই যে, বংশবৃদ্ধির প্রেরণা আমাদের মনে প্রথমাবস্থায় কামনা বা ভাব মাত্র থাকে। মনে পড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
এলেম আমি কোথায় থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে,—
খোকারে তার বুকে বেঁধে,—
ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।

সেই ইচ্ছা বা ভাব তো আসলে বায়ুভূত অবস্থা—কালক্রমে যতই সে ইচ্ছা ঘনীভূত হয়, ততই পরিণত হয় তরল রসে। অবশেষে সেই রস এমনি কঠিন অস্থি নির্মাণ করে যে, যুগ যুগ ধরে মাটির সংস্পর্শে থাকলেও তা নষ্ট হয় না। তাই তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের লুপ্ত প্রাণী বা জীবজন্তুর করোটি ও কংকাল আজও প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভূগর্ভ খুঁড়ে বের করতে পারছেন। আর তারি সাহায্যে সেই সব জন্তুর দেহসংস্থান কেমন ছিল তাও গড়ে তুলছেন। কে জানে- শক্তির নাম সেই কারণেই ইচ্ছাময়ী কি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শক্তি ও জগৎসেবা ॥

শক্তি বা সিদ্ধিলাভ করে সবাই তো দেখি জগৎকে সেবা করার উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বেশ সরে আসেন শিষ্যজনেরা মূল গুরুর উপদেশ থেকে। সে কেমন ভাবে তাই বলি।

প্রথম বুদ্ধদেবের প্রচারিত পথের যে ইতিহাস পাই, তারি আলোচনা করি। বুদ্ধদেব যে শক্তিউপাসনা করেই সিদ্ধিলাভ করেন, তার প্রমাণ দিয়েছেন প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বিখ্যাত পুস্তক –'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস'-এ মনসামঙ্গলের তথ্য বিচার করতে গিয়ে। যাই হোক, সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধদেব প্রচার করলেন অষ্টাঙ্গিক মার্গ—যে উপায়ে জগৎকে সেবা করা সম্ভব। তাঁর অনুগত শ্রমণ-শ্রাবকেরা তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বটে—কিন্তু সাধনা করতে লাগলেন পৃথক মতে। তাঁরা কেউ গেলেন না শক্তিসাধনার পথে, তাঁরা স্বয়ং বুদ্ধদেবকেই অবলোকিতেশ্বর অর্থাৎ যে ঈশ্বর নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন অথবা যে ঈশ্বরকে সবাই অবলোকন করেছে—এই নাম দিয়ে পূজো করতে সুরু করলেন। প্রচার করলেন তাঁরা যে, সিদ্ধার্থ গৌতম শাক্যমুনি ছাড়া আর কেউ বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারবে না বা তথাগত হতে পারবে না। এর থেকে বেশ মনে হয় নাকি যে, তাঁরা সবাই মূল গুরুর উপদেশ কেবল আংশিক ভাবেই গ্রহণ করলেন? তাই শক্তিলাভ করার যে চেষ্টা ছিল গৌতম বুদ্ধের, তাঁরা সে চেষ্টার দিকে না গিয়ে তাঁর প্রদর্শিত মার্গকেই আনুষ্ঠানিকভাবে আঁকড়ে ধরলেন। তার ফল কি হলো তার কথা পরেই বলছি।

শিষ্য সম্প্রদায়ের জন্য মূল গুরুর উদ্দেশ্য যে এইভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়, তার আরো দু' একটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করলে বোধহয় অবান্তর হবে না।

একটি হলো—চৈতন্যদেবের যাঁরা ভক্ত—তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, মহাপ্রভু রাধাশক্তির উপাসনা করেই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সবাই চৈতন্যদেবকেই অর্চনা করতে আরম্ভ করেন।

আবার রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধেও ঐ কথা সত্য। সকলেই জানেন যে, তিনি বামনীর উপদেশে চৌষট্টিখানা তন্ত্রের মতে সাধনা করেন, তাঁর ইষ্টদেবী ছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কালীমূর্তি—যাঁর নাম ভবতারিণী। কিন্তু রামকৃষ্ণ শিষ্যরাও শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণভজনার প্রবর্তন করেন। শোনা যায়—মহাকবি ও নাট্যকার স্বর্গত গিরিশচন্দ্র ঘোষই রামকৃষ্ণদেবের পায়ে প্রথম অঞ্জলি নিবেদন করেন। ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের মূর্তিস্থাপন করেন বেলুড় মঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ-ভক্তরাও তো ঐ পথের পথিক। যদিও অরবিন্দ স্বয়ং তন্ত্রমতেই দিব্যভাবের সাধনা করেছিলেন—"দি মাদার" বা জগন্ময়ী মা কালীই ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবী।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে. সাধনবলে নিজের শক্তিকে যে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি—সে কি করে পারবে জগৎকে সেবা করতে? এই কথা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতা ও রচনার মধ্যে বারে বারেই প্রকাশ করেছেন যে-প্রথমে লাভ করতে হবে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি। যে শক্তিহীন সে তো সহজেই পথভ্রষ্ট হয়ে কলুষিত করে তোলে সংসারকে—সেই তো জাগায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও অধর্ম।

এর প্রমাণ ঐ বৌদ্ধধর্মের অনুগতদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁদের কথাই বিশেষ করে বলি – কারণ বর্তমানে যে তন্ত্রমত প্রচলিত, ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে, তার মূলে আছে বৌদ্ধতন্ত্রমত।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ শক্তিসাধনার চেষ্টা না করে কেবল গৌতমবুদ্ধের নির্দেশিত পথে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুষ্ঠানটুকুই পালন করতে লাগলেন। তাঁদের আদর্শ হীনযান নামে চিহ্নিত হলো। এই আদর্শে যে বৌদ্ধধর্ম সম্যক বিকাশলাভ করে নি, তা প্রকাশ পেলো সম্রাট কণিষ্কের যুগে দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দে, যখন কুণ্ডলবন নামে বৌদ্ধ সংঘারামে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনের অধ্যক্ষ ছিলেন সে যুগের স্বনামধন্য পণ্ডিত বসুমিত্র আর তাঁর সহাধ্যক্ষ ছিলেন সংস্কৃতে বুদ্ধচরিত রচয়িতা অশ্বঘোষ। সেই সময়েই বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন প্রচার করলেন মহাযান বৌদ্ধ আদর্শ।

যাঁরা হীনযান মত অনুসরণ করতেন—তাঁরা তো বলতেন—বুদ্ধদেবকে আমরা কেবল পূজো করতেই পারি—আর পারি আমরা বুদ্ধের নির্দেশ পালন করে যেতে। আমরা কেউই বুদ্ধ হতে পারি না।

বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন যে মহাযান মতের প্রবর্তন করলেন- তাতে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, সাধনার বলে প্রত্যেক ব্যক্তিই পারেন শক্তি বা সিদ্ধিলাভ করতে এবং বুদ্ধত্ব লাভ করতে। তবে সেই সিদ্ধি বা বুদ্ধত্ব হবে প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী সীমিত। অর্থাৎ তিনি বললেন—গৌতমবুদ্ধ আমরা কেউই হতে পারব না, কারণ কোন দু'টি মানুষ জগতে একই ছাঁচে ঢালা নয়—কিন্তু আমি যদি সাধনা করি, তা হলে আমার মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত আছে, তাকে পরিপূর্ণরূপে জাগিয়ে তুলতে পারি—সেই হচ্ছে আমার সিদ্ধি বা বুদ্ধত্ব। এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই পারেন তাঁর নিজস্ব শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে সিদ্ধিলাভ করতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধুনিক কালে অনেকেই মনে করেন যে, ঐ হীনযান বৌদ্ধমতের সঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে—বৈষ্ণবরাও বলেন যে, জগতে কৃষ্ণ মাত্র এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ, বাকী যা কিছু সবই রাধা বা প্রকৃতি। সেই রাধা পারেন কেবল কৃষ্ণের আরাধনা করতে।

আর মহাযান বৌদ্ধমতের সঙ্গেও তাঁরা তেমনি সাদৃশ্য দেখান শাক্তধর্মের। শাক্তরা বলেন যে, প্রত্যেকের মধ্যে যে সুপ্তশক্তি বা কুণ্ডলিনী আছেন—তাঁকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই সবাই শিবত্ব লাভ করতে পারেন। কিন্তু সে কথা থাক।

॥ নাগার্জুনের কীর্তি ॥

এখন কথা হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি আছে, এ সত্য নাগার্জুন কি ক'রে ধরতে পারলেন?

অনেকে মনে করেন যে বেদের মধ্যে যে বায়ুর কথা আছে, বা সর্পরাজ্ঞীর কথা আছে—সেই হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাতের চেষ্টা। কিন্তু আজকে তো আমরা নিশ্চয় করে জানতে পারছি না যে, ঠিক কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই পূর্বাচার্যরা ঐ সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। আবার আয়ুর্বেদের মধ্যেও তো বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে বহু উল্লেখ পাওয়া যায়—কিন্তু তা থেকেও সহজে জানা যায় না, কি ভাবে সেদিনকার আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা ঐ তিনটি ধাতুসম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, যাঁরা সাধক তাঁরা ঐ তিন ধাতুর সম্বন্ধে কি অপূর্ব রূপ কল্পনা করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন পিত্ত হচ্ছেন ব্রহ্মা, বায়ু হচ্ছেন বিষ্ণু আর কফ হচ্ছেন শিব। যাঁরা হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, সোরা, সাইকোসিস আর সিবিলিস এই তিন বস্তুই বিশ্বসৃষ্টির মূলে কাজ করছে। বলা বাহুল্য, পিত্ত, বায়ু ও কফের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের মূল তিনটি তত্ত্বের বেশ মিল আছে। কিন্তু সে আবার অন্য কথা।

পূর্ব প্রশ্নটি তো থেকেই যায় যে—জানতে পেলেন তাঁরা কি করে ওই তিনটি মূল কারণকে? এ প্রশ্নের উত্তর বেশ কিছুটা পাই ওই নাগার্জুনের জীবনচর্যা থেকে।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই যে নাগার্জুনের বৃত্তি ছিল চিকিৎসকের, তিনি রাজা কণিষ্কের সভায় ভিষগাচার্যরূপে যুক্ত ছিলেন। এ শুধু ইতিহাসের বর্ণনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র নয়—তিনি যে রীতিমত চর্চা করতেন ওই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের—তার একটি দু'টি প্রমাণও আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে। একটি হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্রের পুঁথি—যার নাম নাগার্জুনকক্ষপুটম্। আজকাল যেমন বিভিন্ন শাস্ত্রে 'হ্যাণ্ড বুক' তৈরী করেন শাস্ত্রবিশেষের মনীষীরা—কারণ ছাপাখানার দৌলতে বই তো এখন হাতে হাতেই ফেরে—আগেকার দিনে তেমনি তৈরী করতেন বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ছোট ছোট পুঁথি —যা কক্ষে বা বগলে নিয়ে বেড়ানো যেত। ভিষগ্‌বর নাগার্জুন তেমনি একটি কক্ষপুট বা ক্ষুদ্র পুঁথি তৈরী করেছিলেন আয়ুর্বেদের সারাংশ নিয়ে। শুধু তাই নয়, ওই নাগার্জুনই ভারতীয় শল্যচিকিৎসার আদিশাস্ত্র 'সুশ্রুত সংহিতা'র প্রতিসংস্কার করেছিলেন। চিকিৎসাবিদ্ মাত্রেই জানেন সুশ্রুত সংহিতায় ওই কারণে নাগার্জুনকে 'ভগবান নাগার্জুন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐ সুশ্রুত সংহিতা থেকেই আমরা জানতে পাই সেই যুগে কি ভাবে শবব্যবচ্ছেদ করে শরীর বা শরীরের মধ্যে নিহিত যাবতীয় নাড়ী প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হতো ছাত্রকে। বলাই বাহুল্য সেই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলেই নাগার্জুনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ঐ সংহিতার প্রতিসংস্কার করা। এর থেকে কি আমরা এই অনুমান করতে পারি না যে—শবব্যবচ্ছেদ করার বিদ্যা আয়ত্ত করেই নাগার্জুন নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছিলেন প্রত্যেক মানুষের দেহাভ্যন্তরে কি শক্তি সুপ্ত রয়েছে? এই অনুমান আরো যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় এই কারণে যে, নাগার্জুন কথিত ঐ মহাযান মতের অনুসরণ করেই বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান নামে আরো নানা বৌদ্ধ মত প্রসারিত হয়—আর এ সবগুলি মতের ভিত্তি হচ্ছে—দেহতত্ত্ব বা শরীর-বিজ্ঞান।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মশাইও তাঁর রচিত 'চিন্ময় বঙ্গ'—পুস্তকে বাংলা তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যায় লিখতে গিয়ে আয়ুর্বেদের কথা উত্থাপন না করে পারেন নি।

আরো একটি কথা -'বেদ পরিচয়' গ্রন্থে এ কথা সবিশেষ আলোচনা করেছি যে অথর্ববেদ, যার উপবেদ হচ্ছে আয়ুর্বেদ, তার সমধিক প্রচার ও প্রসার ছিল বঙ্গ দেশে বা আরো ভাল করে বলতে হলে বলতে হয় বৃহৎ বঙ্গে—তখন বঙ্গের বিস্তৃতি ছিল পশ্চিমে কাশীধাম পর্যন্ত। মজার কথা এই যে—বাংলা দেশে যত বেশী শিব ও পঞ্চানন্দের মন্দির আছে—তত আর ভারতের কোন অঞ্চলে নেই। আবার এই বাংলা দেশে আয়ুর্বেদ চর্চার এমনি প্রসার ঘটেছিল এককালে যে—তার ফলে এই অঞ্চলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদ্যসম্প্রদায় ও করণ-কায়স্থ-সম্প্রদায় নামে দু'টি বিশেষ বর্ণ বা জাতি জেগে উঠেছিল। অবস্থা এমনি হয়েছিল তখন যে, যদি দেবীবর ঘটকের সাক্ষ্য মানতে হয় তা হলে তো স্বীকার করতেই হয় যে—রাজা আদিশূরের রাজত্বকালে বাংলা দেশে কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণই ছিলেন না, তাই প্রয়োজন হয়েছিল কান্যকুব্জ থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থকে বরণ করে নিয়ে আসার। অর্থাৎ আদিশূরের কালেও তথাকথিত ত্রয়ীর প্রসার ছিল না বাংলা দেশে। তা হলে কি এখন আমরা বলতে পারি না যে—'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা'—এই প্রবচনটি গভীর অর্থবহ? কিন্তু সে কথা এই পর্যন্ত থাক।

এখন তন্ত্রের মধ্যে যে সব সাধনপ্রক্রিয়ার কথা আছে শক্তিকে আয়ত্তে আনার জন্যে, তারই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি—ঐ নাগার্জুনের জীবনচর্যার আলোকে।

একটি কথা এখানে বলে রাখি যে ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন বর্তমানে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রশাস্ত্র নামে যা প্রচলিত, তার মূল ভিত্তি হচ্ছে বৌদ্ধতন্ত্র। আর ইদানীং কালের বৈজ্ঞানিকজনেরাও মনে করেন যে—তন্ত্রমতের সাধন-প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে শরীর-বিজ্ঞানের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যদিও প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কেউই প্রকাশ করেন নি। তবে বিজ্ঞানবাদী ইওরোপ আমেরিকাদি দেশে দেখা যায় যে—সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন চিকিৎসকরা। এমন মতও ঐ সব দেশে প্রচারিত যে—বর্তমান সমাজকে সুস্থ মনোবৃত্তির ভিত্তিতে গঠন বা স্থাপন করতে হলে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই পারেন একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক হতে। কারণ চিকিৎসকরাই দেহধর্মের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে করতে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করছেন মনোধর্মের গোপন-লোক। যাঁরা সেই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তেমন বহুজন কৃতী চিকিৎসকের নামোল্লেখ করা যেতে পারে এখানে—কিন্তু তাতে এ প্রবন্ধের পরিসর বৃদ্ধি হবে ভেবেই নিরস্ত হচ্ছি।

॥ তান্ত্রিক-প্রক্রিয়ার অর্থভেদ ॥

এখন বরং তান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলির অর্থভেদ করার চেষ্টা করি। তন্ত্রের মতে সিদ্ধিলাভ করতে হলে যে তিনটি প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়—তার নাম অল্পবিস্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেরই জানা আছে। সে তিনটি হলো শবসাধনা, ষট্‌চক্রভেদ ও পঞ্চ মকার সাধন। সাধারণত অনেকেই মনে করেন বা শুনেছেন যে—ঐ তিনটি প্রক্রিয়ার যে কোন একটিকে অভ্যাস করলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশ পাবে যে—ঐ তিনটি প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কোন একটিকে বাদ দিলে অন্য কোনটিই আয়ত্ত করা সম্ভব নয় এবং তার ফলে সিদ্ধিও থাকে সুদূর-পরাহত। ঐ তিনটি প্রক্রিয়ার অর্থভেদ করতে পারলেই এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবো।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে—ওই তিনটি প্রক্রিয়ার মূল তথ্যকে ঘিরে এমন একটি রহস্যের আবরণ জেগে আছে যে, সেই আবরণ ভেদ করে সত্যের মূলে পৌঁছান খুবই দুরূহ; তাই কি সব সময়েই বলা হয়েছে যে—তন্ত্রের চর্চা করতে হলে গুরু বা উত্তরসাধক ব্যতিরেকে সম্ভব নয়? বাস্তবিকই দেখা যায় মন্ত্রের জালে, কাব্যের ঘটায় ও রূপকের ছটায় ঐ প্রক্রিয়ার বর্ণনাগুলি এমনি ঘনঘোরঘটাচ্ছন্ন যে—একক চেষ্টায় তা ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে অসম্ভব নয়, কারণ মানুষ যা সৃষ্টি করেছে, তা বুঝে নেবার ক্ষমতা মানুষ মাত্রেরই আছে। তার জন্য প্রয়োজন সাধনার। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে—তন্ত্রের বিদ্যাকেও যেমন বলা হয় গুরুমুখী তেমনি শরীর-বিজ্ঞানের বিদ্যাও তো গুরুমুখী।

॥ গুরুবাদ ও মন্ত্রগুপ্তি ॥

একটি সত্য সকলেই জানেন যে বিদ্যামাত্রেই হচ্ছে গুরুমুখী। বেশী দূরে যাবার দরকার কি? এই যে আমরা কথা বলি—এই কথা কইবার বিদ্যাও কি পেরেছি আমরা একদিনে অকস্মাৎ অর্জন করতে? এ বিদ্যাও তো শিখেছি আমরা আমাদের মহাগুরু মায়ের মুখ থেকে। তিনিই তো শিশু সন্তানের মুখের উপর মুখ রেখে অপার করুণায় প্রথমে 'মা' শব্দটি উচ্চারণ করার কৌশল শিখিয়ে দেন। ক্রমে তাঁরি স্নেহমধুর নির্দেশে শব্দমাত্রকেই উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় শিশু বহুদিনের সাধনায়। এই সত্য বয়স্ক মানুষের মনে যদি নাই থাকে—তবু যা সত্য, তা সত্যই থেকে যায়। এমনি ভাবে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখি, গুরু না হলে কোন বিদ্যাই কেউ অর্জন করতে পারে না। সেই গুরু কিন্তু কোন একক ব্যক্তি হতে পারেন না। এ সম্বন্ধে চমৎকার একটি বচন আছে তন্ত্রে, তাতে তো পাই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুলোভী যথা ভৃঙ্গো
পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলোভী তথা শিষ্যো
গুর্বাৎ গুর্বান্তরং ব্রজেৎ॥

—মধুর লোভে যেমন ভৃঙ্গ এক ফুল থেকে অন্য ফুলে ধেয়ে যায়, জ্ঞানের লোভে তেমনি শিষ্যও এক গুরু ছেড়ে অন্য গুরুর কাছে চলে যায়।

এই সত্য আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে প্রকটিত। তবু দুঃখ এই যাঁরা গুরুবাদী তাঁরা বিশ্বাস করেন যে—একই গুরু পারেন শিষ্যকে আমরণ শিক্ষা দিয়ে যেতে। এর সম্বন্ধে একটি কথা স্বভাবতই মনে পড়ে যে পাঠশালার গুরুর প্রয়োজন কি মিটে যায় না ইস্কুলের ছাত্রের, তেমনি ইস্কুলের মাষ্টার মশায়ের প্রয়োজন কি আর থাকে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে?

অথচ আমাদের দেশে যাঁরা তন্ত্রের মতে গুরুগিরি করেন—তাঁরা কেন যে শিষ্যকে আগলে রাখতে চান, জানি না। যদিও সেই তন্ত্রের মধ্যেই দেখছি গুরুপূজার মন্ত্র রয়েছে—

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ॥
ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ॥
ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ॥
ওঁ পরমেষ্ঠী গুরুভ্যো নমঃ॥

মন্ত্রগুলিতে যে শব্দ ক'টি প্রয়োগ করা হয়েছে—তার থেকেই কি বোঝা যায় না—যে, কোন একটি গুরুকে লক্ষ্য করেই মন্ত্রগুলি বলা হচ্ছে না? বেশ তো দেখা যাচ্ছে যে—শিষ্য যেমন উন্নত হচ্ছেন শিক্ষায়, গুরুর ক্রমও তেমনি উত্তর উত্তম হচ্ছে। আরো লক্ষ্য করবার যে, সবগুলি মন্ত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে বহুবচন যার লক্ষ্য কখনোই এক হতে পারে না। অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণে গৌরবে বহুবচন প্রয়োগের নির্দেশও আছে। কিন্তু ঐ তর তম প্রয়োগ থেকেই তো বেশ বোঝা যায় যে মন্ত্রগুলি বিভিন্ন স্তরের গুরুর প্রতি প্রযুক্ত।

কিন্তু হায়, অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুরা যেমন অশেষ স্নেহে শিষ্যকে স্বেচ্ছায় সব কিছু শিক্ষা দেন—তন্ত্রের ক্ষেত্রে তেমন গুরুর সন্ধান কই? তান্ত্রিক গুরুরা স্বেচ্ছায় কোন শিষ্যকে কিছু নির্দেশ দিতে চান না। অনেক সময় দেখেছি শিষ্যের পরমাগ্রহ দেখেও গুরু থাকেন মুখ ফিরিয়ে অধিকার-ভেদ ও আধার-ভেদের গণ্ডি রচনা করে, অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রগুপ্তির অনুদারতা দেখিয়ে। কে জানে, এই মন্ত্রগুপ্তির ফলেই তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি লোপ পেতে বসেছে কিনা। তবে মন্ত্রগুপ্তি যে তন্ত্রের পথে মহা বাধা সৃষ্টি করেছে, তা স্বভাবতই মনে হয়। আর একটি সন্দেহও জাগে যে—হয়তো তন্ত্রে যে সমস্ত সাংকেতিক ও পরিভাষা ব্যবহার করে গিয়েছেন পূর্বাচার্যরা—তার প্রকৃত অর্থ বিস্মরণের অতলে বিলীন হয়ে গিয়েছে সম্যক চর্চার অভাবে। আজকে তাই তন্ত্র বেঁচে আছে পূজাদির একটি আনুষ্ঠানিক অঙ্গমাত্র হয়ে। অথচ আমাদের দেশে যাঁরাই ধর্ম সম্বন্ধে সামান্যমাত্র চর্চা করেন তাঁরাই জানেন যে, বর্তমানে আমাদের হিন্দুধর্মে যে পঞ্চসম্প্রদায় আছেন, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ও সৌর নামে, তাঁদের সবায়েরই মূল ভিত্তি হচ্ছে এই তন্ত্র। তবু তন্ত্র লোপ পেল কেন—এ প্রশ্ন কেবলি কি মনে জাগে না ?

কিন্তু আজকের দিনে কোন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ঐ তন্ত্রকথিত ধর্মকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। কি করে পারবেন, এখন আর মানুষের এত অবসর সময় নেই যে, একাসনে বসে লক্ষ জপে নিযুক্ত হবেন। কিংবা গুরু-পুরোহিতের নির্দেশে তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সাধকের জীবন-যাপন করবেন। বর্তমানে তো ঐ গুরু-পুরোহিতরা তন্ত্রের গোপন জটিলতার কথাই নানাভাবে প্রচার করছেন। অথচ তন্ত্রকাররা সবাই বলে গিয়েছেন তন্ত্রের পথ অত্যন্ত সুগম ও প্রকাশ্য। তাঁরা বলেছেন—

গোপনাদ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতং বিনা।
তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্॥

—সত্যকে গোপন করলেই তা হেয় হয়ে যায়—কারণ গোপন করতে গেলেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কাজেই যিনি কৌলিক বা সমর্থতান্ত্রিক—তিনি প্রকাশ্য-ভাবেই সাধন করবেন—এই বিধি।

কিন্তু কোথায় তেমন সমর্থ তান্ত্রিক যিনি তন্ত্রসাধনার মূল সত্য প্রকাশ করে, সবাইকে সেই সাধনার মর্ম বুঝিয়ে দিয়ে সবায়ের সিদ্ধি ও সার্থকতা লাভের পথ সুগম করে দেবেন ?

তবে তন্ত্রেই একটি আশার বাণী পাই যে,—

অয়ন্তু পরমো মার্গো গুপ্তোঽপি পশুসংকটে।
ব্যক্তীভবিষ্যত্যচিরাৎ সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ॥

—যদিও এই তন্ত্রসাধনার মার্গ সব থেকে শ্রেষ্ঠ, তবু তা গুপ্ত হয়ে রয়েছে পশু সংকটে বা অজ্ঞানতার ঘোরে, যখনি কলি প্রবল হবে—তখনি তা ব্যক্ত হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলি প্রবল হবার লক্ষণ কি তাও ওই তন্ত্রেই দেখি—মনে হচ্ছে সেই বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে বর্তমান কালের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক। কিন্তু আবার সন্দেহও হয় যে, যদি সত্যিই সময় হয়ে থাকে তো এখনো কেন তন্ত্রের সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে না ?

আজকে যাঁরা তন্ত্র নিয়ে চর্চা করছেন তাঁদের উদ্দেশ্য তো দেখি জীবিকা অর্জন ও সম্প্রদায় গঠন। তাঁরা ঐ তন্ত্রে বর্ণিত নানা বীজ নিয়ে যেন পুঁটুলি বেঁধে বসে আছেন —কিসে তা থেকে ফলবান বৃক্ষ জন্মলাভ করতে পারে—তার চেষ্টা তো কই দেখি না তাঁদের মধ্যে। তাঁরা তো কই ভেঙে দিচ্ছেন না, নানা বীজ ও মন্ত্রের অর্থ। নেহাৎ অভ্যাসবশে পাখীর মতই শব্দগুলো উচ্চারণ করে যান তাঁরা। একবার কি ভাবেন না— অর্থ না বুঝে মন্ত্র উচ্চারণ করার অপরাধে কতখানি অপরাধী হচ্ছেন তাঁরা ?

এখানে একটি কথার উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, তন্ত্র অবলুপ্তির জন্যে মূলত দায়ী বোধ হয় শংকরাচার্য। বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ করে তিনি যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, ইতিহাসে পাই—তখন বহু বৌদ্ধ কাপালিক প্রাণভয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন, মন্ত্রগুপ্তির অভ্যাসও জেগেছে খুবই সম্ভবত সেই কাল থেকে। ফলে আজ তন্ত্র হেয়, অবজ্ঞাত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা যে হেয় নয়, অত্যন্ত মূল্যবান জীবনসাধনা—তার পরিচয় পাব তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অর্থভেদ করতে পেলে।

॥ তান্ত্রিক প্রক্রিয়া—শবসাধনা ॥

এখন শবসাধনার কথা বলি। শবসাধনা সম্পর্কে শোনা যায় যে, ঘোর অমাবস্যা রাত্রের নিশীথে কোন অপঘাতে মৃত চণ্ডালের শবসংগ্রহ করতে হবে অতি গোপনে। পরে কোন মহাশ্মশানে গিয়ে সেই রাত্রেই শবটিকে উত্তান বা চিৎভাবে শায়িত করে— তার হস্ত ও পদ বিস্তৃত করে দিতে হবে। আর চারটি খোঁটা পুঁতে শবের হস্তপদ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করতে হবে। তারপর সাধককে একপাত্র সুরা ও একপাত্র চরু নিয়ে শবের বুকের উপর বসে মন্ত্র জপ করে যেতে হবে নির্ভয়ে। সাধকের কাছেই কিছুদূরে উপস্থিত থাকবেন গুরু—যাঁর তান্ত্রিক নাম উত্তরসাধক অর্থাৎ যিনি সাধকের থেকে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছেছেন। তিনিই রক্ষা করবেন সাধককে সমস্ত বিঘ্ন ও বিপদ থেকে। সাধক যখন দেখবেন যে, শব তাঁকে আসনচ্যুত করবার চেষ্টা করছে—তখন ঐ সুরা বা চরু পর্যায়ক্রমে শবের মুখে দিয়ে নিরস্ত করবেন তাকে—ইত্যাদি অতি ভয়াবহ ও জটিল ক্রিয়াকাণ্ড ঘিরে আছে ঐ শবসাধনাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ বিবরণ শুনলে সাধারণ মানুষ তো সভয়ে শতহস্ত দূরে সরে যাবে, সাধনার সংকল্প পরিত্যাগ করে। কিন্তু এই সব রোমাঞ্চকর বিবরণকে ভেদ করে যদি ঐ শবসাধনার গূঢ় রহস্যটুকু বুঝে নিতে পাই—তা হলেই দেখব ঐ বিবরণের মূলে কি সত্য বিরাজ করছে। দেখা যাক সেই ভাবে এ বিবরণের মূলে পৌঁছান যায় কি না।

যদি শরীরবিজ্ঞানবিশারদদের মতে ব্যাখ্যা করা যায় ঐ প্রবাদগুলির তা হলে একটি সার্থক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পাই। এখানে আবার একবার বলে নিই যে, তন্ত্রের সাধনা যে শরীরবিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—তা পূর্বাচার্যরা বার বার বলে গিয়েছেন নানা ভাবে—বিশেষ করে এদেশে প্রচলিত দেহতত্ত্বের গানগুলি থেকেই তার নির্দেশ পাওয়া যায়। সন্ধানীরা জানেন যে-বৌদ্ধ আচার্যরা সন্ধ্যা-ভাষায় যে 'চর্যাপদ' নামে গানগুলি রচনা করে গিয়েছেন—তারও ভিত্তি ঐ দেহতত্ত্ব। সেই থেকে বৈষ্ণবদের গীতিকাব্যে ও শাক্তদের পদাবলীতেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই দেহতত্ত্বের। এখানে কেবলমাত্র রামপ্রসাদের একটি গানের উল্লেখ করেই বক্তব্য শেষ করি—অন্যথা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে এ প্রবন্ধ। রামপ্রসাদের গানটি এই—

কালী কালী বল রসনা রে।

*   *   *

(ও মন) ষট্‌চক্র রথমধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে।
তিনটে কাছি কাছাকাছি বাঁধা আছে মূলাধারে॥
পাঁচ ক্ষমতার সারথি তায় রথ চালায় দেশ দেশান্তরে।
(ও মন) ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হতে অন্তঃপুরে॥

—ইত্যাদি।

রথ হচ্ছে এই শরীর। ষট্‌চক্র তো এই দেহের মধ্যেই অবস্থিত কিন্তু সেগুলি কি, কেমন ও কোথায় তা জানতে হলে প্রয়োজন দেহের অভ্যন্তরভাগের জ্ঞান আহরণ করা বা সাদা কথায় অ্যানাটমী ও ফিজিওলজীর জ্ঞানলাভ করা। তিনটে কাছি বলতে তো বোঝায় ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। পাঁচ ক্ষমতা মানে পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু। আর ত্রিবেণী হচ্ছে ঐ তিনটি কাছি বা নাড়ীর সঙ্গম স্থান। এ সব তো মানুষের দেহের বাহ্য অংশটুকু দেখে বোঝবার নয়। বুঝতে হয় শবব্যবচ্ছেদ করে। সেই শবব্যবচ্ছেদরই তান্ত্রিক নাম কি শবসাধনা ?

তাই তো সন্দেহ হয়, বিশেষ করে যখন জানি যে—দেহতত্ত্ব শব্দটির আর এক অর্থই হচ্ছে শারীরবিজ্ঞান। বাস্তবিক পক্ষে কি কর্ম আর কি ধর্ম যে-কোন বিষয়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সিদ্ধিলাভ করতে চাই—তার প্রথম ও প্রধান সহায় হচ্ছে আমাদের এই শরীর। এই শরীরকে যদি বুঝে নিতে না পারি, যদি তাকে সুস্থ রাখার কৌশল আয়ত্ত করতে না পারি, তবে আর কি ফল ফলবে আমাদের জীবনে?

মনে পড়ে মহাকবি কালিদাস তাঁর রচিত 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যে ছদ্মবেশধারী শিবের মুখে একটি বাক্য পরিহাসচ্ছলে প্রয়োগ করেছেন—

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ ॥

—শরীর হচ্ছে সকল ধর্মসাধনের মূলস্বরূপ।

বাস্তবিকই এর মধ্যে একটি পরম সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাই এ বাক্য একটি জীবন্ত প্রবাদরূপে মুখে মুখে ঘোষিত হয়। আর শুধু আমাদের দেশেই নয়—অনুরূপ একটি প্রবচন ল্যাটিন ভাষাতেও শোনা যায়—

'মেন্ সানা এন্ করপোরে সানো'।

যার ইংরাজী প্রতিরূপ হচ্ছে—'সাউণ্ড মাইণ্ড ইন্ এ সাউণ্ড বডি'।

এই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যেই তো মানুষ নানা বিধিনিষেধ পালন করে বা চিকিৎসকের পরামর্শমতে ঔষধাদিও সেবন করে। তান্ত্রিক আচার্যরা চেয়েছিলেন প্রত্যেক মানুষকে শরীর সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে, তবে না মানুষ সুস্থ শরীরের সহায়ে সুস্থ মনোবৃত্তি লাভ করে সার্থক সমাজ সৃষ্টি করতে পারবে!

কিন্তু যা বলছিলাম, দেহতত্ত্বের গান বিশ্লেষণ করলেই জানা যায় যে, শারীরবিজ্ঞান দেহের অভ্যন্তরভাগের যে বর্ণনা দেয়, তারি কথা বলা হয়েছে ভিন্ন নামে। অর্থাৎ তান্ত্রিক পরিভাষা ও সংকেতগুলি, আয়ুর্বেদের পরিভাষা ও সংকেত থেকে বেশ বিভিন্ন —যদিও লক্ষ্য তাদের একই। তন্ত্রের সঙ্গে আয়ুর্বেদের আর এক বিশেষ পার্থক্য এই যে—আয়ুর্বেদ যেখানে ঔষধ ও আহারের অর্থাৎ বহিরাগত বস্তুর প্রয়োগে দেহীর বলাধান করে—তন্ত্র সেখানে কেবল এই দেহের অন্তঃস্থিত বস্তুগুলির সম্বন্ধে দেহীকে সচেতন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার পথ দেখায়। আর শরীরের ভিতরকার সম্বন্ধে জানতে হলে শবব্যবচ্ছেদ তো অবশ্য কর্তব্য, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু শব-আহরণ সম্বন্ধে ঐ যে তান্ত্রিক প্রবাদ আমরা শুনি তার উৎপত্তি হলো কি করে? এ বিষয়ে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে—বর্তমানে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের যে শবব্যবচ্ছেদ করানো হয়, তার জন্য শব কি ভাবে আহরণ করা হয়। এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলেন যে—শবব্যবচ্ছেদ করার জন্যে সেই সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শবই তাঁরা ব্যবহার করেন—যে সব শবের দাহাদি করবার লোক জোটে না, বা যে শব কেউ দাবী করে না।

এখন কি বেশ বোঝা যাচ্ছে না যে—তান্ত্রিকরা শবসাধনার জন্য যে শব সংগ্রহ করতেন, তা তাঁদের কত সন্তর্পণে সবদিকে লক্ষ্য রেখে তবে করতে হতো? কাজেই অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি ছাড়া তাঁরা শব সংগ্রহ করতেন না এবং কেবল অপঘাতে মৃত চণ্ডালের শবই নিতেন— যে শব স্পর্শ করবার পর্যন্ত লোক জুটতো না। গোপনে সে কাজ না করলে সমাজের সবাই যে তাঁদের বাধা দিতেন। যেমন আজো সবাই দেন, কোন শবের প্রতি কেউ যথেচ্ছ ব্যবহার করলে।

ব্যবচ্ছেদ করার জন্যে কেউই চান না আত্মীয়-পরিজনের শব চিকিৎসকদের কাছে দিতে—যদিও চিকিৎসকরা পারেন কোন শবকে ব্যবচ্ছেদ করার পরে, তা আবার নিখুঁতভাবে সেলাই করে দিতে, যা দেখে কেউই বুঝতে পারেন না সে শবকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল।

এ সম্বন্ধে বর্তমান কালের এক বিলেতফেরত ডাক্তার এই নিবেদন করেছিলেন যে— 'বর্তমানে বহু ব্যক্তি এমনই দুশ্চিকিৎস্য রোগে মারা পড়ছেন যে, তাঁরা কি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তা নির্ণয় করাই সম্ভব হয় নি। যদি সেই সব মৃতের উত্তরাধিকারীরা ডাক্তারদের কাছে শবটি ব্যবচ্ছেদ করবার জন্যে দেন, তা হলে সেই সব অনির্ণীত রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব হয়। ব্যবচ্ছেদের পরে অবশ্যই শবটিকে এমনভাবে সেলাই করে দিতে পারবেন ডাক্তাররা যে, কেউ ধারণাও করতে পারবেন না যে, শবটিকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল।'

এ প্রস্তাবটি দৈনিক যুগান্তর পত্রিকাতে বের হয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন উদারমনা ব্যক্তির খবর পেলাম না, যিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির জন্যে ঐভাবে কোন সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। আজকে তো মানুষ শিক্ষায় অনেকখানি অগ্রসর, তবু শব সম্বন্ধে কেউই অতখানি ঔদার্য দেখাতে পারেন না। সুতরাং ভালই বোঝা যায় যে সেই আগেকার দিনে কত কঠিনই ছিল ব্যবচ্ছেদের জন্যে একটি শব সংগ্রহ করা। সেই কথাই তো প্রকারান্তরে প্রকাশ পেয়েছে ওই তন্ত্রসাধনার জন্যে শব-সংগ্রহের বর্ণনা থেকে।

আবার ঐ যে বলা হয় যে, শবসাধনা করতে হবে মহাশ্মশানে গিয়ে—তারও তো বেশ অর্থ পাই। তন্ত্রশাস্ত্রে শ্মশান শব্দের অর্থ হচ্ছে শূন্য আগার। অর্থাৎ কোন নির্জন স্থানে বসেই শবব্যবচ্ছেদ করতে হয়। এখনো তো চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যে ব্যবচ্ছেদস্থানে ছাত্র ব্যতীত আর কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে। আর সেখানে অধ্যাপকও সর্বদা উপস্থিত থাকেন, ছাত্রদের বুঝিয়ে দেন শরীর-সংস্থানের নানা তথ্য ও তত্ত্ব। সেখানে অব্যবসায়ীর উপস্থিতি তো একেবারেই অবাঞ্ছনীয়। তবে পূর্বযুগে যে ব্যবচ্ছেদ একটি মাত্র ছাত্রকে নিয়ে করার বিধি ছিল বর্তমানযুগে সে প্রক্রিয়া বহু ছাত্রকে একত্রে নিয়েই করা হয়। কারণ তন্ত্রসাধককে শেষ পর্যন্ত নিজের দেহকে বুঝে নিতে হতো সম্পূর্ণভাবে—যা কেউ অন্যের সাক্ষাতে করতে স্বভাবতই সংকোচ বোধ করে।

॥ ষট্‌চক্রভেদ ॥

এবার ষট্‌চক্রভেদ কি তাই দেখা যাক। তন্ত্রশাস্ত্রে পাই—এই চক্র বা পদ্ম হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নানা নাড়ীবিশেষ। যাঁরা শবব্যবচ্ছেদ করেন নি—তাঁদের পক্ষে জানা আদৌ সম্ভব নয় শরীরের অভ্যন্তরে কোথায় কি ভাবে সেইগুলি অবস্থিত। এই চক্র বা পদ্মগুলির সঙ্গে আধুনিক শারীর বিদ্যার এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডগুলির সমধিক সাদৃশ্য আছে। তার কথা বিভিন্ন মনীষী আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গত বলি—এখনও হাতেকলমে শবব্যবচ্ছেদ না করে কোন শিক্ষার্থী কেবলমাত্র গ্রে সাহেবের 'অ্যানাটমী'র বই পড়েই এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে পূর্ণ শিক্ষালাভ করতে পারেন না। আগের দিনেও যেমন শবব্যবচ্ছেদ করেই চক্রগুলির অবস্থান ইত্যাদি জানতে হতো—আজকের দিনেও ঠিক সেই উপায়েই গ্ল্যাণ্ডগুলিকে চিনতে হয়।

অনেকে মনে করেন যে—চক্রগুলি হচ্ছে বর্তমান শরীর বিজ্ঞান মতে 'প্লেকশাস অব নার্ভস্'। কিন্তু সে কথা মানতে পারা যায় না এই কারণে যে, তন্ত্রশাস্ত্রেই আছে চক্র বা পদ্মগুলি থেকে মধু বা রস নিঃসরিত হয়। নার্ভ থেকে তেমন কোন রসের প্রবাহ জাগে না। রসপ্রবাহ বা হরমোন নিঃসৃত হয় গ্ল্যাণ্ডগুলি থেকেই। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাই নার্ভগুলি দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—মোটর নার্ভ ও সেন্‌সারি নার্ভ। মোটর নার্ভ প্রকাশ করে দেহের যাবতীয় ক্রিয়া, আর সেন্‌সারি নার্ভ প্রকাশ করে দেহের যাবতীয় অনুভূতি। অর্থাৎ নার্ভমাত্রেরই কাজ হচ্ছে সাড়া বা শিহরণ জাগানো, রস যোগানো নয়।

কিন্তু ঐ গ্ল্যাণ্ড থেকে যে রস বা হরমোন নির্গত হয়, তার হ্রাস-বৃদ্ধিতে দেহীর স্বাস্থ্যের হানি বা লাভ ঘটে। তাইত একান্ত প্রয়োজন শবব্যবচ্ছেদ করে ঐ গ্ল্যাণ্ড বা চক্রগুলির অবস্থান ক্রিয়া ও প্রকৃতি জেনে নেয়া—যাতে যত্ন নিলে সুস্থ রাখা যাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরকে। মনে পড়ে গেল রাজা অলর্ককে যোগরহস্য বোঝাতে গিয়ে স্বয়ং দত্তাত্রেয় বলেছেন—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং
শরীরং সাধনং যতঃ॥

—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ লাভ হয় শরীর রক্ষা করলে—তাই শরীরকে রক্ষা করার যত্ন অবশ্যই নিতে হবে।

তন্ত্রের পদ্ধতি যে যোগের পদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এ কথা বিশেষজ্ঞ-মাত্রেই জানেন।

এখন ওই চক্রভেদ করার আরও গূঢ় অর্থ কি তাই বিচার করা যাক। ভেদ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে—প্রকাশ বা ব্যাখ্যা। চক্রভেদ করার মূল কথা হচ্ছে তাই এই যে—কি প্রক্রিয়া মেনে চললে প্রতিটি চক্রকে প্রকাশিত বা সক্ষম করে তোলা যাবে তা জানা। আগেই তো জেনেছি যে চক্রগুলির নিয়মিত রসনিঃসরণের ওপরেই নির্ভর করে দেহীর স্বাস্থ্য। এই চক্রগুলিকে নিয়মিত করার জন্যে তান্ত্রিক ও যোগীরা বিশেষ বিশেষ আসন ও মুদ্রার উল্লেখ করে গিয়েছেন। তার বিবরণ পাই শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে। সেই আসন ও মুদ্রা অভ্যাস করলে কি চমৎকার ফল পাওয়া যায়, তা কারো অজ্ঞাত নয়।

এ সম্পর্কে বিখ্যাত ব্যায়ামাচার্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ঘোষ মশায়ের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। আজো কলিকাতার গড়পাড় অঞ্চলে তাঁর শিক্ষাগার রয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশ-বিদেশে ভারতীয় যোগ-ব্যায়াম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে এসেছেন তিনি বহুদিন আর এখনো নানা দেশে তার প্রয়োগ পদ্ধতির কি ফল, তা দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। এ সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী, তাঁরা ঘোষ মশায়ের সঙ্গে সংযোগ করতে পারেন।

এখানে কয়েকটি গ্ল্যাণ্ডের সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসকদের মতামত ব্যক্ত করলে বোধ হয় অবান্তর হবে না।

প্রথম ধরা যাক পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড—যার সঙ্গে তন্ত্র বা যোগশাস্ত্রকথিত আজ্ঞা-চক্রেরই অবস্থান মিলে যায়। এই পিটুইটারী থেকে যদি অধিক পরিমাণে রস (যা আয়ুর্বেদে উক্ত কফের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত) নিঃসৃত হয়—তা হলে দেহী বিরাট দানবাকৃতি লাভ করে, আবার রসের পরিমাণ অল্প হলে একেবারেই জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্বল হয়ে পড়ে—দেহের বৃদ্ধি আদৌ দেখা দেয় না।

কিংবা ধরা যাক হার্ট ও লাংগস্—বর্তমানে চিকিৎসাবিদ্‌রা যদিও এদের গ্ল্যাণ্ড বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে করেন না—কিন্তু মনে হয় তন্ত্র বা যোগশাস্ত্রে এটিকেই বলা হয় অনাহত পদ্ম। এই পদ্মের জন্যে দেহে আয়ুর্বেদোক্ত বায়ুর ক্রিয়া হয়, সেই বায়ু শোধন করে দেয় আমাদের শরীরের রক্তকে। এদের সহায়ক গ্ল্যাণ্ড হচ্ছে সুপ্রারেন্যাল। এই সুপ্রারে-ন্যালের মাধ্যমেই কাজ করে পিটুইটারি।

আবার ধরা যাক লীভার ও স্প্লীন, অবশ্য লীভারকেও আধুনিককালে গ্ল্যাণ্ড বলা হয় না। কিন্তু খুবই সন্দেহ হয় যে লীভার হচ্ছে তন্ত্রাদি শাস্ত্রে কথিত মণিপুর-পদ্ম। এই পদ্মেই হয় আয়ুর্বেদোক্ত পিত্তের ক্রিয়া। প্যান্‌ক্রিয়াস হচ্ছে এর সহায়ক গ্ল্যাণ্ড।

একথা বোধ হয় না বললেও চলে যে—আজ্ঞাপদ্মে কফের ক্রিয়া, অনাহত পদ্মে বায়ুর ক্রিয়া এবং মণিপুরপদ্মে পিত্তের ক্রিয়া কোন কারণে ব্যাহত হলে দেহী কতখানি পীড়াভোগ করে। সেই পীড়াকে দূর করা যায় যোগব্যায়াম অভ্যাস করলে—এ পরীক্ষিত সত্য।

এবার বোধ হয় ষট্‌চক্রভেদের মূল কথা কি তার একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। শরীরের মধ্যে যতগুলি মধুস্রাবী পদ্ম আছে—সেগুলি যাতে ঠিক সুষমভাবে রসনিঃসরণ করে তারি সম্যক প্রক্রিয়া হচ্ছে ষট্‌চক্রভেদ। সাধনা করার প্রথম দিকে শরীরকে নীরোগ করে তুলতে না পেলে সাধক আর অগ্রসর হবেন কি করে ?

আর এককথা—যদিও স্থূলভাবে ষট্‌চক্র অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনা-হত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র—এই ছ'টির কথাই প্রকাশ—কিন্তু সহস্রার নামে আরো একটি চক্র আছে। ঐ প্রথম ছ'টি পার হয়ে সেই সহস্রার চক্র পর্যন্ত আরোহণ করাই হচ্ছে শেষ কথা।

এ সম্বন্ধে আরো জানা যায় যে মূলে আছে দশটি চক্র। সেই দশটি চক্রের প্রত্যেকটি স্ফূরিত হয়ে উঠলেই তবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা হয়—যার ফলে নীরোগ শরীর লাভ করা যায়। পরিহাসচ্ছলে একটি প্রবাদ প্রায়ই আমরা বলি –'দশচক্রে ভগবান্ ভূত'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রবাদের মধ্যে একটি গূঢ় সত্য নিহিত আছে। এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ডও তো দেখা যায় সর্বসমেত দশটিই আছে। মানুষের শরীরে চক্রও আছে তেমনি দশটি। সেই দশটি চক্র সমভাবে রস-নিঃসরণ করলে—তবেই সাধক ভগবানের তুল্য শক্তিলাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ কুণ্ডলিনী ॥

এইভাবে শরীরকে বিশ্লেষণ করতে করতেই সন্ধানী মানুষ শেষ পর্যন্ত কুণ্ডলিনীর সন্ধান পেয়ে যান। সেই কুণ্ডলিনীকে বেদবর্ণিত সর্পরাজ্ঞীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন পণ্ডিতজন। কুণ্ডলিনীর বর্ণনা পাই—

সার্ধত্রিবলয়াকারা
স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিতা ॥

—সাড়ে তিন প্যাঁচ দিয়ে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করে থাকেন তিনি।

এই কুণ্ডলিনীকে তন্ত্রচার্যরা সর্প বলেই জানেন।

সাপমাত্রেই যখন ঝাঁপির মধ্যে থাকে, সাড়ে তিন প্যাঁচ দিয়েই মাথা নীচু করে থাকে, এ কথাটি স্মরণে রাখার।

যাই হোক, সেই পরম দেবতা কুণ্ডলী মূলাধারপদ্মে ঘুমিয়ে থাকেন—তাঁকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই জীবনে সর্বার্থসিদ্ধি ঘটে। বলা হয় আগে ষট্‌চক্রভেদ করে সমস্ত চক্রকে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করলে, তবেই কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন সম্ভব। বাস্তবিক-পক্ষে নীরোগ শরীর লাভ করতে না পারলে কেই বা পারেন জীবনে সাফল্য অর্জন করতে?

কিন্তু এই কুণ্ডলিনী বলতে বস্তুত কি বোঝায়? আমরা জানি মূলাধারপদ্ম থেকে যে রস নিঃসৃত হয়—তারি জন্য মানুষের বংশধারা বিস্তার লাভ করে। সেই রসের আয়ুর্বেদোক্ত নাম—রেতঃ। আধুনিককালে বৈজ্ঞানিকরা তো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই রেতঃ বা শুক্রকীটের রূপ কি তাও দেখেছেন—এবং শিক্ষার্থীদের জন্যে তার চিত্রও প্রস্তুত করেছেন। সত্যই সেই কীটের আকৃতি সর্পের মতো—সর্পের তুল্য ফণাও আছে তার এবং যখন নিষ্ক্রিয় থাকে, তখনও হয়তো সে সর্পের মতোই কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। তবে কি শুক্রকীটই কুণ্ডলিনী?

অথচ তন্ত্রশাস্ত্রে পাই -সেই কুণ্ডলিনী—

তড়িৎ কোটি প্রতীকাশং বা
সূর্যকোটি প্রতীকাশং
চন্দ্রকোটি সুশীতলং।

এর অর্থ করে নিতে গেলে তো—কোন কিছু নিশ্চয় করে ধারণা দুরূহ। অবশ্য এইভাবে যদি ব্যাখ্যা করা যায় যে—ওই শুক্রকীট পুরুষানুক্রমে বহু সূর্যের ও চন্দ্রের আলো ভোগ করেই তাদের তেজ ও শীতলতা আহরণ করে বর্তমান অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে—তা হলে বোধ হয় একটু গ্রহণযোগ্য হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ওদিক দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা না করে, বাস্তবের দিক থেকে বিচার করার চেষ্টা করা যাক। এ কথা তো স্বীকার করতেই হয় যে—একটি শুক্রকীট থেকেই একটি জীব উৎপন্ন হয়। আর সেই জীব যার মূল হলো বীজ—সেই শুক্রকীটকে তো উপনিষদের ভাষায় স্বচ্ছন্দে বলা যায়—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।

সেই বীজের শক্তি বিভিন্ন জীবের মধ্যে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় - এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। মানুষ যে-কোন পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠুক না কোন, তার একটি বিশেষ রকমের প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকে—যাকে সেই ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা বা ট্যালেণ্ট বলা যেতে পারে। এমন কোন মানুষ জগতে দেখা যায় না—যার কোন না কোন বিষয়ে সামান্যমাত্র প্রতিভা নেই। অবশ্য এ কথা মানতেই হয় যে, সুযোগ ও সুবিধার অভাবে এবং সাধনার অভাবেও, প্রত্যেকের সেই প্রতিভার যথোচিত বিকাশ ঘটে না। তার জন্যই প্রয়োজন গুরুর—যিনি দিশা দেখিয়ে দেন।

যদি প্রত্যেকের সেই প্রচ্ছন্ন প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয় সম্যক অনুশীলনের দ্বারা—তা হলেই কি সেই ব্যক্তিটি জীবনে সর্বসিদ্ধিলাভ করেন না? সর্বার্থসিদ্ধি তো তাকেই বলে—যখন দেখা যায় যিনি যা হবার জন্যে এই ভুবনে এসেছেন তিনি তাই হয়ে উঠেছেন—সেই পরিপূর্ণ প্রকাশ লাভ করাই তো পরম মুক্তি। তন্ত্রই সেই পরম মার্গের সন্ধান দিয়েছিলেন সবায়ের সামনে, কিন্তু আমরা তাকে তো অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছি নানা হীন আবরণ দিয়ে।

ওই প্রতিভার সম্বন্ধে আর একটু বলি। প্রতিভা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ হচ্ছে ট্যালেণ্ট। বাইবেলে পাই ওই ট্যালেণ্ট বলতে আবার প্রাচীন ইহুদীদের মুদ্রা বোঝাতো। সেই ট্যালেণ্ট নিয়ে চমৎকার একটি প্যারাবেল বা রহস্য কাহিনী আছে বাইবেলে। সেটি এই—

এক ধনী ইহুদীর তিনটি ক্রীতদাস ছিল। একবার ধনী কিছুকালের জন্যে বিদেশে যেতে বাধ্য হন। ক্রীতদাস তিনজনকে ডেকে প্রথম জনকে দশটি, দ্বিতীয় জনকে পাঁচটি ও তৃতীয় জনকে একটি ট্যালেণ্ট দিয়ে গেলেন। ক্রীতদাসরা সবাই জানতো যে তাদের প্রভু অতিমাত্রায় অর্থগৃধ্নু। যাই হোক—যথাসময়ে ধনী গৃহে ফিরে ডাকলেন ক্রীতদাস তিনটিকে। জানতে চাইলেন—'তোমাদের যে ট্যালেণ্ট দিয়ে গিয়েছিলাম, হিসেব দাও তামরা তা নিয়ে কে কি করেছ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম জন বললো—'প্রভু, আমি সেই দশ ট্যালেণ্ট কাজে লাগিয়ে আরো দশ ট্যালেণ্ট বাড়িয়ে ফেলেছি।'

দ্বিতীয় জন বললো—'আমিও আপনার দেয়া পাঁচটিকে দশটি করে তুলেছি, প্রভু।'

তৃতীয় জন বললো—'প্রভু, আমি তো জানি আপনি কত অর্থলোভী। যদি আপনার দেয়া ট্যালেণ্ট ফিরিয়ে দিতে না পারি, আপনি তো আমায় কেটেই ফেলবেন। তাই আমি সেটিকে যত্ন করে মাটিতে পুঁতে রেখেছি।'

তৃতীয় জনের কথা শুনে ধনী বললেন—'শীগগির নিয়ে এস সেই ট্যালেণ্ট।'

তৃতীয় জন সেই ট্যালেণ্টটি এনে দিলো-ধনী তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন—সে ট্যালেণ্টের ব্যবহার জানে না দেখে। আর দু'জনকে বললেন—'খুব খুশী হয়েছি তোমাদের ওপরে। তোমরা যে যা বাড়িয়েছ, তা তোমাদেরই থাক। আমিও যা তোমাদের দিয়েছিলাম—তাও তোমরা রাখ।'

প্রতিভাও তো তেমনি ঈশ্বরের দান। তা লাভ করেও যদি কেউ অনুশীলন না করে, তাহলে বলতে হয় ওই গল্পের তৃতীয় ক্রীতদাসের মতোই সে ট্যালেণ্ট পেয়েও তা হেলায় হারালো।

এখানে আমাদের দেশের প্রচলিত একটি গল্পও বলি। এক দেশে দুই ভাই ছিল—ভারি গরিব। কোনরকমে জীবিকা অর্জন করতে না পেরে, তারা দু'জনেই শিবদুর্গার আরাধনায় মন দিল। মা দুর্গা তুষ্ট হলেন তাদের আরাধনায়, শিবকে বললেন—'আহা, ওদের বড় কষ্ট। তুমি ওদের কিছু দাও।'

শিব তখনি কুবেরকে ডেকে বললেন—'দ্যাখ—ওদের দুভাইকে দু'গোলা ধান দাও!'

শিবের আজ্ঞায় কুবের তখনি সেই দুই ভায়ের বাড়িতে দু'গোলা ধান পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ধান পেয়ে দু'ভাই ভারি খুশী। বার বার প্রণাম জানালো শিব-দুর্গার উদ্দেশে। বড় ভাইটির দুর্বুদ্ধি দেখা দিল। সে ভাবলো—'এতো দিন বড় কষ্টে কেটেছে। এবার যখন দেবতার দয়ায় এক গোলা ধান পেয়েছি—তখন প্রাণভরে খেয়ে নিই ক'দিন।'

ছোট ভাইটি সুবোধ। সে ভাবল—'যে কষ্টে দিন গিয়েছে—আর যেন সে কষ্টে না পড়ি। দেবতার দয়ায় যা পেয়েছি খুব সাবধানে রেখে ঢেকে খাব—যাতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুখে যায়।'

অতি ভোজনের ফলে বড় ভাই তো দিন তিনেকের মধ্যেই গতায়ু হলো। ছোট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাই পরিমিত ভোজনের ফলে দীর্ঘজীবন লাভ করলো—শিব-দুর্গার দানে সারাজীবন সুখে কাটালো।

এই দু'টি গল্পই রূপক। দু'টি থেকেই এই সত্য প্রকটিত হচ্ছে যে, ঈশ্বর যা দিয়েছেন তার যদি সদ্ব্যবহার করি আমরা, যদি দুর্বুদ্ধি ও আলস্যবশে তা নষ্ট না করি—তা হলে ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলার পরম পুণ্যে জীবনে অবশ্যই সর্বসমৃদ্ধি লাভ করব। সেই সমৃদ্ধি লাভ করাই তো হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের ঐকান্তিক কামনা।

॥ তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ॥

বাস্তবিকপক্ষে যাঁর মধ্যে যে শক্তি আছে, তিনি যদি সেই শক্তির যথাসাধ্য চর্চা করে যান—তাতেই তো মিলবে তাঁর সিদ্ধি। অর্থাৎ যা হবার জন্যে তিনি এসেছেন পৃথিবীতে—তিনি ঠিক তাই হয়ে উঠবেন। এই ভাবে যদি আমরা প্রত্যেকে দেহে, প্রাণে, মনে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পাই, তবে আর তার থেকে বেশী কি আনন্দময় অবস্থার উদ্ভব হতে পারে বিশ্বভুবনে?

তখনি তো আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখে, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখব। মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করতে না শেখে, তার পারিপার্শ্বিককে শ্রদ্ধা করতে না শেখে তবে আর কি সমাজ সৃষ্টি হবে? অশ্রদ্ধার জন্যে যেখানে কেবলি চলে হিংসা, বিরোধ আর মাৎস্যন্যায়—সে সমাজ তো পশুদের সমাজ—সে কি মানুষের কাম্য? মানুষ যে চায় জ্ঞান ও শান্তিতেপূর্ণ আনন্দময় সমাজ সৃষ্টি করতে। সেই জ্ঞান ও শান্তি লাভ করার উপায় তো জেনেছি আমরা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা থেকে—তাতে পাই—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং
তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাশান্তিম্
অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥—৪।৩৯ ॥

—যিনি শ্রদ্ধাবান্, যিনি সদা সচেষ্ট, যিনি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নন, তিনিই জ্ঞানলাভের অধিকারী। আর জ্ঞান যিনি লাভ করেন, তিনি অচিরে পেয়ে যান পরমা শান্তি।

সেই শ্রদ্ধা, সেই চেষ্টা, সেই ইন্দ্রিয়জয় শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব—যিনি জানতে পেরেছেন তাঁর নিজের শক্তিকে। শক্তিকে যে জাগাতে পারে নি, চিনতে পারে নি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে কিসের জোরে পারবে কোন কিছুকে শ্রদ্ধা করতে, সর্বদা উদ্যমশীল হতে বা ইন্দ্রিয়কে জয় করতে? এখানে গীতার ঐ অধ্যায়ের পরবর্তী শ্লোকটিও উদ্ধৃত না করে পারছি না—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ
সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো
ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

—যে জ্ঞানলাভ করতে পারে নি, যে শ্রদ্ধাবান্ নয় সে সংশয়ের মধ্যে থেকেই বিনষ্ট হয়। তার না আছে ইহলোক না আছে পরলোক—সংশয়ের জন্যে কোন সুখ সে কখনোই পায় না।

তন্ত্রের কথা বলতে কেন গীতার কথা টেনে আনছি—তাও বলি। গীতায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তন্ত্রের মধ্যেই আছে তার সাধনার প্রক্রিয়া—তাই তন্ত্র ও গীতা একেবারে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত।

কিন্তু যা বলছিলাম, তন্ত্র চেয়েছিলেন সেই মহতী বিনষ্টি থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে। সবাইকেই দিতে চেয়েছিলেন সেই ব্রহ্মজ্ঞান। কে জানে, হয়তো সেই কারণেই তন্ত্র আজ অবলুপ্ত। কারণ সংকীর্ণমনা মানুষ তো সর্বদাই ভয় পায় প্রতিবেশীর সমৃদ্ধি দেখে। এ কথা ভাবে না যে, এ জগতে প্রত্যেকটি মানুষই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—তাই একজনের সমৃদ্ধিতে কখনো হানি ঘটে না অপর কারো। যেমন আকাশমণ্ডলে প্রত্যেকটি গ্রহের কক্ষপথ বিভিন্ন। তাই গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষের কোনই সম্ভাবনা নেই—তেমনি এই ভূমণ্ডলেও জীবমাত্রেরই ক্ষেত্র বিভিন্ন, তাই কারো বৃদ্ধিতে পার্শ্ববর্তী কারো হ্রাস ঘটার কোনই আশঙ্কা নেই—কারণ জীবমাত্রেই তো যাযাবর। স্থাবর যে বৃক্ষলতাদি তাদের মধ্যেও দেখি—স্থানের অভাব সত্ত্বেও কিভাবে বক্রপথে তারা সূর্যের দিকে মাথা তোলে। এই আত্মশক্তি যে প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত। কিন্তু যে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়—একেবারে অচৈতন্য—তার এ বোধ কেমন করে জাগবে?

তাই তো একান্ত প্রয়োজন প্রত্যেকের শক্তিকে সাধনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা—যার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে জ্ঞান ও শান্তি। আর সেই কারণেই মানুষ যেদিন বস্তুবিচার করতে করতে আপনার অন্তরস্থ শক্তির সন্ধান লাভ করলো—সেদিন থেকে বিচার ও প্রচার করতে চাইলো কি প্রক্রিয়ায় সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। তন্ত্রের মধ্যেই আছে সেই প্রক্রিয়াগুলির সবিস্তার উল্লেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাই হোক, যদিও বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন থেকেই তন্ত্রচর্চার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, কি ভাবে মানুষ শক্তিকে উপলব্ধি করলো আর কি রূপেই বা তার সাধনা করার পথ নির্ধারণ করলো—তবু একথা না মেনে পারা যায় না যে—মানুষ তার অন্তরস্থ শক্তিসম্বন্ধে সচেতন হয়েছে আরো বহু প্রাচীনকাল থেকেই। তাই অথর্ববেদের মধ্যেও তন্ত্রসাধনার বীজ সন্নিহিত রয়েছে দেখা যায়। আর মানুষের প্রকৃতি ও অনুসন্ধিৎসা বিচার করে দেখলে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে লক্ষ্য করেই মানুষ নিজের শক্তিসম্বন্ধে উপলব্ধি লাভ করেছে, সমগ্র মানব সভ্যতার অতি প্রত্যুষেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পর্ব

॥ শক্তির রূপকল্পনা ॥

॥ রূপ-কল্পনার আবশ্যকতা ॥

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা তো তন্ত্রের অন্তর্গত দেহতত্ত্বের কিছু কিছু বিচার করবার চেষ্টা করলাম। এবার ক্রমশ যতো তন্ত্রের গভীরে প্রবেশ করব, ততো জানতে পাব তার মধ্যে প্রাণতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে কেমন নির্দেশ সন্নিবিষ্ট আছে। সেই পথেই প্রথম পাই শক্তির রূপকল্পনার কথা।

রূপকল্পনার আদিতে ছিল নাদ ও বিন্দু, আবার দেখি শেষেও সেই নাদ ও বিন্দু। এই নাদ ও বিন্দু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। মানুষের অঙ্কনবিদ্যা বা সাদা কথায় রেখাটানা ও লেখা-লেখনের প্রথম শুরু হচ্ছে বিন্দু থেকে, এ কথা পণ্ডিতজনেরা জানিয়েছেন। রেখাবিজ্ঞানের যে বিশেষ বিভাগ—জ্যামিতি, তাতেও বিন্দুকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মানা হয়। তাতে বিন্দুর সংজ্ঞা পাই—যার অবস্থান আছে, কিন্তু আয়তন নেই—তারই নাম বিন্দু।

॥ বিন্দু শব্দের নির্বচন ও ধর্ম ॥

বিন্দতে বা প্রকাশয়তে অনেন ইতি বিন্দুঃ এই হচ্ছে বিন্দু শব্দের নির্বচন। এই বিন্দুই সব কিছুকে প্রকাশ করে। আবার তার যে সংজ্ঞার কথা আগেই বললাম তাতে পাচ্ছি তার অবস্থানের কথা। অবস্থান শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ হচ্ছে পোজিশান। পোজিশান শব্দটির মূল হচ্ছে পোজিট—যার থেকে পজিটিব শব্দটিও নিষ্পন্ন হয়। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা তো প্রমাণ করেছেন যে বিন্দু, যার অন্য অর্থ শুক্রকীট, তা বিদ্যুৎ-ধর্মী এবং পজিটিব এনার্জীর দিকেই ঢলে পড়ে। এই তার ধর্ম বা স্বভাব, এটি ধনাত্মক।

॥ নাদ শব্দের নির্বচন ও ধর্ম ॥

নাদ শব্দটির নির্বচন হচ্ছে—ন অদতি ইতি নাদঃ—অর্থাৎ ইনি কিছু গ্রাস করেন না। জীবসৃষ্টির মূল প্রক্রিয়ায় তো দেখি ডিম্বকীট বা স্ত্রী-বীজের মধ্যে শুক্রকীট বা পুংবীজ প্রবেশ করে। সাধারণভাবে মনে হয় যে, প্রকৃতি যেন পুরুষকে গ্রাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করছেন—কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঘটে ঠিক উল্টোটাই। কিছুকাল পরে প্রকৃতি বৃহত্তর রূপ দিয়ে পুরুষকে প্রসব করেন। এই নাদ আঁকা হয় একটি আর্ক বা চাপের মতো করে—সম্পূর্ণ সার্কল বা বৃত্তটির আভাস মাত্র দিয়ে। বাস্তবিকই এই নাদ কোন বাধা দেয় না বিন্দুকে প্রসারিত হতে—সেই কথা বোঝাবার জন্যেই কি পূর্ণবৃত্ত বা পরিধি না দেখিয়ে তার একটিমাত্র অংশ দেখান হয় চাপ এঁকে? আবার এই নাদ যার অন্য অর্থ স্ত্রীবীজ—তাও ঐ রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের মতে বিদ্যুৎ-ধর্মী—যা নেগেটিব এনার্জীর দিকে ঢলে পড়ে, এ তার ধর্ম বা স্বভাব, এটি ঋণাত্মক।

তন্ত্র থেকেও আমরা জানতে পাই যে, প্রকৃতিই সাকার রূপে সেই নিরাকার পুরুষ বা ব্রহ্মকে প্রকাশ করছেন—কিন্তু আসলে ব্রহ্ম হচ্ছেন আবিঃ বা স্বপ্রকাশ—গীতার মতে বীজপ্রদ পিতা বা ক্ষেত্রজ্ঞ—প্রকৃতি শুধু ক্ষেত্ররূপে তাঁর বিস্তারের পথ করে দেন। কিন্তু এ গভীর কথা থাক—সাধারণ রূপ-কল্পনার কথাই বলি।

॥ ব্রহ্মের রূপ-বিকাশ ॥

শক্তিকে যে উপলব্ধি করতে হয় প্রাকৃতিক বস্তুবিচার করতে করতে তার কথা আমরা জেনেছি। সেই বিচারকে অনেকে বলেন প্রকৃতি বেদ। কিন্তু সেই ভাবে তো পাই শুধু উপলব্ধি মাত্র, যাকে সত্যিই অনির্বচনীয় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তারি সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়োপনিষদে পাই—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥

বাস্তবিক—বাক্য সেখান থেকে ফিরে আসে—মনও যেন কিছু ধরার মতো বস্তু খুঁজে পায় না। তবে আবার কেন চেষ্টা সেই অবাঙমানসগোচরকে রূপ দেবার?

এ সম্বন্ধে তন্ত্রেই বলা হয়েছে—

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

—সাধকের হিতের জন্যে নিরাকারকে সাকার করে তোলা হয়েছে। কেন? কি হিত হয় তাতে?

হিত কিছু হয় বৈ কি। যাঁরা কেবল নিরাকার ভাব নিয়ে থাকেন—তাঁরা তো জড়ত্ব লাভ করেন—এই সংসারের কোন কাজেই আর তাঁরা যোগ দিতে পারেন না। শাস্ত্রেও পাই—সাধক যখন তুরীয়ভাবে পৌঁছে যান—তখন হয়ে যান সমাধিস্থ। সেই সমাধিস্থ সাধককে দিয়ে আর জগৎ-কার্য সম্ভব হয় না—তখন তিনি আর সাধক থাকেন না, হয়ে যান সিদ্ধ তাঁর ভাব বা অনুভূতি নিয়ে। কিন্তু সমাজরক্ষার বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিরক্ষার জন্যে এমন কি কারণ আবশ্যক, যা কেবল ভাব বা অনুভূতি নয়—যাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায় বা দান ও গ্রহণ করা যায়। সেই ধরা ছোঁয়া দেবার জন্যেই তো স্বয়ং ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপ ধরে জাগছেন আমাদের সম্মুখে। এই দেখেই তো সম্ভব হয়েছে ভাগবত শক্তির রূপ ফুটিয়ে তোলা।

প্রসঙ্গত এখানে সাধারণভাবে একটু বিচার করা যাক—ভাবের লোকে যিনি পৌঁছে যান—তাঁর অবস্থা কেমন হয়। আমরাই যখন কোন শ্রুতিসুখকর বা দর্শনসুখকর বিষয়ে আকৃষ্ট হই—তখন মন যেন এক অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়ে যায়। তখন কেবলি এই ইচ্ছা হয় যে, এই ভাবটি যেন কেউ ভঙ্গ করে না দেয়। সেই অবস্থা মানুষকে একেবারেই বিচ্যুত করে দেয় কর্মশক্তি থেকে। তখন যেন আর বাহ্যচৈতন্যও থাকে না। সেই অবস্থার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ পাই এই গল্পটি থেকে—

বাপ বসেছেন বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দাবাখেলায়। যখন খুব জমেছে খেলা—হঠাৎ খবর এলো—'তোমার ছেলেকে সাপে কেটেছে।'

বাপ তখন এমনি মত্ত খেলায় যে, ঐ খবর তাঁর মনের মধ্যেই প্রবেশ করলো না। প্রশ্ন করলেন—'কাদের সাপ?' বাস্তবিক কোনভাবে মত্ত হলে এই অবস্থাই হয় মানুষের।

তাই বেশ মনে হয় যে—ভাব বা আনন্দমগ্ন মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্গুণ সদানন্দময় ব্রহ্মকে কল্পনা করা হয়েছে সগুণা, ক্রিয়াময়ী বা নৃত্যময়ী কালীর পদতলে। কর্মের সঙ্গে নৃত্য যে কতখানি অচ্ছেদ্য, তার পরিচয় পাই আচার্য যাস্কের নিরুক্ত থেকে—সেখানে দেখি নর শব্দটির নির্বচন হচ্ছে—নৃত্যতি কর্মসু অর্থাৎ কাজ করতে গেলেই যে নৃত্য করে তারি নাম নর। বাস্তবিকপক্ষে যে কোন কাজই তো জাগায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে স্পন্দন—সেই স্পন্দন নৃত্যের-ই অন্য নাম।

যাই হোক, বুকের ওপর দিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে চলেছেন কালী, তাঁর দিকে কোনই ভ্রূক্ষেপ নেই শিবের, তিনি আপন আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। কিন্তু এও তো সত্য যে, সেই আত্মানন্দে বিভোর ব্যক্তি সৃষ্টির কোন কাজেই আর নামতে পারেন না। তাই সাধারণ মানুষ কোন সমাধিস্থ সাধুকে দেখে পরম শ্রদ্ধায় প্রণাম অবশ্যই করে—কিন্তু তাঁর কাছে কোন কিছু নিশ্চিত নির্দেশ না পেয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই ফিরে আসে। যেখানে কোন প্রকাশ নেই, কানে শোনার, চোখে দেখার বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করার কোন বস্তু নেই, সেখানে গিয়ে কোন সাধারণ মানুষই তৃপ্তি পায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথচ সেই প্রকাশমাত্রেই হচ্ছে বেদনাময়। বাস্তবিকপক্ষে আদ্যাশক্তিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করলে—তাঁকে তো আর আনন্দময়ী বলে মনে হয় না, মনে হয় তিনি বেদনাময়ী। মনে পড়ে রামকৃষ্ণদেবের কথা। যখন কোন ভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'মা কালীকে কেন আমরা উলঙ্গিনীরূপে ধ্যান করি?'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চিরাচরিত সহজ কথায় উত্তর দিয়েছিলেন—'ওরে, বিশ্ব-প্রসব করছেন যিনি, তাঁর কি সময় আছে কাপড় পরবার?'

কথাটি চিন্তা করবার। প্রসূতিমাত্রেই জানেন—প্রসবের বেদনা কি কঠিন! বিশ্ব-প্রসব করছেন যিনি, যাঁর থেকে প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীব জন্মলাভ করছে—তিনি যে কি পরিমাণ বেদনা বোধ করেন—তা সত্যিই অনুমান করা যায় না। তবে সেই সঙ্গে এ কথাটিও স্মরণে রাখবার যে—প্রসূতিমাত্রেই নবজাত সন্তানের মুখ দেখে প্রসবের সমস্ত বেদনা তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হন, গভীর বাৎসল্যরসের আনন্দে আপ্লুত হয়ে যান। কাজেই বলা যায়—জগৎ-সৃষ্টির মূলে আছে যেমন বেদনা, তেমনি জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে অপূর্ব আনন্দ। আর বেদনার অন্তে পাওয়া আনন্দ বলেই—প্রকাশের আনন্দ অনুভূতির আনন্দের থেকে বহু গুণে বেশী।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমেই উল্লেখ করা যায় কবি, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর প্রমুখ যাঁরা ঈশ্বরদত্ত সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী, তাঁদের কথা। তাঁরাও সবাই জানেন, যে কোন ভাবকে অনুভব করা যত আনন্দময়, প্রকাশ করা ততোধিক বেদনাময়—তবু তা অতি আনন্দের। আর সেই বেদনার শেষে যে আনন্দ জাগে তা অতি লোভনীয় বলেই—ভাবুকের মনে যখন কোন ভাব জাগে, তখন তা প্রকাশ করার জন্যে তাঁর কি ব্যাকুলতাই না জাগে! অন্তরস্থ ভাব যেন অগ্নির মতোই দাহ জাগায়—দাহে অস্থির হয়ে ওঠেন ভাবুক। তাইত হয়, কারণ, ভাবমাত্রেই হচ্ছে আবিঃ—এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। প্রকাশ হওয়াই তার ধর্ম। তাই সমস্ত বাধা ভেদ করে সে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের মধ্যেও তো সেই রহস্য রয়েছে। শক্তিকে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। তাই দেখি, ঋগ্‌বেদের নাসদীয় সূক্তে 'কাম' নামে সেই কথা প্রকাশ পেয়েছে। সে কাম অগ্নিতুল্য—যে অগ্নি তার জন্মস্থানকে পর্যন্ত ভস্মসাৎ করে।

মনে পড়ে বুদ্ধদেবের কথা, সিদ্ধি লাভ করে কি আকুল হয়ে তিনি সবাইকে তা দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন, কিংবা চৈতন্যদেবের কথা, মহাভাব বা রাধাভাব লাভ করে কি উপায়ে দ্বারে দ্বারে তা প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন, কিংবা রামকৃষ্ণদেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা, ভাবে আকুল হয়ে কি কাতরতাই তিনি প্রকাশ করেছিলেন ভক্তসমাগমের জন্যে। ভাব লাভ করে ভাবুকরা কি উন্মাদের মতো আচরণ করেছেন যুগে যুগে, তার বহু প্রমাণই এখানে জড় করা যেতে পারে, কিন্তু বাহুল্য ভয়েই বিরত হচ্ছি।

॥ রূপ-কল্পনার ক্রমবিকাশ ॥

ঠিক ঐ কারণেই মানুষ যখন তার অন্তরস্থ শক্তিকে উপলব্ধি করলো—তাকে যথাযোগ্য রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সাধ এই যে, পূজো করবে সেই শক্তিকে, সবায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

এই পূজোর প্রবৃত্তি মানুষের মনে দেখা দিয়েছিল স্মরণাতীত কাল থেকেই। মানববিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন সেই যুগে মানুষ প্রকৃতির নানা লীলার মধ্যে নানা ভয়ঙ্কর শক্তির প্রকাশ দেখে পূজো করতে আরম্ভ করে। তখন তারা বন্যা, ঝড়, বজ্র, বিদ্যুৎ, দাবানল, ভূমিকম্প প্রভৃতি সব কিছুকেই পূজো করতো। বৈদিক যুগের ঋষিরাও তো দেবতা বলে যাঁদের নামে মন্ত্র রচনা করে গিয়েছেন—তাঁরা মূলত প্রাকৃতিক শক্তির নানা প্রকাশ। ক্রমে উন্নততর বুদ্ধির মানুষ সেই প্রাকৃতিক শক্তিকে আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণ করেন। মোটকথা, সেই আদি যুগে যেখানে মানুষ ভয় পেয়েছে, বিস্ময় বা আনন্দ বোধ করেছে, সেখানেই নিবেদন করেছে হৃদয়ের শ্রদ্ধা। তারই ফলে জগতে বৃক্ষপূজা, পশুপূজা, মহামারী বা মৃত্যুপূজা, প্রেত বা পিতৃপূজা প্রভৃতি বিবিধ পূজার প্রচলন দেখা দিয়েছে। জড়পূজারও বহু নিদর্শন সেই প্রাচীনকাল থেকে উৎপত্তি লাভ করে আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে।

ক্রমে মানুষের বোধ জাগতে লাগলো। প্রসারিত হতে লাগলো জীবনদর্শনের পরিধি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কি অন্ত আছে অনুসন্ধিৎসু মানুষের? শেষ পর্যন্ত সে সব থেকে বিস্ময়কর আবিষ্কার করলো তার নিজের মধ্যে—আত্মশক্তিকে। জগতের ইতিহাসে এর থেকে মহৎ আবিষ্কার আর কি আছে?

কিন্তু আবিষ্কার করলেই তো হবে না - সেই আত্মশক্তির অনুভূতিকে যদি প্রকাশ করার মতো রূপ না দেয়া যায়, তবে তা কি করে সর্বজনগ্রাহ্য হবে? একা আনন্দ করে তো মানুষ তৃপ্তি পায় না—দল বেঁধে আনন্দ করাই যে তার স্বভাব। তাই তো অনুভূতিগ্রাহ্য শক্তির রূপ না দিয়ে সে পারলো না। কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষের চেয়ে কোন বৃহত্তর বা মহত্তর রূপ কল্পনা করতে পারে না, তাই ঈশ্বরকেও কল্পনা করেছে একটি বিরাট মানুষের মতো করে—যার প্রমাণ পাই ঋগ্‌বেদের পুরুষ সূক্তে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ—

ভেবেছে তাঁর হাজার হাজার মাথা, হাজার হাজার চোখ, হাজার হাজার পা আছে। পরবর্তী যুগে অবশ্য আমরা যে সব দেবদেবীর প্রতিমা গড়ে পূজো প্রবর্তন করি তা কিন্তু ঠিক এমনটি নেই। তা হলেও সেই দেবদেবীরাও যে সর্বশক্তিমান—এ বিশ্বাস ভক্তমাত্রেই রাখেন।

স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক এমনি কথা বলে গিয়েছেন যে, মানুষ ঈশ্বরের কল্পনা করেছে বলেই তাকে বৃহৎ ও মহত্তের চূড়ান্ত মানুষরূপেই বোঝে। যদি মাছ ঈশ্বরের কল্পনা করতো, সে বৃহত্তম মাছ বলেই বুঝতো। এমন কেন হয়? তার উত্তর বোধ হয় আমরা এই শ্লোকাংশ থেকেই পেতে পারি—

'যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' ॥

ভাবনা বা ভাবই তো দানা বেঁধে ওঠে রূপে।

যার যেমন ভাব।
তার তেমন লাভ ॥

কারোর সাধ্য নেই নিজের ভাবনার ঊর্ধ্বে যাবার। তাই তো যদিও জানি যে, ঈশ্বর এই তাবৎ জড়জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা—তবু চাই আমরা তাঁকে মানুষ-রূপেই। সম্বোধন করি তাঁকে মানুষের প্রতি মানুষ যে আত্মীয়তাসূচক বা শ্রদ্ধাসূচক সম্ভাষণ করে—সেই ভাবেই। বলাই বাহুল্য এই বোধ মানুষের একদিনে অতর্কিতে আসে নি—তার কিছু আলোচনা পূর্বেই করেছি। আবার আমাদের দেশে প্রচলিত দশাবতারের মধ্যেও রয়েছে তেমনি আভাস। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতিকে যে দেবতা বলে স্বীকার করে নিয়েছি আমরা—আমাদের ঈশ্বরকল্পনার ক্রমপর্যায়ই তার মধ্যে নিহিত নয় কি?

বেশ বোঝা যায় এর থেকে যে, মানুষ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, যতো অগ্রসর হতে লাগল—ততো সে আরো ভাল করে চিনতে লাগলো—তার আপনার মধ্যে কি শক্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল। আর ততোই সে জড়-পশু-প্রেতাদির পূজোর সঙ্গে, নানা দেবদেবীর রূপ-কল্পনা করে পূজো করতে শিখলো। ডাক পড়লে শিল্পী-সাহিত্যিকদের—যাঁদের স্বভাবই হচ্ছে ভাবকে রূপায়িত করা। সেই শিল্পীরা যে মূলে সবাই ভাবুক ও সাধক তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা যতোই বিচিত্র উপায়ে রূপদান করতে লাগলেন তাঁদের অন্তর্নিহিত ভাবের, ততোই তা সর্বসাধারণের মনে সাড়া জাগাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলো। ঐ প্রকাশের মাধ্যমে সমস্ত সমাজ একটি সংহত অবস্থা লাভ করলো, প্রবর্তিত হলো মূর্তিপূজা। কে জানে, যে কালে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা ছিল তেত্রিশ কোটি, সেই কালেই তেত্রিশ কোটি দেবতার রূপ দেয়া হয়েছিল কি না! কারণ মনের ভাবতো প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র, তাই তার রূপ দিলে প্রত্যেক ভাবই পৃথক হতে বাধ্য।

তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ভারতে এখনো পর্যন্ত যত সংখ্যক স্ত্রী-দেবতার পূজা হয়, তত সংখ্যক পুরুষ-দেবতার পূজা হয় না। আর পুরুষ-দেবতামাত্রকেই পূজা করতে হয় শক্তিসমন্বিত অবস্থায় অর্থাৎ সস্ত্রীক।

॥ রূপ-কল্পনার সার্থকতা ॥

কিন্তু সাধকের কি হিত হয় রূপ-কল্পনায় তার সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করা যাক। যে-কোন বিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে একেবারে সেই বিদ্যার মূলতত্ত্বে প্রবেশ করা অতীব কঠিন—এ সত্য শিক্ষা-ব্যাপারে জড়িত পণ্ডিতজনের অজ্ঞাত নয়। শিক্ষায় প্রতীক প্রয়োগ তাই আজকের দিনে একটি সর্বসম্মত পথ।

এখানে বলে রাখি—যখন শব-সাধনা ও ষট্‌চক্রভেদ করার ফলে, সাধকের শরীর-ক্ষেত্রটি উপযুক্ত হয়ে উঠলো—তখনি তাতে বীজ বা মন্ত্র বপন করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান না হলে, প্রাণতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের পাঠ নেয়া সম্ভব নয়। যাঁরা কেবল দেহসাধনা করে থাকেন, তাঁরা জীবনের একদেশদর্শী সাধক হয়ে ওঠেন। আমাদের জীবন তো কেবল দেহসর্বস্ব নয়, প্রাণ ও মন যে তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। এই তিনটির সম্যক্ অনুশীলন করলে তবেই পারি আমরা জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে। সেই তো জীবনের পরম সিদ্ধি।

দেহ তো একেবারে বাহ্য বস্তু—তাই তাকে বুঝে নেবার জন্যে কোন প্রতীকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রাণ ও মন হলো আরো গভীরের বস্তু, তাই তাদের বুঝে নিতে হলে প্রতীক ব্যতিরেকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কারণ কোন ভাবগ্রাহ্য অনুভূতিকে নিয়ে আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারি না।

শিশুদের শিক্ষা দিতে গেলে তাই শিক্ষাবিদ্‌মাত্রেই কিণ্ডারগার্টেন অথবা মণ্টেসরি সিস্টেম প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন। সেই দুই পদ্ধতিতে শিশুর কাছে কেবলি গল্পচ্ছলে ভাবগত উপদেশ না দিয়ে; নানা বস্তু, মূর্তি ও প্রতীকের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আমাদের দেশেও তো দেখি, কেবলি রূপকথা না শুনিয়ে ছোটদের কাছে ধরে দিই আমরা নানা খেলার বস্তু। সেই সমস্ত খেলার মধ্যে একটি অপূর্ব খেলা হচ্ছে—পুতুল-খেলা। আমাদের ছোটরা কি ভাবে সেই পুতুল-খেলার মাধ্যমে সুগৃহস্থ ও সুগৃহিণী হয়ে ওঠার শিক্ষা পায়, তা চোখের ওপরেই দেখতে পাই। কি চমৎকার ভাবেই না ছোটরা নকল করে তাদের বাবা, মা, দাদা, বৌদি, ঠানদি, মাষ্টারমশাই প্রভৃতির চরিত্র—তা একটু আড়াল থেকে দেখলে বড়রাও বিস্মিত হয়ে যান।

ভুললে চলবে না যে, ওই পুতুল-খেলাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—খেলার মাধ্যমে সত্যিকারের সংসারধর্ম পালনের যোগ্যতা অর্জন করা। তেমনি মূর্তিকে পূজা করাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার সাধনা করা। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

এখন ঐ ছোটদের কথা আর একটু বলি। দেখা যায়, যখন কোন কারণে অভিভাবকরা ছোটদের জন্যে খেলার পুতুল যোগাড় করে দিতে পারেন না, তখন ওই ছোটরাই কি চমৎকার নিজস্ব উপায়ে মাটি বা কাপড়-টুকরো দিয়ে মনোমত পুতুল তৈরী করে নিয়ে খেলার সখ মেটায়। এর থেকে স্বভাবতঃই কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না যে, মনের সাধ বা ভাবকে রূপ দেবার প্রবৃত্তিটি হচ্ছে মানুষের সহজাত ?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা আমাদের খবর দিয়েছেন যে, মানুষ যখন অরণ্যচারী, গুহাবাসী ছিল, কোন শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শ লাভ করে নি—তখনও তারা নানা দৃষ্ট জন্তুর চিত্র গুহাগাত্রে অঙ্কন করতো। জার্মানী ও ফ্রান্সের বেশ কয়েকটি গুহায় এখনো সেই সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন রয়েছে এবং সেগুলি সযত্নে রক্ষা করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ভাবকে প্রকাশ করার এই সহজাত শক্তি পেয়ে মানুষ কি রূপ-কল্পনা না করে পারে ? আরো একটি কথা—এখনও তো দেখা যায় কোন নতুন নগর কি অট্টালিকা, কি সেতু, কি উদ্যান ইত্যাদি নির্মাণ করার আগে তার প্ল্যান বা মডেল তৈরী করে নেন স্থপতিরা। সেই ক্ষুদ্র প্রতীকটি থেকেই উত্তরকালে রচিত হয়ে উঠে, অপূর্ব স্থাপত্যের একটি বিরাট রূপ। আবার ঐ ক্ষুদ্র প্রতীকটিতে এমনভাবে সমস্ত বিশেষ বিবরণ নিহিত থাকে যে, তারি আদর্শে বৃহত্তর স্থাপত্য সৃষ্টি করার কোনই অসুবিধা হয় না স্থপতির, নির্ভুলভাবে এগোতে পান তিনি নির্মাণের কাজে।

প্রতীকপূজার মাধ্যমেও ঠিক সেই ভাবে সাধক এগিয়ে যাবার পথ পান উত্তরোত্তর মহত্তর জীবন লাভ করতে। স্বামী বিবেকানন্দও তো জানিয়েছেন যে, বিশাল পৃথিবীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিনতে হলে যেমন মানচিত্র দেখার অভ্যাস করা প্রথমে দরকার, যদিও মানচিত্রটাই পৃথিবী নয়—ঠিক সেই ভাবে শক্তি বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানতে বা ধারণা করতে হলে প্রথম দরকার প্রতীক-পূজার, যদিও এই প্রতীক শক্তি বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নয়। এই জন্যেই তন্ত্রে বলা হয়েছে যে, সাধকের হিতের জন্যেই ব্রহ্মের রূপকল্পনা অত্যাবশ্যক। সেই আকার হচ্ছে অভীষ্ট সাধনের সহায়মাত্র, সম্বল বা শেষ ফল নয়—পথ মাত্র, গন্তব্য নয়। এইখানে কবীর দাসের একটি দোঁহার উল্লেখ করলে অবান্তর হবে না। তিনি বলেছেন—

ভীতর থৈঁ যব বাহির আওয়া।
সিত সকতি দ্বৈ নাঁও ধরাওয়া॥

—ভিতরের থেকে যখন বাহিরে এলো, শিব যখন ভাব থেকে রূপ লাভ করলো, তখনই তার নাম হলো শক্তি। এইভাবেই শিব আর শক্তি এই দুয়ের উৎপত্তি। বাস্তবিক অভীষ্টকে কায়মনোবাক্যে উপভোগ করতে হলে—তার নাম ও রূপ-কল্পনা করা ছাড়া উপায় নেই।

॥ শক্তির নারীমূর্তি বিশ্লেষণ ॥

এবার দেখা যাক্ শক্তিকে কেন নারীরূপে কল্পনা করা হলো?

এর প্রথম সূত্রপাত মনে হয় ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে 'সর্পরাজ্ঞী'র উল্লেখ থেকে। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞান কি সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছে দেহসৃষ্টি সম্বন্ধে তারি একটু খবর নেয়া যাক্। এ প্রসঙ্গে স্বনামধন্য কেনেথ ওয়াকার সাহেবের রচিত—'দি ফিজিওলজি অব্ সেক্স্' বইখানির প্রতি সবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেই বইখানিতে ওয়াকার সাহেব প্রকাশ করেছেন যে, জীবসৃষ্টির আদি পর্বে কেবল নারীবীজ বা ফিমেল ক্রোমোজোম ছিল, নরবীজ বা মেল ক্রোমোজোম ছিল না। কালক্রমে বিবর্তনের ফলে সেই আদিম নারীবীজ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে নরবীজ। এ সত্য প্রকাশের ফলে তন্ত্রে প্রকাশিত কাহিনীই প্রমাণিত হয়েছে। তন্ত্রে পাই সৃষ্টির প্রথম পর্বে একা আদ্যা-শক্তিই ছিলেন নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করে। কালে তাঁর তিনটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করলো—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সদাশিব নামে। এতোকাল তন্ত্রের এ কাহিনী নিছক কাহিনী বলেই ধারণা করতেন অনেকে। কিন্তু ওয়াকার সাহেবের সূত্র থেকে তো বেশ প্রমাণ জাগছে যে, তন্ত্রের সত্য রীতিমত বিজ্ঞানভিত্তিক।

আবার সংবাদপত্রসেবী মাত্রেই জানেন যে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একটি বিচিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংবাদ সবাইকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। ইওরোপের একটি সুস্থ সবল পুরুষ, যে ঐ যুদ্ধে সৈনিক ছিল—যুদ্ধের শেষে নারী-জীবন-যাপন করার বাসনায় চিকিৎসকের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করিয়ে নারীত্ব লাভ করে এবং ক্রিশ্চিয়ানা নাম গ্রহণ করে স্ত্রীজীবন যাপন করতে শুরু করে। এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে বাস করে একটি নারী। তাই অস্ত্রোপচার করার দ্বারা পুরুষের পক্ষে নারীত্বলাভ করা আদৌ অসম্ভব নয়। আরও একটি কথার উল্লেখ করা এখানে অবান্তর হবে না যে, ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবেরও পর পর কয়েক মাস স্ত্রীধর্ম দেখা দিয়েছিল। অনেকেই একথা বিশ্বাস করতে চান না কিন্তু ঐ ক্রিশ্চিয়ানা-সংবাদ জানার পরে রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রীত্বলাভ সম্বন্ধে আর কি তর্ক তোলা যায়?

সাধনার নিগূঢ় রহস্যই তো এই যে—ঠিক ঠিক ভাবে সাধনপদ্ধতি মেনে জীবন-যাপন করলে স্বাভাবিক ভাবেই এই দেহের বিচিত্র পরিণতি ঘটে। এ রহস্য সাধকদের অজ্ঞাত নয়। প্রকৃতপক্ষে সাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে এই দেহ, প্রাণ ও মনের আমূল বিবর্তন। দেখা যায়, যাঁরা ভাবুক বা মনীষী কেবল ভাব নিয়ে মত্ত থাকেন, তাঁরাও ধীরে ধীরে স্ত্রীত্বলাভ করেন। কিন্তু সে কথা থাক।

এই বিবর্তনে প্রকৃতি কতখানি সাহায্য করে তার কথাও কিছু বলি। মেডিক্যাল কলেজে এমন বহু রোগিনী মধ্যে মধ্যে আসেন যাঁদের প্রথম জীবন কেটেছে নারীরূপে, বিবাহের পর দেখা যায় তাঁরা ধীরে ধীরে পুরুষত্বলাভ করছেন। চিকিৎসকরা বলেন হরমোনঘটিত বিচিত্র প্রভাবেই এমন হওয়া সম্ভব। আরও এক কথা নারী ও পুরুষের দেহসংস্থান বিচার করলে দেখা যায় যে—নারীর শরীরের অভ্যন্তরে যে যন্ত্রগুলি সন্নিবিষ্ট, সেই যন্ত্রগুলি দেহের বহির্ভাগে প্রকাশিত হলেই নারী হয়ে যায় পুরুষ। পুরুষকেও নারী করা যায় উলটো পথে।

ওয়াকার সাহেব যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তার সম্বন্ধে আরো একটু আলোচনা করি। তিনি বলেন—স্ত্রীবীজ হচ্ছে একস-একস ক্রোমোজোম্, আর পুংবীজ হচ্ছে একস ওয়াই ক্রোমোজোম্। জীবসৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণে একটি একস-একস ও একটি একস ওয়াই ক্রোমোজোম্ জরায়ুর মধ্যে মিলিত হয়। সেই দু'টি বিন্দু বা তন্ত্রের পরিভাষায় নাদ ও বিন্দু একীভূত অবস্থায় স্বভাববশে পুনঃ পুনঃ দ্বিগুণিত হয়ে আঙুরের থোলো বা শামুকের ডিমের মতো চাক বেঁধে জরায়ুর মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করে। প্রথমবার দ্বিগুণিত হবার পরে একস-একস ক্রোমোজোমটির উদ্‌গম হলে, জাতক হয় নারী আর একস-ওয়াই ক্রোমোজোমটির উদ্‌গম হলে, জাতক হয় পুরুষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত প্রবাদ অন্য কথা বলে। আমরা বিশ্বাস করি পিতৃবীজ ও মাতৃবীজ সমশক্তির হলে জাতক হয় ন-পুংসক, পিতৃ-আধিক্যে পুরুষ আর মাতৃ-আধিক্যে স্ত্রী হয়ে ওঠে জাতক। মোটকথা—কি নারী আর কি পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সুপ্ত আছে উভয়বীজের শক্তি, যাকে জীববিদ্যায় বলা হয় উভয়লিঙ্গ বা হার্মাফ্রোডাইট। সেই তো অর্ধনারীশ্বর শিবের রূপ।

শারীরবিজ্ঞানের দিক থেকে যা সত্য, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের দিক থেকেও তা অসত্য নয়। প্রাণীজগতের আদি তো হচ্ছে ওই উদ্ভিদ্‌রা। দেখা যায় উদ্ভিদ্ মাত্রেরই হয় ফুল ফোটে, নয় ফুল ফল দুইই হয়। উদ্ভিদ্‌দের মধ্যে নরশ্রেণী নেই বললেই হয়, অতি অল্প সংখ্যক বৃক্ষাদি দেখতে পাওয়া যায় যাদের ফুল-ফল হয় না। আবার প্রাণীবিজ্ঞান থেকেও জানতে পাই যে—নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে কেবল ওই নারীশ্রেণীই আছে। তার উদাহরণ হচ্ছে মৎস্য, মৎস্য মাত্রেই ডিম্ব প্রসব করে থাকে। পুং-মৎস্য শব্দটি নেহাৎ প্রবাদ বলেই মনে হয়।

এবার একটু আমাদের দর্শন শাস্ত্রের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। পণ্ডিতজনেরা বলেন যে, সাংখ্যদর্শনের সত্যই ক্রমবিকাশ লাভ করেছে তন্ত্রে। সেই সাংখ্যদর্শনে পাই—জগৎ সৃষ্টির মূলে আছেন পুরুষ। তিনি নিরঞ্জন, নিরীহ, নিরাকার, নির্গুণ উদাসীন শুধু নন, অবাঙ্‌মানসগোচর। তাঁরি ইচ্ছা স্ফুরিত হয় প্রকৃতির মধ্যে। সেই প্রকৃতি হচ্ছেন সাকারা, সগুণা। অর্থাৎ পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবময়ী প্রকৃতি। কে জানে, সেই কারণে তাঁকে "বিপরীতরতাতুরা" বলে ধ্যান করা হয় কি না। যদিও বিপরীতরতাতুরা শব্দটির প্রচলিত অর্থ একেবারেই অশ্লীল। তাই তো বার বার সন্দেহ হয় যে, আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত ধ্যান বা প্রণাম মন্ত্র অথবা বীজ বলে যে সমস্ত শব্দসমষ্টি অথবা শব্দাংশ আছে, তার মর্মার্থ অতলে মজ্জিত হয়েছে চর্চা ও সাধনার অভাবে। যাক সে কথা।

পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সাংখ্যদর্শনে যা জানা যায়, সেই সত্যটিকে একবার সহজভাবে বিচার করার চেষ্টা করা যাক। রামকৃষ্ণদেব সন্ত কবীরদাসের নাম করে বলতেন—নিরাকার আমার বাবা, সাকার আমার মা।

এ সম্বন্ধে একটি দোহাও তিনি শোনাতেন—

নির্গুণ মেরে বাপ সগুণ মহ্‌তারি।
কাকো বন্দোঁ কাকো নিন্দোঁ দোনো পাল্লা ভারি॥

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, যাঁরা ভারতীয় মতে করকোষ্ঠী বিচার করেন তাঁদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিভাষায় করতলস্থ দু'টি রেখার নাম হচ্ছে—মাতৃরেখা ও পিতৃরেখা। পিতৃরেখার বর্ণ ও আয়তনাদি বিচার করে জাতকের মননশক্তি বা অনুভূতির আর মাতৃরেখার বর্ণ ও আয়তন থেকে বাক্‌শক্তি বা প্রকাশ ক্ষমতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। বাস্তবিকপক্ষেও দেখা যায়, সন্তানকে অনুভূতি যুগিয়ে দেন পিতা আর প্রকাশ যুগিয়ে দেন মাতা। আবার সন্তানের পালন ও পোষণের দিক থেকেও দেখি পিতা যতটুকু সাহায্য করেন প্রত্যক্ষ ভাবে, মা তার থেকে ঢের বেশী সাহায্য করে থাকেন। সন্তানকে তো পিতার ঔরসজাত বলা হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পিতার মধ্যে সন্তানের বীজগুলি পরমাণুরূপেই থাকে—যা প্রায় অনুভূতিগ্রাহ্য। সেই পরমাণুসত্ত্বাকে রূপদান করে যথাযথভাবে তাকে প্রকাশ করে তোলেন মাতা। তাই তো তাঁর এক নাম গর্ভধারিনী, অন্য নাম প্রসবিনী।

আরো বিবেচনা করার আছে এই যে—দৈহিক গঠনের দিক থেকে স্বাভাবিক সামর্থ্য থাকায়, মা পারেন সন্তানকে স্তন্যদান করে বেশ কিছুকাল ঘনিষ্ঠ সঙ্গ দান করতে। পিতা কিন্তু তা পারেন না, স্বাভাবিক সামর্থ্যের অভাব থাকায়। তাই দেখা যায় শিশুর কাছে পিতা যেন হয়ে পড়েন দূরের জন, প্রায় নিরাকার অনুভূতিস্বরূপ। মা চিনিয়ে দিলে তবেই শিশু ধীরে ধীরে পিতাকে চেনে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে সম্ভ্রমের বা ভয়ের স্থানে বসায়। কিন্তু মা সন্তানের অত্যন্ত কাছের জন, সব দিকে সর্বদা তিনি রক্ষা করেন সন্তানকে, তাই তাঁর স্থান পরম ভালবাসার ও পরম ভক্তির। মা কত কাছের আর বাবা কত দূরের জন, তার অতি সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এই বহু প্রচলিত শ্লোকাংশটিতে—

ভূমের্গরীয়সী মাতা
স্বর্গাদুচ্চতরো পিতা॥

কত গরীয়সী মা? না, একেবারে এই ভূমি বা পৃথিবীর মতই, মাটির মতই বা তার থেকেও বড় মা। এই মাটি কেমন? না, যার ওপর শুয়ে পড়ছি, বসছি, চলাফেরা করছি, গড়াগড়ি দিচ্ছি। এতো কাছের, এতো আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ এই মাটির সঙ্গে—এই তো মায়ের প্রতীক। কে জানে, এই কারণেই মূর্তিপূজার আদি যুগ থেকে মৃন্ময়ী মূর্তি রচনার আদর্শ জেগে উঠেছে কিনা!

অন্যদিকে বাবা কেমন? না, স্বর্গের চেয়েও উঁচু। সেই স্বর্গ কোথায়? না, আকাশের পারে, ফলে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না—শুধু বোঝা যায় কল্পনা বা অনুভূতির মাধ্যমে। বাবা হলেন সেই স্বর্গের চেয়েও উঁচু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন কেবল পিতার কথা বলা হয়েছে—তখন তো পাই—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ ॥

কিন্তু যখন কেবল মায়ের কথা বলা হয়েছে—তখন দেখানো হয়েছে—

জননী-জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

—মা ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে মাকে যেন বাবার চেয়েও বড় বলা হচ্ছে। বিশেষ লক্ষ্য করার যে, এ শ্লোকাংশটিতে জননী আর জন্মভূমি শব্দ দু'টিকে এক সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে।

মা যে বাবার থেকেও বড় সন্তানের কাছে তার একটি অপূর্ব প্রমাণ পাই ছান্দোগ্য-উপনিষদে সত্যকাম জাবালের উপাখ্যানে। ঋষি গৌতম যখন তাঁর গোত্র-পরিচয় জানতে চাইলেন, সত্যকাম ছুটে গেলেন মায়ের কাছে বাবার নাম-গোত্র জানবার জন্যে। বাস্তবিক মা ছাড়া আর কেই বা জানাতে পারেন সন্তানকে তার পিতৃপরিচয়? তন্ত্রেও তো পাই—মা মহামায়ার কৃপা লাভ হলে, তবেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঘটে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তুলসীদাসের একটি চৌপাই, যার উল্লেখ রামকৃষ্ণদেবও করতেন—সেটি হচ্ছে—

আগে রাম অনুজ পুনি পাছে।
মুনিবরবেষ বনে অতি আছে॥
উভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসী।
ব্রহ্ম জীব বীচ মায়া জৈসী॥

—বনে যাবার সময় আগে চলেছেন রাম, পিছনে চলেছেন লক্ষ্মণ, দু'জনেই ধারণ করেছেন সুন্দর মুনিবেশ, আর তাঁদের উভয়ের মধ্যে চলেছেন সীতা। দেখাচ্ছে যেন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যস্থিত মায়ার মতো।

সীতা চলার সময় পা তুলতে গিয়ে যখন একদিকে হেলে পড়ছেন—তখনি রামের দর্শন পাচ্ছেন লক্ষ্মণ। অর্থাৎ সীতার প্রতি পদক্ষেপেই লক্ষ্মণ রামের দর্শনলাভ করছেন। সেই সীতা বা মায়া যদি ঐ ভাবে হেলেদুলে চলাফেরা না করেন, লক্ষ্মণ বা জীবের পক্ষে কোনদিনই আর রাম বা ব্রহ্মকে দর্শন করার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। সীতা বা মহামায়ার দিব্যজ্যোতি তো অন্ধ করে দেয় লক্ষ্মণ বা জীবকে। তাই মহামায়ার কৃপা না হলে, কোনো উদ্ধারের পথ নেই জীবের। কিন্তু সে অন্য কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা বলছিলাম, মাতাই জীবসৃষ্টির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রকাশময়ী—এ সত্য সেই স্মরণাতীত কালের ব্রহ্মবিদ্‌রাও বুঝতেন। তার বহু প্রমাণই তাঁরা রেখে গিয়েছেন তন্ত্রশাস্ত্রে। মেধস্ মুনি, যাঁকে পণ্ডিতজনেরা বশিষ্ঠের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন—তিনি যখন রাজা সুরথকে মহামায়ার চরিত বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন চণ্ডী সপ্তশতীর মধ্যে, তখন তাই দেখি স্বয়ং ব্রহ্মার মুখে এই স্তব শোনালেন –

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং
স্থিতিরূপা চ পালনে॥

—তুমিই সৃষ্টিরূপিনী হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছো, আবার স্থিতিরূপিনী হয়ে তুমিই করছো সবাইকে পালন।

যে শক্তি সৃজন ও পালনের ক্ষমতা রাখে তাকে নারীমূর্তিতে কল্পনা করার বৈগুণ্য আবার কি থাকতে পারে? আজো তো আমাদের দেশে নারীমাত্রকেই আদ্যাশক্তির অংশ বলে বিশ্বাস করা হয়। শুধু তাই নয়, কুমারী মেয়ে ও সধবা নারীর পূজা করার বিধানও আছে তন্ত্রে। এখনো শাক্তজনেরা তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন।

প্রসঙ্গত মনে আসে, বৈষ্ণবজনদের কিশোরীভজনার কথা। মূলত বৈষ্ণব ও শাক্তমত যে একই সাধনপদ্ধতির দু'টি প্রকাশ, সন্ধানী মাত্রেই তা অবগত আছেন।

॥ শক্তির নারীমূর্তি কল্পনায় মাতৃগতকুলের অবদান বা উপাদান ॥

আদ্যাশক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করার আরো একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, শক্তির রূপকল্পনা প্রথম যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন মাতৃগতকুলের মানুষ। এমনও হওয়া বিচিত্র নয় যে, নারীরাই প্রথম নারীদেবতা পূজা করার প্রবর্তন করেন। এ সন্দেহ আরো দৃঢ় হয় সুমেরিয়া ও গ্রীস দেশের দেবীপূজায় নারী-পুরোহিতের প্রাধান্যাদির ইতিহাস পাঠ করে। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত যে সব ব্রতপার্বনের কথা বা ছড়া প্রচলিত আছে, তার মধ্যেও তো দেবীপূজার পুরোহিত দেখি নারীরা। আবার মঙ্গলকাব্যের যে সব দেবী-কাহিনী পাই, যাঁদের পূজা আজো করি আমরা, যেমন চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি—তাঁদের সবারি পূজা তো শুরু করেছিলেন নারীরা গৃহকোণে বসে। তাই নিয়ে বিষম বিরোধ ঘটেছিল তাঁদের পুরুষ-দেবতাপূজক স্বামীদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত দেবীদের কোপে পড়ে স্ত্রীদের নির্দেশেই স্বামীরাও বাধ্য হয়েছিলেন দেবীদের পূজো করতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাই হোক, এখন মাতৃগতকুলের কথাই বলি। মানববিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা এই তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন যে, মাতৃগতকুলের উদ্ভব ঘটেছিল দুই ক্রান্তিরেখার মধ্যবর্তী পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডল-খণ্ডে। এখনো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী ও আদি-বাসীরা নারীরূপা শক্তি বা স্ত্রীদেবতার পূজা করেন। আরো লক্ষ্য করার যে, স্ত্রীদেবতা মাত্রেরই পূজা হয় চান্দ্রমাসের তিথি অনুযায়ী। এটি বিশেষ করে ওই মাতৃগতকুলের অবদান—চান্দ্রমাস গণনা তাঁরাই প্রথম শুরু করেন।

আবার আদ্যাশক্তির পূজার প্রশস্ত সময় হচ্ছে নিশাকাল। শিবও যে ওই মাতৃগত-কুলের দেবতা তার বিশেষ প্রমাণ এই যে—শিবের পূজার শ্রেষ্ঠ তিথি হচ্ছে শিবচতুর্দশী বা শিবরাত্রি। গ্রীষ্মমণ্ডলের লোকরাই নিশা জাগরণের পক্ষপাতী, কারণ দিবাভাগে প্রচণ্ড বিষুব-সূর্য গ্রীষ্মমণ্ডলে অগ্নিবৃষ্টি করে তখন সেই দারুণ দাহে অবসন্ন হয়ে তারা নিদ্রা দিতেই ভালবাসে। সে সময়ে কোন পূজা, উৎসব বা আনন্দ করার স্পৃহাই তাদের জাগে না। কে জানে, গ্রীষ্মমণ্ডলের লোকে নিশাযোগেই বেশী ক্রিয়া কর্ম করতো বলেই 'নিশাচর' নামে বিখ্যাত হয়েছিল কিনা। তবে এ ধারণা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে, গ্রীষ্মমণ্ডলের মানুষ রাত্রিচর ছিল বলেই চান্দ্রমাস গণনা করার পথ খুঁজে পেয়েছিল। চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি লক্ষ্য করতে হলে নিশাজাগরণ না করলেই নয়। মনে পড়ে গেল চন্দ্রকে আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়—"অত্রিনেত্র সমুদ্ভব।" অর্থাৎ অত্রির নেত্র থেকেই চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। আসলে হয়তো এই সত্য যে, অত্রিই প্রথম চন্দ্রকে দেখতে দেখতে জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিত্তিস্থাপন করেন। তবে অত্রিমুনি যে প্রথম জ্যোতির্বিদ্ তার প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রে আছে।

নিশাচরদের সম্বন্ধে আরো কিছু বলে নিই। সন্ধ্যার সময়ে আমাদের বাংলা দেশে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বেলে শংখধ্বনি করা হয়। সন্ধ্যাকে এমন সম্বর্ধনা জানানোর অর্থ কি? শাস্ত্রে তো পাই সন্ধ্যার নাম—রাক্ষসীবেলা। তাই ঐ সন্ধ্যায় প্রদীপ-দানের রীতিকে রাক্ষসীরীতি বলেই যেন সন্দেহ হয়। রাক্ষসদেরই তো অন্য নাম নিশাচর।

অথচ প্রভাতবেলাকে সম্বর্ধনা জানানর এমন কোনই প্রথা নেই—এ কথা স্মরণে রাখার। কেন প্রভাতকে এমন সম্বর্ধনা জানান হয় না, তা ভাবতে গেলেই তো মনে হয় গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্য পীড়ার সৃষ্টি করে, চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধকর সে নয়।

আবার পূজার স্থানে মঙ্গলদীপ জ্বেলে দেয়া বা দেবী দুর্গার সন্ধিপূজায় দীপমালা রচনা, আকাশপ্রদীপদান, দেওয়ালির দীপাবলী প্রথাও মনে হয় ঐ অবৈদিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশাচরদের দান। আগুন জ্বালাতে শিখে তাঁরা যজ্ঞ করতেন না তাপের ভয়ে, প্রদীপ জ্বালার জন্যেই আগুনকে ভালবাসতেন।

॥ গ্রীষ্মমণ্ডল ও আদিম সভ্যতা ॥

এখানে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে—এই গ্রীষ্মমণ্ডল থেকেই মানুষের সভ্যতা সারা পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করেছে। এই তথ্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আমেরিকার স্বনামধন্য লেখক মার্টন্ বেটস্ সাহেব—তাঁর রচিত 'হোয়ার উইণ্টার নেভার কাম্স্'—পুস্তকখানিতে। কাজেই এ কথা স্বভাবতই মনে উদয় হয় যে—এই গ্রীষ্মমণ্ডলের মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল আত্মশক্তি সম্বন্ধে চৈতন্যলাভ ও তার রূপকল্পনা করা।

আবার এক কথা, আদ্যাশক্তিকে নৃত্যময়ী বলে যে কল্পনা করা হয়, সেই নৃত্যও প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল এই গ্রীষ্মমণ্ডলে। আজকে তো পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন যে, সভ্যতার এক বিশেষ অঙ্গ এই নৃত্যরীতি। অথচ এই নৃত্যরীতি প্রথম দেখা দেয় দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে, তথা দক্ষিণ সমুদ্র-সেবিত দ্বীপগুলিতে। এ শুধু পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধ সম্বন্ধে নয়, পশ্চিম গোলার্ধ সম্বন্ধেও প্রমাণিত সত্য। এখনও পর্যন্ত নৃত্যের চর্চা ওই সব অঞ্চলে সর্বাধিক প্রচলিত।

নৃত্য যে একেবারেই সামুদ্রিক এ তথ্য মানববিজ্ঞানীরা তো প্রমাণ করেছেন—আবার দক্ষিণ ভারতের কথাকলি-নিত্যবিদ্‌রাও বলেন—নৃত্য জেগেছিল সমুদ্র থেকেই। পুরাণাদিতেও পাই যে, ইন্দ্রসভার নর্তকী উর্বশী জেগেছিলেন সমুদ্র থেকেই। আমাদের দেশে তো এই নৃত্যের আদিগুরু হচ্ছেন নটরাজ শিব আর তাঁরই অর্ধাঙ্গিনী মহাদেবী কালী। নৃত্যের পরীক্ষাতে ঊর্ধ্বতাণ্ডবে অপারগ হয়ে কালী শিবকে স্বামীরূপে বরণ করেন—এ কথা অতি প্রসিদ্ধ ওই দক্ষিণ ভারতের নৃত্যকুশলীদের মধ্যে। কিন্তু বাংলায় প্রচলিত রামেশ্বরের 'শিবায়ণ' কাব্যে পাই যে, কালীই দশমহাবিদ্যা রূপধারণ করে অথবা নৃত্য ক'রে শিবকে আকৃষ্ট করেন। সেই শিব তো ছিলেন প্রথম কুবেরাদি যক্ষদের ও পরে রাবণাদি রক্ষদের কুলগুরু বা কুলদেবতা। রক্ষরা তো বাস করতেন সমুদ্রবেষ্টিত লঙ্কাদ্বীপে যেখানেই কুবেরও প্রথমে বাস করতেন। সব থেকে মজার কথা—শিবেরই অন্য নাম হচ্ছে সমুদ্র।

নৃত্যের সম্বন্ধে আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে যতগুলি পুঁথি; তার মধ্যে মুনি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণ' আর দক্ষিণ ভারতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হস্তলক্ষণদীপিকা' নিয়ে যা কিছু চর্চা মূলত চলে দক্ষিণ ভারতেই। ভারি আশ্চর্য লাগে দেখে যে—নৃত্যের যে একশো আটটি করণ আছে নাট্যশাস্ত্রে তার সঙ্গে যোগীদের মধ্যে প্রচলিত যোগব্যায়ামের আসনগুলি আর যে সব মুদ্রা আছে তার সঙ্গে পূজায় ব্যবহৃত মুদ্রাগুলি বেশ মিলে যায়। অবশ্য কি ইওরোপে আর কি ভারতবর্ষে যত কিছু বিদ্যার চর্চাই প্রথম শুরু হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করেই—একথা আমরা জেনেছি ঐতিহাসিকদের কাছে। ধর্ম-সাধনার সঙ্গেই যে মানুষের যত কিছু বিদ্যার স্ফুরণ প্রথম ঘটে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ও কথা থাক।

॥ শক্তির মাতৃরূপ ॥

শক্তির রূপকল্পনায় গ্রীষ্মমণ্ডলের মানুষ কতখানি সাহায্য করেছিল—তার কথাই বলি। গ্রীষ্মমণ্ডলে ছিল মাতৃগতকুলের সমাজ। যে সমাজে মা ছিলেন অধিরাজ্ঞী—সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল তাঁরি অধিকারে। তাই মাতৃগতকুলের লোক যখন শক্তির রূপ দিতে চাইলেন, তাঁরা তাঁকে নারীরূপেই প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁদের ধারণাই ছিল না যে নারীর থেকে অধিকতর শক্তিমান সত্ত্বা আরো কিছু থাকতে পারে।

আবার এক কথা, বর্তমান যুগের পণ্ডিতরা তো নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে, কৃষির প্রবর্তন করেছেন আদিমকালে নারীরাই। এই গ্রীষ্মমণ্ডলেই আদিকাল থেকে কর্ষণোপযোগী ভূমি বর্তমান। তাই কৃষি যে গ্রীষ্মমণ্ডলের সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ তা বলাই বাহুল্য। শক্তিপূজার সঙ্গে ঐ কৃষির কতখানি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা আরো পরিস্ফুট হবে এই আলোচনায়।

বৈদিক যুগের সাহিত্যে সোম বা চন্দ্রকে বলা হয়েছে ওষধির অধিপতি। ওষধি বলে সেই সব উদ্ভিদকে যেগুলি শস্য পক্ক হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে যায় বা মারা পড়ে, সেই ওষধি থেকেই মানুষ পায় প্রাণধারণের অন্ন। ঐ দেবী বা শক্তিরও তো এক নাম—অন্নপূর্ণা। তার থেকেও মজার কথা—কৃষির দেবী ইস্তারার রূপবর্ণনায় যেমন আমরা জেনেছি তাঁর মাথায় চন্দ্রের কিরীট থাকে—আমাদের দেশের দেবীদের ধ্যানেও দেখি তেমনি ব্যাপার। সব থেকে বিস্তৃত ধ্যান পাই দু'টি দেবীর, একটি হলেন আদ্যাশক্তি, অপরটি দেবী দুর্গা।

নিরুত্তর তন্ত্রে দেবী কালী বা আদ্যাশক্তির ধ্যানটিতে দেখি—

দিগম্বরীং মুক্তকেশীং
চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাং ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তিনি দিগম্বরী, মুক্তকেশী আধাচাঁদের মুকুট তাঁর মাথায়।

মহানির্বাণতন্ত্রেও আদ্যাকালিকার ধ্যানে পাই—

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং।

—তাঁর বর্ণ মেঘের মতো, মাথায় চন্দ্র।

দেবী দুর্গার ধ্যান বিভিন্ন পুরাণেই পাই—তাতেও ঐ চন্দ্রমুকুটের কথা। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে দেখি—

জটাজুটসমাযুক্তাং
অর্ধেন্দুকৃতশেখরাং॥

—যিনি জটাজুটধারিণী ও যাঁর মাথায় অর্ধচন্দ্র।

অন্যান্য দেবীদের ধ্যানেও দেখি—চন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা যা বলেন তাও এইখানে বলে নিই। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে চন্দ্র হচ্ছেন জল বা বৃষ্টির অধিপতি। আমাদের দেশের প্রাচীন সুরীরাও চন্দ্রের এই পরিচয় জানতেন। তাই বেদমন্ত্রে পাই—

সোমং রাজানং বরুণং॥ অর্থাৎ তাঁরা এক নিঃশ্বাসে সোম ও বরুণকে রাজা বলে গণ্য করতেন। সোম তো চন্দ্রের অপর নাম। আবার পুরাণে পাই যে চন্দ্রের উৎপত্তি সমুদ্র থেকে। অন্যদিক থেকে বরুণও রাত্রির দেবতা, চন্দ্রও তাই। আর বরুণকে তো সমুদ্রের অধিপতি বলা হয় পুরাণে। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে চন্দ্রের সঙ্গে বরুণের তথা সমুদ্রের বা জলের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আর সেই জল হচ্ছে কৃষিকর্মের একান্ত সহায়। তাই তো কেবলি মনে হয় যে দেবীমূর্তির কল্পনা করেছেন কৃষিজীবি গ্রীষ্মমণ্ডলের মাতৃগতকুলের মানুষরা।

এখনকার দিনেও তো কৃষিজীবিরা চাঁদের পরিবর্তনাদি দেখে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কি না বেশ বুঝতে পারেন। তাঁরা একটি খনার বচনও প্রায়ই বলেন চন্দ্রের মণ্ডল বা সভা লক্ষ্য করে—

দুর সভা নিকট জল।
মধ্যে তারা রসাতল॥

॥ ব্রহ্মের পিতৃরূপ ॥

এর সঙ্গে একটু উল্লেখ করা যাক ওই শীতমণ্ডলের অধিবাসী পিতৃগতকুলের মানুষদের দেবতাকল্পনার। আমরা জেনেছি তাঁরা ছিলেন শিকারজীবি—সৌর-মাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণনাকারী। তাঁরা যখন দেবতার কল্পনা করতে গেলেন—তাঁরা তাঁকে, পুরুষরূপেই কল্পনা করলেন।

পণ্ডিতজনেরা বলেন বেদের মন্ত্রগুলি প্রধানত রচিত হয় পিতৃগতকুলের মানুষদের দ্বারা। তাই বেদে দেখতে পাই কেবলি অথবা বেশীর ভাগ যত পুরুষদেবতার নাম; যেমন অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সোম, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র, মরুৎ, ত্বষ্টা ইত্যাদি। আর ব্রহ্ম তো আছেনই।

যে কারণে মাতৃগতকুলের দেবতারা নারীরূপে গণ্য, মনে হয় ঠিক সেই কারণেই পিতৃগতকুলের দেবতারা পুরুষরূপে গণ্য। পিতৃগতকুলে পিতাই ছিলেন সর্বময় কর্তা। কাজেই পিতার চেয়ে অধিক শক্তিমান কোন সত্তা যে থাকতে পারে এ ধারণাই ছিল না তাঁদের। পিতা বীরবর্গ বা পুত্রবর্গ বেষ্টিত হয়ে যেতেন শিকারে। সেই শিকার তো তাঁদের উপজীব্য ছিল। অস্ত্রধারী সবল সক্ষম পুরুষদের ওপরেই ছিল সমাজের একান্ত নির্ভর। নারীর স্থান ছিল সেখানে শুধু দুহিতার অর্থাৎ যে গোদোহন করতো আর শমিতার অর্থাৎ যে মৃতপশুর চর্মমোচন করে তার মাংস সংগ্রহ করতো। বাল্মিকীর রামায়ণে পাই—যখন রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞে অশ্ব উৎসর্গ করলেন, তখন রাণী কৌশল্যা তিন রকম অস্ত্র দিয়ে সেই অশ্বের মাংস সংগ্রহ করলেন। আজও তো মাংস সংগ্রহ করতে তিন প্রকারের অস্ত্র প্রয়োজন। একটি ভারি কাটারি, একটি দীর্ঘ ছুরি ও একটি ছোট ছুরি। কিন্তু সে আবার অন্য কথা।

মাতৃগতকুলের দেবীদের ধ্যানে যেমন চন্দ্রের প্রভাব দেখি—পিতৃগতকুলের দেবতাদের ধ্যানে তেমনি পাই সূর্যের প্রভাব। যেমন দেখি গায়ত্রীতে। মন্ত্রের নামটি যদিও গায়ত্রী, যা নাকি স্ত্রীবাচক কিন্তু মন্ত্রটি মূলত হচ্ছে সবিতা বা সূর্য সম্বন্ধে, যেমন—

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি॥

—সেই বরণীয় সবিতার তেজোরাশিকে ধ্যান করি বা ধারণ করি।

আবার নারায়ণের ধ্যানমন্ত্রে দেখি—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তীঃ॥

—সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্তী নারায়ণই সর্বদা ধ্যানের যোগ্য।

অনেকেই কিন্তু মনে করেন যে গায়ত্রী হচ্ছেন আসলে নারীদেবতা। এ ধারণার মূলে এই দেখা যায় যে—গায়ত্রীকে প্রভাতে কুমারীরূপে, মধ্যাহ্নে যুবতীরূপে ও সায়াহ্নে বৃদ্ধারূপে ধ্যান করার বিধি আহ্নিকমন্ত্রেই আছে। তা ছাড়া আবাহন মন্ত্র ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপবিসর্জন মন্ত্রেও তাঁকে নারীরূপে গণ্য করা হয়। শুধু তাই নয় গায়ত্রীজপের আদিতে ও অন্তে যে শাপোদ্ধার ও কবচ মন্ত্র পাঠ করার বিধি আছে—তাতে গায়ত্রীকে নারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেবল ব্রহ্মশাপ-বিমোচন ও বশিষ্ঠশাপবিমোচন মন্ত্রে দেখি অন্যরূপ।

এ বড় বিচিত্র কথা যে, মাতৃগতকুলের বশিষ্ঠ গায়ত্রীকে পুরুষরূপে আর পিতৃগত-কুলের বিশ্বামিত্র গায়ত্রীকে নারীরূপে দেখলেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে তো আগেই আমরা দেখেছি যে–বাহ্যতঃ আমাদের যে প্রকৃতি দেখা দেয়, সাধনবলে সেই প্রকৃতি যায় বিপরীত হয়ে, এ কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখার। এ পরিবর্তন সম্বন্ধে গীতা বলেন—

—যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥

॥ গায়ত্রীর ঋষিভেদ ॥

গায়ত্রী মন্ত্র সম্বন্ধে কিন্তু আরও একটি বিচিত্র তথ্য জানতে পাই ত্রয়ী থেকে। ঋগ্-বেদে দেখতে পাই বিশ্বামিত্র ঐ মন্ত্রের ঋষি। যজুর্বেদে কিন্তু ঐ মন্ত্রের ঋষি নারায়ণ আর সামবেদে ঐ মন্ত্রের ঋষি বৈখানসদের শতজন—তাঁরা সর্বদা একত্র থাকতেন—যেমন বালখিল্ব বা বালখিল্য ঋষিরা থাকতেন একত্রে ষাট হাজার। এমন ঋষিভেদ কেন দেখা যায় তার সম্বন্ধে স্বনামধন্য পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মশাই একটি সুন্দর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন—বেদে যে সব ঋষির নাম পাই—তাঁরা কেউ মন্ত্রের রচয়িতা নন, প্রয়োগকর্তা মাত্র। অর্থাৎ ঋক্ হিসেবে বা আবৃত্তি মন্ত্র হিসেবে বিশ্বামিত্রই প্রথম গায়ত্রী মন্ত্র প্রয়োগ, করেন, যজুর্মন্ত্র বা যজ্ঞের কাজে ঐ মন্ত্র প্রথম ব্যবহার করেন নারায়ণ, আর সামমন্ত্র বা গান হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন বৈখানসরা একশো জন। তিনি বলেন এই সব কারণেই শেষ পর্যন্ত বেদকে অপৌরুষেয় বলে গণ্য করা হয়।

অথর্ববেদে কিন্তু গায়ত্রীর কোনই উল্লেখ নেই। তা হলেও পণ্ডিতজনেরা সবাই বলেন যে—অথর্ববেদই হচ্ছে আয়ুর্বেদের তথা তন্ত্রের মূল। তন্ত্রশাস্ত্র আয়ুর্বেদের সঙ্গে কতখানি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তার কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। সেই অথর্ববেদে পারদর্শী ছিলেন বশিষ্ঠ। এ কথা রামায়ণেও যেমন পাই, তেমনি পাই মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে সেখানে ওই বশিষ্ঠকে 'অথর্বনিধি' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি ওই বশিষ্ঠের সঙ্গে বিষম বিরোধ বাধে বিশ্বামিত্রের। শেষে বশিষ্ঠের আদর্শে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। কে জানে, বশিষ্ঠের অথর্ববিদ্যা লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে বিশ্বামিত্র বংশানুক্রমে উপাসিত পুরুষদেবতাকে নারীরূপে সাধনা করতে শুরু করেন কিনা। তিনিই তো গায়ত্রীর নাম দেন—আদ্যা।

॥ ভারতীয় ধর্মে শিব ও বুদ্ধ ॥

একটি কথা এখানে বলে নিই, আমাদের ভারতীয় ধর্ম নিয়ে যাঁরাই গভীরভাবে আলোচনা করেছেন তাঁরাই দেখতে পেয়েছেন যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের ধর্মে শিব ও বুদ্ধ একাকার হয়ে গিয়েছেন। বিল্ব বা বটবৃক্ষ তলে শিব আর বোধিবৃক্ষ তলে বুদ্ধ যেন অভিন্ন বলেই মনে হয়। কেমন করে এই ব্যাপার ঘটলো—তা আজকের দিনে আর বিশ্লেষণ করার উপায় নেই। কালবশে লোকাচারের বিচারবিবেচনাহীন স্থূলহস্তাবলেপেও এমন ঘটা অসম্ভব নয়, আবার এমনও হতে পারে যে, মূলগত সত্যের অতি স্বাভাবিক পরিণতিরূপেই এমনটি ঘটেছে। তবে শিবও যেমন ভারতীয় জ্ঞান ভাণ্ডারের যাবতীয় শাখার ওপর অধিদেবতারূপে বিরাজ করেছেন, বুদ্ধও তাঁর থেকে কোনো অংশে কম নন। শিব যেমন শক্তিকে বা মহাবিদ্যাকে বুকে ধরে আছেন, বুদ্ধ ধরে আছেন তেম্নি প্রজ্ঞাপারমিতাকে—এ কেবল ভাবের দিক থেকেই সত্য নয়; সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, ভাস্কর্যে এক কথায় ভারতীয় সমস্ত সাধনা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যেও এই সত্য প্রকটিত হয়ে রয়েছে। পুঁথি ও পাথর তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

॥ উভয় কুলের দেবতাকল্পনায় তুলনামূলক তত্ত্ব ॥

পিতৃগতকুলের লোকেরা বাস করতেন কর্কটক্রান্তিরেখার উত্তরে। সেখানে সব ঋতুতেই তুষারপাত হয়, সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন হয়ে যায় তুষারে। যাঁরাই বদরিকাশ্রমের পথে গিয়েছেন তাঁরাই জানেন তুষারাচ্ছন্ন দেশের সূর্যের আলোক কি তীব্র জ্যোতির্ময় —বিশেষ করে জমে ওঠা তুষারে প্রতিফলিত হয়ে সেই আলোক যেন ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয় চোখে। বাধ্য হয়ে তাই সে পথের যাত্রীরা রঙিন কাঁচের চশমা ব্যবহার করেন সূর্যের প্রচণ্ড দীপ্তি থেকে দৃষ্টিশক্তিকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু চশমা তো একালের আবিষ্কার। সেই প্রাচীনকালের মানুষ তো বাধ্য হতেন খালি চোখে ওই সূর্যের আলোকচ্ছটা দর্শন করতে। ফলে সূর্য বা তার আলোককে কেবল বিপুল তেজোরাশি বলেই ধারণা করতেন তাঁরা, যার কোনো বিশেষ রূপ দেবার কথা ভাবতেই পারতেন না। কে জানে, এই কারণেই তাঁরা ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে নিরাকার জ্যোতিস্বরূপ বলে বর্ণনা করে গিয়েছেন কিনা। তাঁরা যে বর্ণ চিনতেন না—অর্থাৎ সূর্যের সাতটি রঙের খবর সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশে পান নি তা স্বভাবতই মনে হয়। বিশেষ করে যখন জানি যে—তাঁরা ভাষাসৃষ্টি করলেও বা উত্তম রচনাশক্তি লাভ করেও, তা সব মুখে মুখেই আবৃত্তি করতেন। বর্ণমালা সৃষ্টি করে তা লিখে রাখতে শেখেন নি।

ভারতবর্ষে বর্ণমালা আবিষ্কার সম্বন্ধে পণ্ডিতরা জানিয়েছেন কেরল অঞ্চলে পনি নামে যে গোষ্ঠী ছিল তারাই প্রথম বর্ণমালা সৃষ্টি করে। এই কেরল দেশ বহু প্রাচীন কালের। বাল্মিকী-রামায়ণে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে যেখানে সুগ্রীব সীতাকে খোঁজবার জন্যে বানরদের বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন দিকে যাবার আদেশ দিচ্ছেন—সেখানে তিনি তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন কোন দিকে তারা কোন দেশ, পর্বত, নদী ইত্যাদি দেখতে পাবে—সেখানে দক্ষিণদিকের বর্ণনার মধ্যে কেরলদেশের নাম আছে। যাই হোক—ঐ পনিরা কত প্রাচীনকালের গোষ্ঠী তার প্রমাণ পাই অথর্ব ও ঋগ্‌বেদে। সেখানে অবশ্য পনিদের বলা হয়েছে দস্যু—ইন্দ্র তাদের দমন করেন। কিন্তু 'বিশ্বকোষ'কার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব জানিয়েছেন যে, সেই পনিরাই প্রথম ফিনিশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন—তখন ঐ দেশের নাম ছিল পনীকীয়। আর তাঁরাই প্রথম খরোষ্ঠীলিপি, যা ডাইনে থেকে বাঁয়ে লিখতে হতো আর ব্রাহ্মীলিপি, যা বাঁয়ে থেকে ডাইনে লিখতে হতো, তা আবিষ্কার করেন। অনেকে মনে করেন খরোষ্ঠীলিপি থেকেই জন্মেছে সেমেটিক বা আরবী, ফারসী প্রভৃতি লেখরীতি; আর ব্রাহ্মী থেকে ইণ্ডোইওরোপীয়ান বা সংস্কৃত প্রভৃতি লেখরীতি।

শোনা যায় ঐ ব্রাহ্মী অক্ষরেই প্রথম বেদ লেখা হয়েছিল—লেখক ছিলেন ঋষভদেব। তার আগে বেদের নাম ছিল শ্রুতি, যা কেবল গুরুর মুখ থেকে শুনে শিখতে হতো আর তার আনুষঙ্গিক যা কিছু আচার অনুষ্ঠান তার নাম ছিল স্মৃতি, যা কেবল মনে রাখার বস্তু ছিল।

॥ ঋষভদেব কি শিব ॥

ঐ ঋষভদেব কে? এ প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতজনেরা অনেক চিন্তা ও আলোচনা করেছেন। প্রাচীনকালের দু'টি ঋষভের কথা জানা যায়। একজন ছিলেন জৈনধর্মের আদি প্রবর্তক তাঁর নাম ঋষভনাথ, অপরজন ঋষভদেব, যাঁর কাহিনী পাই শ্রীমদ্‌-ভাগবত মহাপুরাণে। ঋষভদেব ছিলেন কপিল-প্রবর্তিত মুনিধর্মের কেতুস্বরূপ। যাঁরা বিশেষভাবে সন্ধান করেছেন তাঁরা বলেন—ঐ দুই ঋষভ মূলত একই ব্যক্তি। জৈনধর্ম মুনিধর্মের নামান্তর মাত্র। সব থেকে মজার কথা ঋষভকে বলা হয়—ককুদ্মান্ ঋষভঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ ঋষভ সদাসর্বদা স্কন্ধ এমনি উন্নত করে রাখতেন যে, লোক তাঁর স্কন্ধের তুলনা করতো বৃষের ককুদের সঙ্গে। সাদা কথায় তিনি ছিলেন পরম যোগী—সর্বদাই এমন আসনে বসে থাকতেন যে তাঁর শরীর সর্বদা ঋজুভাবে থাকতো। এ যেন শিবের পদ্মাসনে থাকার ছবিটিই ফুটিয়ে তোলে। আবার জৈনধর্মের সর্বসমেত যে চব্বিশজন তীর্থংকর ছিলেন—তাঁদের সবায়ের নাম শিবের বিভিন্ন নামের সঙ্গে মিলে যায়।

প্রসঙ্গত মনে আসে গণেশের কথা—তিনি বেদব্যাসের মুখ থেকে সমগ্র মহাভারত শুনে শ্রুতিলিখন করেন। গণ+ঈশ=গণেশ, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে গণের অধিপতি। গণ বলতে তো বোঝায় অবৈদিক মানুষদের। তাই তো কেবলি সন্দেহ জাগে যে, লেখার রীতি প্রথম আবিষ্কার করেন ওই গণের মানুষরা বা মুনিরা। এখানে বলে রাখা দরকার যে—শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে যে ধর্মের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ওই মুনিধর্ম বা গণধর্ম তাই দেখি সেখানে দৈত্য বৃত্র, অসুর প্রহ্লাদও ভক্তশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। বাস্তবিক পক্ষে গণকে যিনি প্রভাবিত করতে পারেন তিনিই তো গণ্য, বাকী সবাই তো নগণ্য। অথচ আর্য্যঅভ্যুত্থানের পর সেই সব প্রাগার্য্য যবন, শবর, নিষাদ, কিরাত, পুলিন্দ সবাই, যারা গণবদ্ধ হয়ে বাস করতো, ভারতের সত্যকারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক ছিল, তারা হয়ে উঠলো নেহাৎ অপাংক্তেয়। মনে পড়ে বীরভূম অঞ্চলে মজুরদের 'মুনীষ' বলে ডাকা হয়—কে জানে, মুনি শব্দেরই অপভ্রংশ ওই মুনীষ কিনা।

গণেশের কথা আরও একটু বলি। মুনি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রের' ইংরাজী অনুবাদক শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ব্যক্ত করেছেন যে—দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন গণেশ আর গণেশ হচ্ছে শিবেরই অন্য নাম। যাই হোক, ঐ অবৈদিক জনগণই যে প্রথম বর্ণমালা ও লিপি প্রয়োগের বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন—আর শক্তির বর্ণময় রূপ কল্পনাও যে তাঁরাই করেছিলেন, তা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

॥ ধর্ম প্রভৃতির সংকরত্ব ॥

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আর্য্য, অনার্য্য বা প্রাগার্য্য গোষ্ঠীর এমনই সংমিশ্রণ ঘটে গিয়েছে যে—আজকে ভারতের জাতি, ধর্ম, রাজনীতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি—সবই সংকরত্ব লাভ করেছে। এর মধ্যে কতটুকু আর্য্য আর কতটুকু অনার্য্য বা প্রাগার্য্য প্রভাবাপন্ন—তা নির্ধারণ করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবু পণ্ডিতদের চেষ্টার বিরাম নেই। তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন এই জটিল অবস্থার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে থেকে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করার। তাঁদের সে চেষ্টা যে বৃথা যায় নি—তারও পরিচয় আমরা ক্রমশঃ পাচ্ছি।

এখানে শুধু বলি—তাঁদেরই চেষ্টায় জানা গিয়েছে যে—যদিও দেবীসূক্ত বা রাত্রিসূক্ত ঋগ্‌বেদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়, তবু তা ঐ বেদের ধারানুগ নয়। বরং পুরুষসূক্তের মধ্যেই ঋগ্‌বেদ-সিদ্ধ মূলধারা উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত। পুরুষসূক্তে পাই—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ
সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা
অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

—সেই পুরুষের সহস্র সহস্র মাথা, সহস্র সহস্র হাত ও পা, তিনি এই ভুবনের সমস্তটুকু আবৃত করেও দশাঙ্গুল পরিমাণ অতিরিক্তরূপে অবস্থিত।

এ মন্ত্র পড়তে পড়তে কেবলি মনে জাগে সমষ্টিবাদী দর্শনের কথা। কিন্তু দেবীসূক্ত বা রাত্রিসূক্ত পাঠ করে কেবল ব্যষ্টিবাদের কথাই পাই। সমষ্টিবাদ চায় সবাইকে মিলিয়ে একটি সত্তায় পরিণত করতে আর ব্যষ্টিবাদ চায় এককে অনেকের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে। আপাতদৃষ্টিতে এই দু'টি বাদের মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যবধান আছে মনে হলেও, আসলে এই দু'টি বাদ জেগেছে একই মানুষের মনের দু'টি বৃত্তি থেকে। যার মূলে আছে সেই আপ্তবাক্য—একোঽহং বহু স্যাম॥ অর্থাৎ এক আমি অনেক হবো। প্রত্যেক মানুষ যখন নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ চৈতন্যলাভ করে তখন সে আর একা থাকতে পারে না। তেম্নি পূর্ণপ্রজ্ঞ মানুষরাই তো আর্য্য ও আর্য্যেতর গোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটিয়ে ছিলেন—আবার তাঁদেরি উত্তরসূরীরা স্বপ্ন দেখছেন বিশ্বব্যাপী এক মানবগোষ্ঠী। তন্ত্র ঠিক সেই পথই দেখাতে চেয়েছিলেন।

॥ দেবী ও পৃথিবী ॥

এ আলোচনা শেষ করার আগে আর একটি কথা বলে নিই। শাস্ত্রের মধ্যে বেশ সংকেত পাই যে—এই পৃথিবীকেই মাতৃরূপে বা দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

এর প্রথম প্রমাণ অথর্ববেদের 'ভূমিসূক্ত'। সেখানে ভূমিকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন ঋষি অথর্বা, যাঁর অন্য নাম বশিষ্ঠ। আবার সপ্তশতী চণ্ডীতেও তো দেখি একাদশ অধ্যায়ে দেবতারা চণ্ডীকে স্তব করেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধারভূতা জগতস্তমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ॥

—তুমি একা এই জগতের আধার স্বরূপ। মহী বা পৃথিবীর রূপ ধারণ করে তুমি অবস্থিত।

মা পৃথিবী হয়েছেন বা পৃথিবীই মা হয়েছেন—এ সমস্যার সমাধান হয় মায়ের কালী ও কংকালী নাম ও রূপ থেকে। কালী শব্দের অর্থ যিনি সব কিছু গ্রাস করেন। পৃথিবী সত্যই যা সৃষ্টি করে তা গ্রাস করে—পারে না শুধু অস্থি বা হাড়কে জীর্ণ করতে। তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তুর কংকাল আজও ভূগহ্বর থেকে খুঁড়ে বের করছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। কে জানে, সেই কারণেই দেবীর অপর নাম কংকালী কিনা।

ঠিক এই কথা তো জানতে পাই বৈদিক দেবী অদিতি সম্বন্ধে। পুরাণে অবশ্য অদিতিকে পাই দেবমাতা রূপে—কিন্তু বৈদিক অদিতি হচ্ছেন তিনি, যিনি সব কিছু অদন বা আহার করেন। তিনিই আবার দ্যৌ, তিনিই অন্তরীক্ষ, তিনিই মাতা, তিনিই পিতা, তিনিই পুত্র। বৈদিক মন্ত্রটি এই—

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষম্
অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা
অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥ —ঋ ১।৮৯।১০

সেই অদিতিই সব হয়েছেন—শুধু সেই সবকে গ্রাস করার জন্যে।

সেই অদিতির থেকে আত্মা কথাটি এসেছে কিনা, কে জানে! আর ক্রমে সেই আত্মাই কি মৃত্যুরূপা কালী হয়ে উঠেছেন? মনে পড়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পাই যে, ব্রহ্ম প্রথম নিজের ভোগের জন্য অন্নসৃষ্টি করলেন আত্মশক্তিবলে। আর তা মৃত্যুরূপে গ্রাস করতে লাগলেন। জীবমাত্রেরই তাই সম্বন্ধ খাদ্যখাদকের। ব্রহ্মের পরমরূপ হচ্ছে সেই মৃত্যু। ব্রহ্মস্বরূপিনী কালীও কি তাই মৃত্যুরূপা? আসলে তো ব্রহ্ম আর কালী অভেদ।

কিন্তু সেই অদিতি সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদের চেয়ে ঢের বেশী খবর পাই অথর্ববেদের সপ্তম কাণ্ডের ষষ্ঠ কাণ্ডিকায় 'অদিতিসূক্তে'। সেখানে পূর্বোদ্ধৃত ঋকটি তো আছেই, আরো আছে তিনটি ঋক্ যার থেকে বেশ মনে হয় যে, মহীকে বা পৃথিবীকে সম্মুখে রেখেই তাঁর গুণাদি বিবেচনা করেই অদিতির স্তব করেছেন অথর্বা। ওদিকে আবার বিভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদেও পাই যে এই পৃথিবীই হচ্ছে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। এ কথাটিও মনে রাখার যে এই মাটির শরীর মাটিতেই মিশে যায় অবশেষে।

আবার এক কথা—মেধস্ তো রাজা সুরথকে বিধান দিলেন যে—নদীতীরে মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে দেবীপূজা করতে। কে জানে, সেই দেবী এই পৃথিবীর ভাবমূর্তি বলেই—মৃত্তিকা দিয়েই তাঁর মূর্তি নির্মিত হয় কিনা।

ওই কালী কংকালী নৃত্য করে বেড়ান শিবের বুকে। সে শিব তো ওই অনড়, অচল আকাশ নিরবধিকাল যার মধ্যে পৃথিবী চক্রনৃত্য করে চলেছে। এ বিষয়ে তো বৈদিক মন্ত্রও পাই—

দ্যৌর্ণঃ পিতা পৃথিবী জনিতা ॥

—আকাশ আমাদের বাবা, পৃথিবী আমাদের মা।

শিব ও শক্তিকেও তো আমরা আদি জনক-জননী জ্ঞানেই পূজা করি।

এখানে আবার একবার বলে নিই যে—আদ্যাশক্তি বা আত্মশক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করেছিলেন প্রাগার্য্য সভ্যতার ধারক-বাহকরা, তাঁরাই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার জন্যে। কিন্তু আর একটি কথাও এখানে মনে করিয়ে দেয়া আবশ্যিক যে—যদিও সাকার দেবীমূর্তি সাধকের হিতের জন্যেই কল্পিত, কিন্তু সেই মূর্তির প্রতি মোহ থাকলে পরাসিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে রইল পরের পর্বে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

॥ শক্তিপূজা পদ্ধতি বা প্রাণতত্ত্ব ॥

॥ পূজা কি ॥

এবার ব্যক্ত হবে তন্ত্রের প্রাণতত্ত্ব। সেই প্রাণতত্ত্বকে বুঝতে হলে প্রথম জানা দরকার পূজা কি? আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মশাই পূজা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারি অপূর্ব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন—পূজা শব্দটি তামিল-ভাষা থেকেই সংস্কৃত-ভাষায় এসেছে। তামিল ভাষায় 'পূ' শব্দের অর্থ হচ্ছে পুষ্প আর 'চে' শব্দের অর্থ হচ্ছে চর্চা। এই দু'টি শব্দ একত্র করলে 'পূচে' শব্দ জাগে—যার অর্থ পুষ্পচর্চা। এই 'পূচে' শব্দটিই কালক্রমে রূপান্তর লাভ করে সংস্কৃতে 'পূজা' শব্দটিকে প্রকাশ করেছে। এ সম্পর্কে ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের বহুবিশ্রুত পুস্তক 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব) দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যাই হোক, ঐ তথ্য থেকে জানতে পাই যে, পূজা শব্দটিই পেয়েছি আমরা অবৈদিক জনগণের কাছে থেকে। এইভাবে প্রাগার্য্য ও অনার্য্য জনগণের বহুরীতিই আমরা মানি, যা শেষ পর্যন্ত আর্য্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। স্বর্গত ইতিহাসবিদ্ শ্রীকালিদাস নাগ মশাই তাঁর রচিত 'স্বদেশ ও সভ্যতা' বইখানিতে এ সম্বন্ধে চমৎকার দিশা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—পূজায় যে সব নৈবেদ্যাদি উপচার দেবার রীতি আছে—সেটি প্রাগার্য্য আর হোম ও বলিদান হচ্ছে আর্য্য রীতি। অর্থাৎ আর্য্যরা এদেশে এসে এখানকার বহু আচার-ব্যবহারকে তাঁদের ধর্মের অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় যে—সেই কালে প্রাগার্য্য ও আর্য্যের রীতিমত মিশ্রণের ফলেই ধর্মে ও সমাজে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল।

এখানে স্বভাবতই মনে পড়ে যে, নৈবেদ্যের প্রথম ও প্রধান উপচার হচ্ছে আমান্ন বা কাঁচা চাল। সে উপচার সংগ্রহ করা তো কৃষিজীবির পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু তার থেকে বড় কথা যে—কাঁচা চালই প্রথম নিবেদন করতে হয় দেবদেবীকে। কেন? তখনকার কালে কি সমাজে কাঁচা চাল খাওয়াই রীতি ছিল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা আগেই জেনেছি যে, নিশাচর বা রাক্ষসরা যদিও অগ্নি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না—তবু তাঁরা আম বা কাঁচা খেতেই ভালবাসতেন। শুধু চাল নয়, মাংসও খেতেন তাঁরা কাঁচা। দেবীর পূজায় তো বলির মাংসও কাঁচাই নিবেদন করতে হয়। এমন কেন হতো বা হয়? তার কারণ বোধহয় এই যে, মানুষ যা নিজে ব্যবহার করতো বা করে, তার অভীষ্ট দেবতাকেও তাই দিয়েই আপ্যায়ন করতে চায়। এই পূজার ব্যাপারে সেই সত্যই কি প্রকট হয়ে নেই?

॥ পূজার উপযোগিতা ॥

যাই হোক, পূজা করার মধ্যে কি ও কতখানি উপযোগিতা বা তার ব্যবহারিক মূল্য কতটুকু তারি খোঁজ করা যাক। সেটুকু না বুঝলে, কেনই বা মেনে চলব পূজা পদ্ধতি? আজকের বুদ্ধিবাদী মানুষকে যে কোনো কাজ করতে বললেই তো—তিনি প্রথম জানতে চাইবেন—'কেন ও কাজ করব? কি উপকার হবে করলে?'

শুধু এ কালের বুদ্ধিবাদীরা বা কেন, গ্রাম্য নারীরাও তো কোনো ব্রত করতে বসে ছড়া পাঠ করেন—

এ পূজো করলে কি হয়?
অপুত্রের পুত্র হয়।
নির্ধনের ধন হয় ॥
অন্ধের চক্ষু হয়।
অস্মরণ রাজার স্মরণ হয় ॥ ইত্যাদি।

বাস্তবিক কোনো কর্ম করতে গেলে, তার ফল কি হবে না জেনে কেউই এগোতে চান না। পূজো বা ব্রতের ব্যাপারেও সেই একই কথা।

প্রথম তাই প্রয়োজন পূজার উপযোগিতা কি তাই বিচার করার। এ বিষয়ে একটি সুন্দর শ্লোক পাই মহানির্বাণতন্ত্রে—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো
ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো
বহিঃপূজাঽধমাধমা ॥

—১৪।১২২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ব্রহ্মই সত্য—এই ভাব বা জ্ঞান লাভ করা হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অবস্থা, ধ্যান করার শক্তি লাভ করা হচ্ছে মধ্য অবস্থা, স্তুতি জপ করা হচ্ছে অধম অবস্থা আর বহিঃপূজা বা মূর্তিপূজা হচ্ছে অধমেরও অধম অবস্থা।

এই শ্লোকটিকে যদি আক্ষরিক অর্থ ধরে বিচার করি, তা হলে কিন্তু সমূহ ভুল হবে। এর অর্থ মোটেই নয় যে, মূর্তিপূজা করা অতি খারাপ। আসলে এই শ্লোকে বিভিন্ন অধিকারীর স্তর দেখানো হয়েছে। যিনি মূর্তিপূজা করেন, তিনি হচ্ছেন নিম্নতম স্তরের সাধক। ঠিক যেমন প্রথম যে ছাত্র বর্ণপরিচয় শিখেছে, তাকে যদি এম-এ ক্লাসের ছাত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয় তো বলতেই হয় যে, বর্ণ-পরিচয়ের ছাত্রটি হচ্ছে একেবারেই প্রাথমিক। অথচ সেই বর্ণপরিচয় না হলে কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় উচ্চতর শিক্ষালাভ করা। আজকে যিনি এম-এ পরীক্ষায় পাশ করেছেন, তাঁকেও তো শুরু করতে হয়েছিল ঐ প্রথম ভাগ থেকেই। তারপর ধাপে ধাপে উত্তীর্ণ হয়েই তো তিনি উচ্চতম শিক্ষালাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। বহিঃপূজা বা মূর্তিপূজাও তেমনি প্রথম ধাপ—সেইখান থেকে শুরু করেই উন্নীত হতে হবে উত্তম পদবীতে।

আমরা দেহধারী মানুষ। ঘুমের ঘোরেও স্বপ্ন দেখি আমরা নানা মূর্তির। মূর্তিকে বাদ দিয়ে কোনো সাধনাই তাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মূর্তি ধরে না গেলে এক লম্ফে আমরা কেউই পারি না ভাবলোকে পৌছতে। সেই কথা স্মরণে রেখেই আমাদের পূর্বসূরীরা ঐ ব্যবস্থা করে গিয়েছেন আমাদের হিতের জন্যে। তাই পাই—সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

বাস্তবিক যার রূপ জানি না তার গুণের বিচার কি করে করব? হিন্দীতে একটি প্রবাদ আছে—

পহিলে দর্শন-ধারী।
পিছে গুণবিচারী ॥

সত্যিই রূপ না দেখে কারো গুণের বিচার করা একেবারেই অসম্ভব। আধুনিক কালে যে বৈজ্ঞানিকরা জ্ঞানের সীমা নিত্যই প্রসারিত করে চলেছেন তার মূলেও তো আছে ঐ সত্য। প্রত্যেকটি দৃষ্ট বস্তুর গুণ বিচার করতে করতে তাঁরা পৌঁছেছেন অদৃষ্ট বস্তুর নানা সিদ্ধান্তে। এই পথেই তো তাঁরা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার সাধনা করছেন। সেইভাবে প্রত্যেকটি মানুষকেই তাঁর নিজের মতো করে জীবনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে—এই হচ্ছে তন্ত্রের আদেশ। আমাদের শাস্ত্রে বিজ্ঞানের অর্থই হচ্ছে যা ভাবগ্রাহ্য কিন্তু তার মূল হচ্ছে বস্তু-গ্রাহ্য জ্ঞান। তন্ত্র সেই বিজ্ঞানের পথই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবায়ের সামনে উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। এই চর্চার ফলেই তো জাগবে আত্মজ্ঞান। যার আত্মজ্ঞান জাগে নি, সে তো মানুষ নামের-ই অযোগ্য। মনে পড়ে রামকৃষ্ণদেবের কথা। তিনি বলতেন—যার মানও আছে আর হুঁশও আছে, সেই হচ্ছে মানুষ। মান বলতে বোঝায় মর্যাদা বা সীমা অর্থাৎ যিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেছেন বা নিজেকে চিনেছেন। আর হুঁশ বলতে তো বোঝায় পূর্ণচেতনা অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে চিনেছেন।

সুতরাং মানুষ হতে গেলে দরকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অনুশীলন করা। সাদা কথায় চোখ কান খুলে রাখা। তাইতো দেখি গুরুর প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়—চক্ষুরুন্মীলতং যেন॥ অর্থাৎ যিনি চক্ষু খুলে দেবার ব্যবস্থা করেন। তখনি তো আমরা গুরুর কৃপায় জানতে পাই আমাদের স্বরূপ। জানতে পাই মানুষ হচ্ছে দেবতা ও অসুরের মধ্যস্থিত অবস্থা—যাকে বলা চলে সুবর্ণ-মধ্যম। যে মানুষের মাথা ঠেকে আছে আকাশে আর পা ঠেকে আছে মাটির পৃথিবীতে। এই দুই বিপরীত ধর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ঘটাতে পেরেছে, সেই তো যথার্থ মানুষ। কিন্তু যা বলছিলাম শেষ করি।

মূর্তিপূজার সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের দেশের সাধকজনেরা সবাই একমত। আর এও তো সত্যি যে, আজ পর্যন্ত যাঁরাই সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই ঐ পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু তাঁরা মূর্তিপূজা বাদ দিলেও নামজপ বাদ দিতে পারেন নি। তবে, এ কথা মানতেই হয় যে, তাঁরা সাধারণের থেকে উন্নতস্তরের। আপামর-সাধারণ তাঁদের অনুসরণ করার সামর্থ্য রাখে না। আমাদের এ প্রবন্ধ তো সেই আপামর-সাধারণেরই জন্য। সেই কারণেই তন্ত্রের ঐ শ্লোকটি উদ্ধার করে দিয়েছি, যার থেকে বুঝতে পারি সাধারণের অগ্রগতি কি ভাবে ঘটে। ঐ শ্লোক থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তির উচিত মূর্তিপূজা থেকেই শুরু করা।

॥ বহিঃ পূজার ফল—পূজকের দ্বিজত্ব ॥

এবার মূর্তিপূজার সম্বন্ধে রীতিমত একটু আলোচনা করা যাক। মূর্তিপূজার যেটি প্রথম অঙ্গ সেটি হচ্ছে ধ্যান। এই ধ্যান কিন্তু ঐ শ্লোকের ধ্যানভাব নয়। মূর্তিপূজার ধ্যান হচ্ছে স্থূল ধ্যান। আর ধ্যানভাবটি হচ্ছে সূক্ষ্ম ধ্যান। এই স্থূল ধ্যানের মন্ত্র যে কোনো পূজাপদ্ধতির পুস্তকেই দেখতে পাই। তাতে শুধু দেবতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ ও গুণের একটি সাধারণ বর্ণনা আছে। যেমন ধরা যাক শিবের ধ্যান—সেটি হচ্ছে—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাংগং পরশুমৃগবরাহভীতিহস্তং প্রসন্নম্॥
পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

—নিত্য সেই মহেশের ধ্যান করা কর্তব্য, যাঁর শরীর রজত-গিরির তুল্য, শোভাময় চন্দ্র যাঁর অলংকার, সর্বাঙ্গ যাঁর রত্নভূষণের প্রভায় সমুজ্জ্বল, যাঁর চারটি হাতে পরশু, মৃগ, বর ও অভয় শোভিত, যিনি প্রসন্ন, পদ্মাসনে বসেছেন, চতুর্দিকে অমরগণ স্তুতিগান করছেন, যাঁর বসন বাঘছাল, যিনি বিশ্বের আদি, বিশ্বের বীজ-স্বরূপ, নিখিল জগতের ভয় যিনি হরণ করেন, আর যাঁর পাঁচটি মুখ ও তিনটি চোখ।

পূজা-কালে এই স্থূলধ্যান মন্ত্রগুলিকে দু'বার পাঠ করতে হয়। প্রথমবার মন্ত্রটি পাঠ করে পূজক তাঁর নিজের মাথায় ফুল দেন—যেটি ধ্যান-পাঠের সময় দু'টি হস্ত-সংযোগ করে কূর্মমুদ্রার মধ্যে ধরে রাখতে হয়। আর দ্বিতীয় বার ধ্যানমন্ত্র পাঠ করে হাতের ফুলটি নিবেদন করতে হয় সম্মুখস্থ দেব-প্রতিমার পায়ে। এই অনুষ্ঠানের গূঢ় অর্থ হচ্ছে এই যে, পূজক যে দেবতার পূজায় বসেছেন আসলে তো সেটি তাঁর অভীষ্ট অর্থাৎ তিনি নিজে তাই হতে চান অথবা তিনি পূজো করছেন তাঁর নিজের আত্মাকেই। তাই প্রথমে নিজের মাথায় ফুল দিয়ে নিজেকেই পূজো করতে হয়—যাতে অন্তরস্থিত সেই আত্মা বা ভাব সম্মুখস্থ প্রতিমার মধ্যে আরোপিত হয়।

শাস্ত্রে পাই—দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ॥ অর্থাৎ নিজে দেবতা হয়ে তবে দেবতার পূজা করা যায়। কথাটি কিন্তু বলা হয়েছে ঘুরিয়ে। প্রকৃতপক্ষে আমরা পূজো করি নিজেদের আত্মাকেই। জীবনের প্রতিটি কর্মের মধ্যে তাই দেখি—আমাদের মূল লক্ষ্য আত্মতৃপ্তি বা আত্মসন্তুষ্টি। যে কাজে তার অভাব আছে—সে কাজে আমাদের মন বসে না। আমরা তো চাই নিজেদেরকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত দেখতে। নিজেদেরকে বাইরে দেখার অপর নাম হচ্ছে দ্বিজত্ব। সে কেমন তাই বলি।

॥ দ্বিজত্ব কি ॥

দ্বিজত্ব কাকে বলে? এ সম্বন্ধে তো আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে—বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দেওয়াই হচ্ছে—দ্বিজত্ব। এখানে আমেরিকাবাসী হেনরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিংক সাহেব তাঁর রচিত "দি রিটার্ণ টু রিলিজিয়ান"—গ্রন্থখানিতে যে চমৎকার মনস্তত্ত্ব বিচার করেছেন বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, তা না বলে পারছি না। বাইবেলের গস্‌পেলটি হচ্ছে এই—

"ভেরিলি, ভেরিলি, আই সে আনটু দি একসেপট্ এ ম্যান্ বি বর্ন্ এগেন্, হি ক্যান্ নট সি দি কিংডম্ অব্ গড্।"

—জন—৩।৩ ॥

—সত্য সত্য বলছি তোমায়, কোন মানুষ যদি দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ না করে, সে ঈশ্বরের রাজ্য দেখবার অধিকার পায় না।

খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ খ্রীষ্টমতে ব্যাপটাইজড্ হলেই দ্বিতীয় জন্মলাভ করে। যেমন আমাদের দেশে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে—উপনয়ন সংস্কার হলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এবং তান্ত্রিক দীক্ষা হলে অন্যান্য বর্ণেরও সবাই দ্বিজত্বলাভ করেন।

লিংক সাহেব কিন্তু ঐ গস্‌পেল থেকে একটি চমৎকার দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তিনি বলেছেন—মানুষ মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হয় ইন্ট্রোভার্ট বা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে। সদ্যোজাতদের তাই এই চেষ্টাই থাকে যাতে সবাই তার প্রতি দৃষ্টি দেয়। উত্তর জীবনে সেই জাতক যখন শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করে সবায়ের দিকে দৃষ্টি দিতে শেখে, তখনি সে হয়ে যায় একস্ট্রোভার্ট বা বিশ্বকেন্দ্রিক, লাভ করে দ্বিতীয় জন্ম। ঈশ্বর তো এই বিশ্বময় তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য রচনা করে বসে আছেন—সে সাম্রাজ্য দর্শন করার অধিকার পান ঐ বিশ্বকেন্দ্রিক দ্বিজরাই। ঈশ্বরের রাজ্য দর্শন করতে পেলেই তো সম্ভব হয় ক্রমশঃ তাঁর নিকটস্থ হবার গতিলাভ করা।

॥ ঈশ্বর ও বিশ্ব ॥

ঈশ্বর বলতে যে এই তাবৎ বাহ্যবস্তুর সমগ্র সমাবেশকেই বোঝায় এ কথা জগতের সর্বকালের দার্শনিকরাই স্বীকার করেন। আমাদের দেশে তো উপনিষদের ঋষি বলেছেন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম॥ অর্থাৎ এই যা কিছু এখানে আছে সবই ব্রহ্ম।

আর ব্রহ্মই যে শক্তি বা কালী তাও বার বার স্বীকার করেছেন আমাদের দেশের আচার্য ও সাধকজন। মনে পড়ে সাধক রামপ্রসাদের পদ—

কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম
ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ত তুলসীদাসও রামচরিতমানসে বলেছেন—

জড়চেতন জগজীব যে
সকল রামময় জানি।
বন্দোঁ সবকে পদকমল
সদা জোরি যুগ পানি॥

—জগতের যত জীব জড়, চেতন সকলকেই রামময় মনে করি, তাই সর্বদা দু'হাত জোড় করে তাঁদের সকলের চরণপদ্ম বন্দনা করি।

সন্ত তুলসীদাস তো রামকেই সর্বব্যাপী পরম ঈশ্বর বলে স্বীকার করেন, ঠিক যেমন কবীর দাসও করতেন। চৈতন্যদেবও সবাইকে পরমেশ্বর কৃষ্ণরূপে দেখতেন—তাই আত্মজ্ঞানে প্রেম বিলিয়ে সবাইকে কৃতার্থ করে যান ও নিজে কৃতার্থ হন। ইদানীন্তন কালেও রামকৃষ্ণদেব বলতেন—

"কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।"

বাস্তবিক পক্ষে অগ্নিকে যেমন তার দাহিকাশক্তিটুকু বাদ দিয়ে ভাবতেই পারা যায় না—ব্রহ্মকেও তেমনি কালী বা শক্তিকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না—এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। ঈশ্বর ও বিশ্বও তেমনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। সেই সত্যই প্রকটিত হয়েছে আদ্যাশক্তির রূপকল্পনায়, কিংবা শিবলিঙ্গ কল্পনায়। শিব ও শক্তিকে সদাসংযুক্ত দেখিয়ে।

অধিক কি বলবো? যতো যতো পুরুষ দেবতার পূজা প্রচলিত হয়েছে ভারতে তাঁদের প্রত্যেককেই শক্তিসমন্বিতরূপেই কল্পনা করা হয়েছে। চিরকুমার কার্তিকের ধ্যানেও তো পাই—কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ॥ অর্থাৎ সেই কুমারও তাঁর শক্তিকে হাতে ধরে রেখেছেন।

অনেকে বলেন কার্তিকের এই শক্তি হচ্ছে একটি অস্ত্রের নাম। একটু বিচার করলে তো জানতে পাই যে, শক্তি সত্যিই ব্রহ্মের অস্ত্রস্বরূপ—সেই অস্ত্র বা উপায় বলেই তো তিনি বিশ্বসংসার রচনা করছেন। আর সে অস্ত্র সর্বদাই তিনি ধারণ করে আছেন।

এখানে 'বাসুদেব' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে যা বলা হয়েছে—তার উল্লেখ অবান্তর হবে না। তাতে পাই—

সর্বভূতাধিবাসশ্চ
যদ্‌ভূতেষু বসত্যধি।
সর্বানুগ্রাহকত্বেন
তস্মাদহং বাসুদেবঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আমি সর্বভূতের অন্তরেও যেমন বাস করি, আবার তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবার জন্য তাদের বাইরেও বাস করি—তাই আমার নাম বাসুদেব।

॥ ত্রিনয়নের ব্যাখ্যা ॥

মানুষকে বিশ্ব দেখবার সুযোগ দেয় তিনটি বস্তু, যথা—চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি। এই তিনটি বস্তু থেকে যে আলোক বিচ্ছুরিত হয় তারই সাহায্যে আমরা নিকট ও দূরের যা কিছু দৃশ্য দেখতে পাই। ভারি মজার কথা যে, তন্ত্রের দেবদেবীদের সবাইকে ত্রিনয়ন-ভূষিত বলা হয়—আর সে তিনটি হচ্ছে ঐ চন্দ্র, সূর্য আর অগ্নি। এর মধ্যে প্রথম স্থান হচ্ছে সূর্যের, সূর্যের আলোক তো মেঘ ভেদ করেও প্রকাশ পায়, আবার চন্দ্র ওই সূর্যের আলোকেই উজ্জ্বল। এমন কি অগ্নির মূলেও আছে ওই সূর্যরশ্মির ক্রিয়া। কিন্তু অগ্নি মানুষের অত্যন্ত নিকটস্থ বস্তু। তাকে অনির্বাণভাবে জ্বালিয়ে রাখা যায় বা ইচ্ছামাত্র জ্বালিয়ে নেয়া যায়—সূর্য বা চন্দ্র সে ভাবে মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। আমাদের দেশে দ্বিজত্বের একটি প্রধান ক্রিয়া হচ্ছে ঐ অগ্নিকে চিনে নেয়া—ওই অগ্নিই হচ্ছে তৃতীয় নয়ন—যার সাহায্যে অপারেও পার হওয়া যায়। সেই অগ্নির স্থান কিন্তু এই পৃথিবী। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও অগ্নি জ্বলে না। উপনিষদে পাই যে, ঐ অগ্নিরই সপ্তজিহ্বার বা শিখার প্রথমটির নাম হচ্ছে কালী। এই অগ্নি মানুষের যে কতবড় সহায় তা সন্ধানী মাত্রেই জানেন। মানুষের সভ্যতার মূলে দেখি তিনটি বস্তু আছে। প্রথম ওই অগ্নি, দ্বিতীয় অস্ত্র আর তৃতীয় হচ্ছে চক্র। যদি মানুষ ঐ তিনটি বস্তুর আবিষ্কার করতে না পারতো—তা হলে এতোদিনে তাদের বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো ভূপৃষ্ঠ থেকে। কিন্তু সে আবার অন্য কথা।

॥ উপনয়নের প্রতিজ্ঞা ॥

এখানে উপনয়নের সময় মানবককে যে সব প্রতিজ্ঞা করতে হয়, তার কথাও কিছু বলি। একটি প্রতিজ্ঞা হচ্ছে—

মা দিবা স্বাপ্সি ॥ অর্থাৎ দিনে ঘুমিও না।

এই প্রতিজ্ঞাটির গূঢ় অর্থ হচ্ছে এই যে—দিবা বলতে বোঝায় বিদ্যা-অর্জনের সময়—সেই সময় ছাত্র যদি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—তা হলে আর তার বিদ্যালাভ করার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। আবার দিবা অর্থে জাগবার সময়—তা সে কাজের জন্যেই হোক বা অপর কোনো প্রত্যাশা বা সাধনার জন্যেই হোক। সেই সময়ে যে ঘুমিয়ে পড়ে তার জীবনই বৃথায় নষ্ট হয়। তাই এ প্রতিজ্ঞা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সেই শ্লোকটিও স্মরণে রাখার—যাতে পাই—

যা নিশা সর্বভূতানাং
তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি
সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥—২।৬৯।

—যখন অন্য সবাই ঘুমায় বা রাত্রি উপভোগ করে তখন যিনি সংযমী, তিনি থাকেন জেগে। আর যখন অন্য সবাই জাগে, তখন যাঁরা মুনি তাঁরা দেখেন রাত হয়েছে।

বাস্তবিকপক্ষে যাঁরা সাধক তাঁদের কাছে দিনরাত্রির ভেদ কিছু থাকে না। সারাক্ষণ জেগেই তাঁরা সাধনা করে যান। দিনে যখন সবাই জাগে তখনো কারো প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে মৌনভাবে তাঁরা নিজ নিজ কাজ করেন। তবে না তিনি যথাসময়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন!

এ কথা যে কেবল আমাদের দেশেই প্রচলিত তা নয়। ইওরোপের গুনীজ্ঞানীরাও জানেন এ কথা। তাই ইংরাজীতে একটি কবিতা পাই—

হায়েটস্ অব্ গ্রেট্ মেন্
রীচড্ অ্যাণ্ড কেপ্ট্
ওয়ার নট্ অ্যাটেণ্ড বাই
সাডন্ ফ্লাইট্স্।
ফর্ দে হোয়াইল দেয়ার
কম্পানিয়ন্স্ স্লেপ্ট
ওয়ার টয়েলিং আপওয়ার্ডস্
ইন দ্য নাইট্স্॥

—মহৎ ব্যক্তিরা যে উন্নতি অর্জন ও রক্ষা করেছেন, তা তাঁরা হঠাৎ উড়ে গিয়ে পান নি। পেয়েছেন তার কারণ এই যে, তাঁদের সঙ্গীরা যখন ঘুমুতো, তখন তাঁরা বিপুল পরিশ্রম করতেন।

আবার একটি প্রতিজ্ঞা করতে হয় মানবককে—সমিধমাধেহি॥

অর্থাৎ সমিধ আধান কর বা সংগ্রহ কর।

এর অর্থ মোটেই নয় যে—ছাত্র কেবল কাঠ কুড়িয়ে বেড়াবে গুরুর উনুন ধরাবার জন্যে। আসলে প্রয়োজন হচ্ছে মানবকের অন্তরে যে বৈশ্বানর অগ্নি বিদ্যমান তাকেই যথাযোগ্যভাবে জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, নানা স্থান থেকে সমিধ আহরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। অর্থাৎ আরো সোজা কথায় বলতে হয় যে—ছাত্রের মধ্যে যে প্রতিভা বিদ্যমান তাকে আরো উজ্জ্বল ও অনির্বাণ করে রাখার জন্যে সর্বক্ষেত্র থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ করতে হবে পরম অধ্যবসায় সহকারে। তবেই না জগতের সব কিছুর সার্থকতা সম্বন্ধে সে উদ্বুদ্ধ হবে, যথার্থ দ্বিজত্ব লাভ করে ধন্য হবে!

এর থেকে বেশ বোঝা যায় নাকি যে—আচার্য মানবককে ব্যবহারিক থেকে কোন পথে পরিচালিত করতে চাইছেন? আচার্য এইভাবে তাঁর কাছে উপনীত ছাত্রকে দেহে, প্রাণে ও মনে প্রতিষ্ঠিত হবারই উপদেশ দেন। যার ফলে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠে সে সত্যিকার মানুষ হতে পারে।

॥ তান্ত্রিক দীক্ষা ॥

আবার তান্ত্রিক দীক্ষারও মূলতত্ত্ব ওই একই। গুরু যখন শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে মন্ত্রদান করেন—তখন তিনি তাকে উৎসর্গ করে দেন সেই ইষ্টদেবতার চরণে। সেই ইষ্টদেবতাই তো তিনি, যাঁর অন্য নাম শক্তি, যিনি এই তাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জননী। তারপর শুরু হয় শিষ্যের সাধনা—আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে ঐ জগন্ময়ীর পায়ে দিতে হয় আত্মবলিদান। মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিরাটচ্ছন্দের মহাবাণী—"ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।"

এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে—যিশু হচ্ছেন মেষপালক। তিনি মেষগুলিকে ঠিক পথ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেন। অর্থাৎ তন্ত্রও যেমন বলেন যে, মানুষমাত্রেই দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশু—খ্রীষ্টানধর্মও তাই স্বীকার করেন অন্যভাবে। আবার ইসলাম ধর্মেও আছে কুরবাণী, যার অর্থ আত্মোৎসর্গ। সে আত্মোৎসর্গ কার কাছে? এই বিশ্বরূপ ঈশ্বরেরই কাছে।

॥ খ্রীষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ॥

এখানে একটি কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। খ্রীষ্টধর্মও যে বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত তার একটি প্রমাণ খুঁজে বের করেছেন নিকোলাই নটোভিচ্ তাঁর রচিত "আন্‌নোন্‌ লাইফ অব্ ক্রাইষ্ট" বইখানিতে। সেখানে পাই যে যিশু যে সময় স্বদেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন বেশ কয়েক বছরের জন্যে—তখন তিনি ভারতে এসে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। যাই হোক, ওই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্বের সাদৃশ্য অত্যন্ত লক্ষণীয়। সব থেকে বিস্ময় লাগে যে—বাইবেলের ওলড্ টেষ্টামেণ্টে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে দশটি অনুজ্ঞা আছে 'টেন্ কম্যাণ্ডমেণ্টস্' নামে তার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের 'অষ্টাংগিক মার্গে'-র মিল দেখে। বুদ্ধদেব তো ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নি—তাই বৌদ্ধ-ধর্মের অষ্টাংগিক মার্গ ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব—বাইবেলে কিন্তু দু'টি অনুজ্ঞায় ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। সেই দু'টি বাদ দিলে বাকী আটটি অনুজ্ঞা আশ্চর্যরকম মিলে যায় অষ্টাংগিক মার্গের সঙ্গে। সেই ওলড্ টেষ্টামেণ্ট তো খ্রীষ্টের বহু পূর্বে প্রচারিত হয়েছিল।

আরো একটি কথা—যিশু যদিও ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ 'ওলড টেষ্টামেণ্ট'-কে মেনে নিয়েছিলেন—ইহুদীরা কিন্তু তাঁর কথিত 'নিউ টেষ্টামেণ্ট'-কে গ্রহণ করেন নি। ঠিক সেই ভাবে হজরত মহম্মদ যদিও ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মমতকে আত্মসাৎ করেছিলেন, তবু তাঁর প্রচারিত ধর্মমতকে ইহুদী বা খ্রীষ্টান কেউই স্বীকার করেন না।

এত কথা উত্থাপন করার উদ্দেশ্য শুধু এই যে—তন্ত্র সাধনার সঙ্গে বর্তমান যুগে আচরিত বিভিন্ন ধর্মমতের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ তারি নির্দেশ দেয়া। কিন্তু এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার স্থান এখানে নেই।

॥ দ্বিজত্বের মূলকথা ॥

এতক্ষণে বোধহয় দ্বিজত্ব সম্বন্ধে আমরা বেশ একটি নিশ্চিত ধারণায় পৌঁছেছি। আগে যা আলোচনা করা গেল তার থেকে এই কথাই তো প্রকটিত হলো যে, অন্তরস্থ ভাবকে আরোপ করতে হবে, সম্মুখস্থ যে কোনো একটি বাহ্যবস্তুর ওপরে তা সে কোনো প্রতীক বা প্রতিমাই হোক, বা কোনো প্রিয় বস্তু কি ব্যক্তিই হোক। তারপর সেই প্রতীক, বস্তু কি ব্যক্তির মাধ্যমে শুরু করে ক্রমশঃ প্রাণের ভাবটিকে এই বিশ্বের তাবৎ বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি সার্থকভাবে বিনিয়োগ করতে পারলেই ব্রহ্ম বা শক্তিকে লাভ করা যাবে। সেই ব্রহ্ম বা শক্তিকে যিনি জেনেছেন – তিনিই তো দ্বিজ।

এখানে আর একটি কথাও মনে রাখার। ভাব শব্দটির অন্য অর্থ হচ্ছে ভালবাসা, প্রেম বা চলতি কথায় পীরিত। তাই স্বভাবতই মনে হয়, আমরা যে পরিবেশে জন্ম-গ্রহণ করেছি, সেখানকার ধূলি-তৃণ থেকে শুরু করে সমস্ত জড়জংগমকে যখন ভালবাসতে পারব, তখনি তো হবে আমাদের দ্বিজত্বলাভ, আমাদের সম্যক বিকাশ, সর্বার্থসিদ্ধি। ব্রহ্মসদ্ভাব বলতে কি সেই কথাই বোঝানো হয় নি?

মনে পড়ে গেল সেই মিয়া আবু বিন আদমের কথা। তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিবেশীকে ভালবাসতেন বলেই, দেবদূত তাঁকে দেখিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের ভালবাসার তিনি শ্রেষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকারী। ইংরেজ কবি কোলরিজ সাহেবও তো জানিয়েছেন, তাঁর লেখা "দি রাইম অব্ দ্য অ্যানসিয়েণ্ট মেরিনার" কবিতাটিতে—

হি প্রেয়েথ্ বেষ্ট হু লাভেথ্ বেষ্ট।—যে সবাইকে ভালবাসতে পারে সেই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর ভক্ত।

আমাদের দেশে স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

জগতের সমস্ত ধর্মমতকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ধর্ম মাত্রেরই ওই এক ভিত্তি—হৃদয়বাদ। যে ধর্ম সেই হৃদয়বাদকে উপলব্ধি করার যেমনতর অধিষ্ঠান ও উপকরণ পেয়েছে তারি মতো করে প্রচার করেছে ওই ভাবকে। এই প্রসঙ্গে অতি বিস্তৃত আলোচনাই করেছেন স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য ভ্রাতা স্বর্গত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর লেখা—'ন্যাচারাল রিলিজিয়ন' পুস্তকে।

এইখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না, যুধিষ্ঠির ছদ্মবেশী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে পথ সম্বন্ধে যে সত্য উচ্চারণ করেছিলেন—

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োঃ বিভিন্নাঃ
নাঽসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

এই শ্লোকটি অর্থ করতে গিয়ে বেশ একটু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে এর অর্থ করা হয় যে—প্রত্যেকটি বেদ ভিন্ন কথা বলে, স্মৃতিগুলিও তেমনি, এমন মুনিই নেই যাঁর মত আলাদা নয়। ধর্মের তত্ত্ব গুহার মধ্যে নিহিত অর্থাৎ জানার উপায় নেই, তাই পথ বা ধর্মপালনের উপায় হচ্ছে—যে পথে মহাজনরা গিয়েছেন, সেই পথ ধরে চলা।

কিন্তু মহাজনরাও তো সবাই এক পথে যান নি—সেখানেও তো তাই স্থির নিশ্চয় করে নেয়া যায় না কিছু। তবে পথ কি? যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়ে ব্যাসদেব কি তবে এক হেঁয়ালী শুনিয়ে দিলেন সবাইকে?

না, তা নয়। পথ সত্যিই গুহায় নিহিত। সেই গুহা হচ্ছে হৃদয়েরই একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামান্তর। যাঁরাই বড় হয়েছেন, তাঁরা সেই হৃদয়-নিহিত পথ দিয়ে চলে অথবা নিজেদের মনোগত ভাবের পথে চলেই তা হয়েছেন। এই হচ্ছে ঐ শ্লোকটির বক্তব্য। যিনি হৃদয়বাদী তাঁর কাছেই দেখি, বেদের ভেদ, স্মৃতির ভেদ, মুনিদের মতান্তরের ভেদ ঘুচে যায়। উদার হৃদয়ের মহত্ত্বে তিনিই ঘোষণা করে যান জগতে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা। এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ তো জেগেছিল এই সেদিন আমাদের-ই বাংলাদেশের দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু এ কথা এই পর্যন্তই থাক।

॥ পূজকের দ্বিজত্ব—জপের ফল ॥

পূজা পদ্ধতির দ্বিতীয় অঙ্গ হচ্ছে জপ। আমরা জেনেছি ঐ বহিঃপূজাকে ধরেই অগ্রসর হতে হবে সেই ব্রহ্মসদ্ভাবে। তা কেমন স্তরে স্তরে এগিয়ে যায়, এই জপের সম্বন্ধে আলোচনা করে আমরা তা বুঝতে পারব। জপ বলতে বোঝায়—যাঁর যে দেবতা মনোমত অথবা যাঁর যেটি ইষ্টমন্ত্র, সেই দেবতার নাম বা ইষ্টমন্ত্রটি অবিচ্ছেদে উচ্চারণ করা। জপ আছে তিন প্রকারের যথা—বৈখরী, উপাংশু ও মানস। বৈখরী বলতে বোঝায় রীতিমত উচ্চ বা প্রখর রবে জপ করা, উপাংশু বলতে বোঝায় যে জপের কোনো শব্দ শোনা যায় না বটে, কিন্তু জাপকের ঠোঁট দু'টি নড়তে থাকে, আর মানস হচ্ছে যে জপ চলে মনে মনে, বাইরে থেকে যার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। গুণীজনেরা বলেন যে মানস জপ সর্বোত্তম, উপাংশু মধ্যম ও বৈখরী অধম। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। সে কথা পরেই জানতে পাব।

উপস্থিত জপ করলে কি হয়, তাই জানার চেষ্টা করা যাক। শাস্ত্রে পাই—জপাৎ সিদ্ধি॥ অর্থাৎ জপের বলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। সে কেমন সিদ্ধি? জপই বা করব কি নিয়ে? জপ অবশ্য নামেরই করতে হয়।

॥ নামের মাহাত্ম্য ॥

এখানে নাম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। মনের অভীষ্টটি যেই বাইরে রূপলাভ করলো, অমনি ইচ্ছে হয় একটি বিশেষ নাম দিয়ে সেই রূপটিকে চিহ্নিত করে রাখতে। এই বিশ্বে তো অসংখ্য রূপের সৃষ্টি হচ্ছে—তাদের প্রত্যেকটিকে নাম দিয়ে চিহ্নিত না করলে—কি করে তাদের বিশেষভাবে চিনে নেব? প্রসঙ্গত মনে পড়ে মানবশিশু মাত্রেই তো জগতে আসে নামহীন। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার একটি ডাক নাম দেয়া হয়। ক্রমে সেই নামটিই হয়ে ওঠে তার পরিচয়—বাবা, মা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি সবায়ের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে। তখন বহুজনের মধ্যে থেকেও সেই নাম ধরে ডাকলেই তার সাড়া মেলে। এমন কি ঘুমন্ত থাকলেও সেই নাম ধরে ডাকলে সে জেগে ওঠে। এই যে নামকরণ—এ কিন্তু ঘটে একেবারেই পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভর করে। এ বড় বিচিত্র কথা যে, কারো নাম কেন অন্য কিছু হলো না? চিন্তা করলে এ রহস্য ধরা পড়ে।

আবার শুধু মানুষ কেন? গৃহপালিত পশুরা পর্যন্ত নামের বৈশিষ্ট্য বোঝে। তাদের যা নাম দেয়া হয়েছে—সে নামে ডাকলেই সাড়া দেয়, কাছে আসে। অথচ কে না জানে—পশুদের কারোর কোনো নামই থাকে না বিশেষভাবে।

এর থেকে কি এই কথাই প্রকাশ পাচ্ছে না যে—শিশু এবং পশুও যখন নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়, তখন নামের মহিমা কত অপার! সুতরাং আমাদের শাস্ত্রে যে বহুস্থলেই নামের মহিমা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এ আর বিচিত্র কি? অবোধ অজ্ঞানরাও যে নাম শুনলে স্থির থাকতে পারে না—সেই নামে যখন সাধক ডাকেন তাঁর ইষ্টদেবকে বা তাঁর আত্মাকে, যা ঈশ্বরের অংশ ও ঈশ্বরেরই মতো সর্বচেতনাসম্পন্ন—তখন তিনি যে সাড়া দেবেন এ কি অস্বীকার করা যায়?

নামজপ করার বহু অনুশাসন তাই পাই। প্রপন্ন গীতায় বিদুর বলেছেন—

হরের্নামৈব নামৈব
নামৈব মম জীবনম্॥

আবার সন্ত তুলসীদাসও বলেছেন—

নাম জপু নাম জপু
নাম জপু বাব রে॥

॥ জপের উপযোগিতা ॥

কিন্তু এতো গেল জপ করার তত্ত্বের দিক। জপ করার ব্যবহারিক মূল্য বা উপযোগিতা কিছু আছে কি?

বহু দেহতত্ত্বের গানে দেখি—মনকে ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ মনের স্বভাবই হচ্ছে ভ্রমণ করা। মনসা মথুরাং গচ্ছতি—কথাটা নেহাৎ ভিত্তিহীন নয়। গীতায়ও দেখি—অর্জুন শ্রীভগবানকে বলছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ
প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে
বায়োরিব সুদুস্করম্ ॥—৬।৩৪।

—হে কৃষ্ণ, মন অতি চঞ্চল, সে আপন দুর্জয় বলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিক্ষুব্ধ করে। তাকে দমন করা তো আমি মনে করি বায়ুকে দমন করার মতো সুকঠিন।

সত্যি মন দুর্বার বেগে অবিরত ঘুরে মরছে—নানা চিন্তার মধ্যে জেগে তো বটেই, ঘুমের মধ্যেও তার বিরাম নেই—তাই মানুষ স্বপ্ন দেখে। মনের গতির এই বেগ সম্বন্ধে ইংরাজ কবিও বলেছেন—

হাউ সুইফ্‌ট ইজ্‌ দ্য গ্ল্যানস্ অব্‌ মাইণ্ড,
কমপেয়ারড্‌ উইথ দ্য স্পীড্‌ অব্‌ ইটস্ ফ্লাইট,
দ্য টেম্পেষ্ট ইটসেল্‌ফ্‌ ল্যাগস্ বিহাইণ্ড,
অ্যাণ্ড দ্য সুইফট উইংগড্‌ অ্যারোজ অব্‌ লাইট।

সত্যিই মনের গতির কাছে ঝড় হার মানে, হার মানে আলোর গতি।

বাস্তবিক নিষ্কর্ম অবকাশে মনের মধ্যে পরপর যে সব চিন্তা উদিত হয়, তা যদি কেউ কোনো উপায়ে ঠিক ঠিক লিখে যেতে পারেন, তা হলেই তিনি দেখতে পাবেন মন কি ভাবে অনর্গল অসংলগ্ন প্রলাপ রচনা করে চলেছে। তবে সুস্থ মস্তিষ্ক যাঁদের, তাঁরা মনের সেই অবিরাম উচ্ছৃংখল চিন্তাকে প্রকাশ করেন না বলেই জানা যায় না—তাঁদের মনে কি ঝড় বয়ে চলেছে। কিন্তু যাঁরা উন্মাদ, মন যাঁদের বশে নেই, তাঁরা আর চেপে রাখতে পারেন না মনের সেই সব চিন্তাকে, মুখ দিয়ে তাই তাঁদের বের হয় অবোধ্য নানা প্রলাপবাক্য।

তবে এমনও দেখা যায় যে—যখন কেউ অতি গভীরভাবে কোনো চিন্তা করেন তাঁর অজান্তেই ঠোঁট দু'টি নড়তে থাকে। মনের সেই বিভ্রান্ত অবস্থাকে আয়ত্তে আনা একান্ত আবশ্যক। আর তার একমাত্র উপায় ওই জপ। অভ্যাসযোগে শ্রীভগবান্‌ও অর্জুনকে সেই কথাই বলেছেন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়। তবে সেখানে 'জপ' শব্দটির উল্লেখ নেই। অনেকে তাই ওই অভ্যাসকে ধ্যান বলেই মনে করেন। তিনি শুধু অভ্যাসের দ্বারা অর্থাৎ কোনো একই কর্ম বার বার করে মনকে দমন করতে বলেছেন। সন্ত কবীরদাস সেই চেষ্টাকে একটু অন্যভাবে বলেছেন—

চলো চলো রে ভঁওরা কঁওল পাস ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ভ্রমর হচ্ছে মন—সে তখনই স্থির হয় যখন পদ্মের ওপর বসতে পায়। সেই পদ্ম আর কিছু নয়, ওই জপ—যা কালে পদ্মের মতোই ফুটে ওঠে।

মন যার স্থির হয় নি, যে কেবলি প্রলাপচিন্তায় মেতে আছে, সে তো অন্যমনস্ক—যে কোন কাজেরই অযোগ্য। সেই অন্যমনস্ক মানুষ কেবল নিজের নয়, সমাজেরও সমূহ বিপদ সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে যেখানে যত দুর্ঘটনা ঘটেছে—সমীক্ষা নিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে—ঐ সব দুর্ঘটনার প্রত্যেকটির মূলে আছে একটি অন্যমনস্ক মানুষ। তাই মনের একাগ্রতাকে জাগিয়ে তোলার উপদেশ, সর্বকালে সর্বদেশে ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বহুল প্রচারিত। কিন্তু শুধু কাউকে—মনোযোগ দাও হে! বলে শুষ্ক উপদেশ দিলেই তো সমনস্ক করা যায় না। কি উপায়ে দূর হয় অন্যমনস্কতা—সেই কৌশলটিও যে তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া দরকার। জপই হচ্ছে সেই পরীক্ষিত কৌশল। মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় যখন কোনো কঠিন পাঠ কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারি নি—তখন বাবার কাছে একটি কৌশল শিখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন – "ঐ অংশটি চোদ্দবার জোরে জোরে পড়ে যাও, মুখস্থ হয়ে যাবে।"

বাস্তবিক সেই কৌশলে বহু বহু কঠিন পাঠ্যাংশ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ঐ তো জপ বা আবৃত্তি ; ঐ কৌশলেই তো বহুমুখী মনকে একমুখী করে তোলা যায়। পরবর্তী কালেও তো জেনেছি—

"আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী ॥"

জপের সার্থকতা সম্বন্ধে প্রাজ্ঞজনেরা প্রায়ই এই উপমাটি প্রয়োগ করেন যে—লৌহের মধ্যে যে সমস্ত রাসায়নিক উপাদান-সমন্বিত পরমাণু সমষ্টি আছে, চুম্বকের মধ্যেও ঠিক তাই আছে। তবু লৌহ পারে না অন্য লৌহকে আকর্ষণ করতে, কারণ লৌহের অন্তর্নিহিত পরমাণুগুলি চক্রাকারে ভ্রমণ করছে। চুম্বকের পরমাণুগুলির গতি কিন্তু একমুখী। তাই চুম্বক পারে অন্য লৌহকে আকর্ষণ করতে। চুম্বকের মধ্যে তাই উত্তর ও দক্ষিণ এই দু'টি মেরুর অবস্থানও আছে। মজার কথা এই যে—কোনো চুম্বকখণ্ড দিয়ে যদি কোন লৌহখণ্ডকে ঘর্ষণ করা যায়, তা হলে লৌহের অন্তর্গত পরমাণুগুলি একমুখী গতি লাভ করে চুম্বকশক্তি লাভ করে। ঠিক সেইভাবে জপসিদ্ধ সাধকও পারেন অন্যমনস্ককে সমনস্ক করে দিতে বা সাধারণ সবাইকে আকর্ষণ করতে। প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মধ্যেই কিন্তু সুপ্ত রয়েছে এই একমুখী আকর্ষণ শক্তি—তাকে উন্মেষিত করে নেবার জন্যেই শাস্ত্র জপের উপদেশ দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপের উপযোগিতা সম্বন্ধে তো আমাদের শাস্ত্র শতমুখে প্রশংসা করেন। যোগীনী তন্ত্রে পাই—

সর্বেষাং কর্মণাং শ্রেষ্ঠো
জপযজ্ঞো মহেশ্বরি।
জপযজ্ঞো মহেশানি
মৎস্বরূপো ন সংশয়ঃ॥
জপযজ্ঞে হি তিষ্ঠেদ্ যো
বাহ্যে বা চান্তরেঽপি বা।
সর্বদা পরমেশানি
জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥

—হে মহেশ্বরি, সমস্ত কর্মের মধ্যে জপযজ্ঞ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ম। এ বিষয়ে সংশয়মাত্র নেই যে—যে জন জপ করে সে আমারি (শিবেরি) স্বরূপ। সে জপ বাহ্যভাবে বা গুহ্যভাবে সর্বদা যে করে সে নিঃসংশয়ে জীবন্মুক্ত।

গীতায়ও তো শ্রীভগবান্ বলেছেন—

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি॥ —অর্থাৎ যত রকমের যজ্ঞ আছে তার মধ্যে আমি জপযজ্ঞ। বৌদ্ধ শ্রমণরা বা মুসলমান দরবেশ ফকিররাও জপে বিশ্বাসী।

এতো গেল আমাদের দেশের কথা। ইওরোপেও কি জপের সম্বন্ধে এমন কোনো কথা শোনা যায়? হ্যাঁ, সেখানেও জপ করার জন্যে বহু খ্রীষ্টান মালা ধারণ করে থাকেন। তার চেয়েও বিচিত্র খবর হচ্ছে এই যে, বর্তমানে ইওরোপ ও আমেরিকার বহু মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসক মনঃসমীক্ষণ করে বহু রোগীকে এই জপের দ্বারা নিরাময় করে তুলছেন। এ ধরনের চিকিৎসা আমাদের দেশেও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু ওই পাশ্চাত্য দেশের ব্যাপারই বলি।

একদিন কোনো এক মনোবিজ্ঞানীর কাছে একটি রোগী এলেন—তিনি জানালেন যে—"আমার রোগ হচ্ছে এই যে, যখন রাগ হয় তখন কোনো একটা বাসন না ভাঙা পর্যন্ত সে রাগ দূর হয় না। বাসন ভাঙার ঝনঝন শব্দটি কানে এলেই যেন সম্বিৎ ফিরে পাই। কিন্তু এর ফলে হচ্ছে এই যে, প্রতি মাসে বাসন কেনার খাতে বহু টাকা ব্যয় হচ্ছে। যদি আপনি পারেন এমন কোনো ব্যবস্থা দিতে যাতে আমার রাগটা কমে, তা হলে বড় উপকৃত হই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোবিজ্ঞানী বললেন—"এক কাজ করবেন—যখনি রাগের উদয় হবে মনে, তখনি চেষ্টা করবেন এক থেকে একশো পর্যন্ত নির্ভুলভাবে গণনা করার। প্রথম চেষ্টাতেই তা পারবেন না। তবে কয়েকবার চেষ্টা করলেই ঠিক পারবেন এবং ততক্ষণে দেখবেন আপনার রাগ পড়ে গিয়েছে।"

রোগী তো প্রথমে মানতেই চাইলেন না মনোবিজ্ঞানীর কথা—উল্‌টে বলতে লাগলেন যে—"এই ভাবে লোক ঠকিয়ে আপনারা বেশ করে খাচ্ছেন।"

মনোবিজ্ঞানী বললেন—"তাই যদি মনে করেন তো আপনি আমাকে যে দক্ষিণা দিয়েছেন ফিরিয়ে নিয়ে যান। তবে দেখবেন একবার রাগের সময় ঐ চেষ্টা করে। তা হলেই বুঝতে পারবেন যে আমরা লোক ঠকাই না।"

দক্ষিণার টাকা ফিরিয়ে দিতে যাওয়ায় রোগীর বিশ্বাস হলো মনোবিজ্ঞানীর কথায়। শেষ পর্যন্ত তাঁর কথা মতো কাজ করে সত্যিই তাঁর রাগের উপশম হলো।

এই তথ্যটি থেকে বেশ বোঝা যায় জপের ফল কি? বাস্তবিক, একই দিকে মনকে টেনে রাখার চেষ্টা করাই হচ্ছে জপের মূল উদ্দেশ্য—তা সংখ্যা গণনা করেই হোক আর ইষ্টমন্ত্র পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করেই হোক। প্রসঙ্গত মনে পড়ে—আমাদের দেশেও জপের সংখ্যা নির্দেশ করা হয় হাজার আট বা একশো আট বার কি অন্ততঃ পক্ষে দশবার। আমাদের দেশের ঐ জপসংখ্যার নির্দেশ সম্বন্ধে একটি গূঢ় রহস্য আছে। সে হচ্ছে এই যে, আমাদের প্রত্যেকের মেরুদণ্ড ও মাথার খুলিতে মোট ছত্রিশখানি হাড় আছে। ওই ছত্রিশকে আটাশ দিয়ে গুণ করে পাই হাজার আট সংখ্যা আর তিন দিয়ে গুণ করে পাই একশো আট সংখ্যা। জপের সময় এই চিন্তাই করা দরকার যে—এই জপের ফলে যে স্পন্দন জাগছে দেহযন্ত্রে, তার অনুরণন ঐ মেরুদণ্ড ও মাথার খুলির প্রতিটি হাড়ে অতোবার করে জাগুক। সেই স্পন্দনের সাহায্যেই ঘটে বিশ্বসৃষ্টি—সেই স্পন্দনের দ্বারাই লাভ করি আমরা নব সঞ্জীবনী। আর ঐ যে দশবার জপের নির্দেশ আছে, তারও অর্থ হচ্ছে দশটি ইন্দ্রিয়কে একমুখী করা। যাই হোক, ঐ স্পন্দনলাভ করাই যে আমাদের ধর্মের লক্ষ্য তার পরিচয় আছে পূজাপদ্ধতির অঙ্গন্যাস ও করন্যাসের মধ্যে।

আমরা সবাই জানি—কাম, ক্রোধ আর লোভ এই তিনটি প্রবৃত্তিই আমাদের প্রত্যেককে সব থেকে বেশী চঞ্চল করে। মনকে যেন অতলে তলিয়ে দিতে চায় সেই দুর্বার চাঞ্চল্য। একমাত্র জপের প্রভাবেই ওই তিনটি বেগের চাঞ্চল্যকে দমন করা যায়। কি ব্যক্তিগত জীবনে, আর কি সমাজজীবনে ঐ তিনটি বেগকে দমন করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না পারলে কি সর্বনাশ যে ঘটে, তা বোধ হয় বলে বোঝাতে হয়না। তবে সংখ্যা গণনায় চেয়ে ইষ্টদেবদেবীর নাম জপ করাই যে শ্রেয়—এ কথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়। কারণ ইষ্টদেবদেবী তো আমাদেরই অন্তরের সৃষ্টি, আমরা যা হবার জন্যে সর্বদা সাধনা করি, তারি প্রিয় নাম তো ঐ ইষ্টমন্ত্র। সুতরাং সে নাম জপ করলে যে অধিকতর ফল লাভ হবে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

আবার ইওরোপের ও আমেরিকার কিছু কথা তোলা যাক। হিপ্‌নোটিজম্ ও মিস্‌মেরিজম্ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা অত্যন্ত কৌতূহলী। এ বিষয়ে বহু পুস্তকও ও দেশে প্রণীত হয়েছে। অন্য নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে যেটিকে তাঁরা সবথেকে কার্যকরী বলে মনে করেন সম্মোহনশক্তি বা উইলফোর্স লাভ করার জন্যে—সেটি কিন্তু আসলে জপ। যিনি ঐ সম্মোহনশক্তি লাভ করতে ইচ্ছুক—তাঁকে সর্বদাই এই কথা মনে মনে আবৃত্তি করতে হয়—"আই অ্যাম দ্য মোষ্ট্ পাওয়ারফুল্ ম্যান্ ইন দ্য ওয়রলড্। নো বডি ক্যান্ রেসিস্ট মি।" অর্থাৎ আমি হচ্ছি জগতের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিমান। কেউ পারে না আমাকে প্রতিরোধ করতে।

এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, জপের উপকারিতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের মানুষরাও রীতিমত অভিজ্ঞ।

ঐ জপ যখন নিত্য অভ্যাসের ফলে অজপা হয়ে ওঠে, অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় মনের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে—তখন মনের অবস্থা কতখানি সাম্যলাভ করে তার সত্যিই পরিমাণ করা যায় না।

বৈষ্ণবজনেরা এই জপকে বলেন—চেতোঃ দর্পণমার্জনম্॥ অর্থাৎ চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী। চিত্ত তো দর্পণেরই মতো, সর্বদা তাতে নানা ছায়া পড়ছে আর তার ফলে মালিন্যও তাতে জমছে প্রচুর। সেই অস্বচ্ছ চিত্ত কিছুতেই পারে না কোনো কিছুকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে—দেখা দেয় বিষম চিত্তচাঞ্চল্য। জপই পারে চিত্তকে স্থির করে দিতে, তার চাঞ্চল্য ও মালিন্যকে দূর করে। তখন মন শোকশূন্য হয়ে যায়—সাধক লাভ করেন চিন্তামণি। চিন্তামণি শব্দের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের একটি নাম। কিন্তু শব্দটির যদি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করি, তা হলে তো পাই চিন্তার মধ্যে যা মণিস্বরূপ বা শ্রেষ্ঠ—তাই হচ্ছে চিন্তামণি। সেই সচ্চিন্তা বা চিন্তামণির আলোকে দূর হয়ে যায় মনের অন্ধকার—তারি সাহায্যে সম্ভব হয় আত্মদর্শন—অর্থাৎ চিত্তের প্রকৃতিটি ঠিক কি প্রকারের তা নিশ্চয় করে জানা। তাইতো কালীবিলাস তন্ত্রে দেখি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপাৎ সিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা

পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ অর্থাৎ জপেরি বলে সাধক সিদ্ধিলাভ করে পরম ব্রহ্মের অভিমুখে গমন করেন।

এখানে একটি কথা বলতেই হয় যে—এই জপই হচ্ছে প্রাণময় কোষের ক্রিয়া—ঠিক যেমন বহিঃপূজা হচ্ছে অন্নময় কোষের ক্রিয়া।

॥ পূজকের দ্বিজত্ব—স্তুতির ফল ॥

এবার পূজাপদ্ধতির তৃতীয় অঙ্গ স্তুতির কথা বলি। ইষ্ট বা অভীষ্টদেবতার মূর্তি যখন বাহ্যরূপে প্রকটিত হলো এবং তাঁর নামও যখন অজপা হয়ে উঠলো—তখন স্বভাবতই ইচ্ছা জাগে মূর্তিমন্ত দেবতার সম্মুখে নানা স্তবস্তুতি পাঠ করতে। জপ তখন আর মানস থাকে না, হয়ে ওঠে বৈখরী। উচ্চস্বরে ইষ্টদেবতার নামকীর্তন করার অদম্য আবেগ দেখা দেয়। তাই বারাহী তন্ত্রে পাই—ন মানসং পঠেৎ স্তোত্রং বাচিকং তু প্রকাশয়েৎ ॥ অর্থাৎ স্তোত্র মনে মনে পাঠ করতে নেই, সরবে প্রকাশ করতে হয়।

মনে পড়ে আমাদের বাংলা দেশে চৈতন্যদেবকে সংকীর্তনের জন্মদাতা বলে স্বীকার করা হয়। তিনি বুঝেছিলেন বাহিক বা বৈখরী জপের প্রকৃত রহস্য। আন্তরিক ভাব যাঁর মনে জেগেছে, তিনি কি পারেন তা মনে মনে আঁকড়ে রাখতে? তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তো প্রকাশ পেল বেদমন্ত্র, প্রকাশ পেল পুরাণাদি গ্রন্থ, মহাকাব্য দু'টিও। অতো কি আর উল্লেখ করবো? অদ্বৈতবাদী আচার্য শংকরও তো পারেন নি, সমস্ত দেবদেবীর স্তবরচনা না করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যেখানে যতো ভাবুক জন্মেছেন সবাই প্রাণের প্রেরণায় স্তোত্র, দোহা, গান ইত্যাদি রচনা করে গিয়েছেন।

সেই স্তুতি হচ্ছে ঐ জপেরই ক্রমবিকাশ। তখন আর মন চায় না কেবল একটি নাম জপ করে যেতে—যা কিছু ভাব জেগেছে মনে সবই উজাড় করে দিতে ইচ্ছে জাগে। তাই তখন বারবার হরগৌরী নাম না করে, সাধক গেয়ে ওঠেন—

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ

বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।

জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে

নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিংবা কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ না করে গাইতে সাধ যায়—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

ক্রমে সাধকের মুখ থেকে প্রকাশ পায় শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি। তখন আর একা আনন্দ পেয়ে তৃপ্তি হয় না, সবায়ের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করেন সাধক সেই আত্মপ্রসাদ। এই ভাবেই সাধক শুরু করেন জগৎসেবার কাজ। তাই স্তোত্রপাঠ অত্যন্ত বরণীয়। সেই তো যোগের পথ।

সংসারী মানুষ সর্বদাই ভোগ করেন অশান্তি, তখন যদি সৌভাগ্যবশত কোনো সাধকের মুখ থেকে স্তোত্রকীর্তনাদি শুনতে পান, অন্তত সেই সময়টুকুর জন্যেও মনের দারুন অশান্তি থেকে নিষ্কৃতিলাভ করেন। ঠিক এই কারণেই দেখা যায় সঙ্গীত-সম্মিলনের আসরে অগণ্য শ্রোতার ভিড়। সন্ধানীরা জানেন, ঐ গান প্রথম জগতে জেগেছিল মানুষের আনন্দ থেকেই অন্য মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত সাধকজনেরা গানের অপূর্ব শক্তির কথা স্মরণে রেখেই গানকে দিলেন সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান। জেগে উঠলো তাই সেই আপ্তবাক্য—

জপকোটিগুণং ধ্যানং
ধ্যানকোটিগুণং লয়ং।
লয়কোটিগুণং গানং
গানাৎ পরতরং ন হি ॥

এই স্তোত্রাদি তো মনোময় কোষের ক্রিয়া।

যা বলছিলাম, ঐ সংসারী মানুষের কথা। অশান্তির উপদ্রবে সংসারী পারেন না তাঁর কর্তব্যগুলি সুশৃংখলে সুসম্পন্ন করতে। অথচ এ জগৎ তো কুরুক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্র। কর্ম না করলে কোনো মানুষের পক্ষে শরীর ধারণ করাও সম্ভব নয়। সেই কথাই তো শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলেছিলেন—

শরীরযাত্রাপি চ তে
ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥

আবার ইংরেজ কবিও বলে গিয়েছেন—

অ্যাক্ট্ অ্যাক্ট্ ইন দ্য লিভিং প্রেজেণ্ট
হার্ট উইদিন অ্যাণ্ড্ গড্ ওভার হেড্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এই যে জীবন্ত বর্তমান কাল পেয়েছ, এ সময়ে সর্বদা কাজ কর, ভিতরে থাক হৃদয়ের শক্তি আর মাথার ওপরে ঈশ্বর।

কিন্তু সেই কর্ম তো অশান্ত বা অন্যমনস্ক মানুষ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। কর্ম করতে হলে তো দরকার মনোযোগ ও স্থিরবুদ্ধি। অবশ্য এ কথাও মানতে হয় যে, —এমন অমিতশক্তিধর মানুষ জগতে নেই—যাঁর কোন কর্মেই ত্রুটি ঘটে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এ যুক্তিও অগ্রাহ্য করা যায় না যে—অশান্ত ও অন্যমনস্ক মন নিয়ে কাজ করলে, ত্রুটি ঘটবে আরও অধিক। তাইতো কাজ করতে গেলে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন মনকে যথাসম্ভব সাম্য অবস্থায় আনা। সেই সমত্বই তো যোগ—এ কথা পাই ওই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়। আরও পাই তাতে যে—যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ অর্থাৎ যে কোন কাজ ঠিকভাবে নিষ্পন্ন করার কৌশলই হচ্ছে যোগ।

এই যোগের পথেই তো প্রত্যেককে পরিচালিত করার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন তন্ত্র। পূজাপদ্ধতির প্রত্যেকটি অঙ্গ থেকেই সেই সত্য প্রকটিত। এই স্তুতি কিন্তু আসলে হচ্ছে মনোময় কোষের ক্রিয়া—এতোক্ষণে বোধহয় সে কথা আমরা বুঝতে পেরেছি।

॥ পূজকের দ্বিজত্ব - ধ্যানের ফল ॥

পূজা-পদ্ধতির চতুর্থ অঙ্গ হচ্ছে ধ্যান। এ ধ্যান কিন্তু বহিঃপূজার অঙ্গীভূত ধ্যান নয়। ধ্যানের প্রকারভেদ সম্বন্ধে কুলার্ণব তন্ত্রে প্রকাশ—

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং
স্থূল-সূক্ষ্ম-বিভেদতঃ।
সাকারং স্থূলমিত্যুক্তং
নিরাকারন্তু সূক্ষ্মকম্॥

—ধ্যানের দু'টি প্রকার আছে বলা হয়—একটি স্থূল আর একটি সূক্ষ্ম। সাকার ধ্যানকেই বলা হয় স্থূল আর নিরাকার ধ্যানকে বলা হয় সূক্ষ্ম।

বহিঃপূজায় যে ধ্যানের কথা পেয়েছি—সে তো সাকার ইষ্টদেবতার রূপগুণাদি বর্ণনার একটি স্থূল ব্যাপার। সেইটুকুর মধ্যেই কি ধরা যায় মনের বিরাট ভাবটিকে—সত্যি যে তা নিরাকার—অর্থাৎ এতো প্রকাণ্ড যে তার আকার কল্পনা করার কোনো উপায় নেই। তখনি তো সাধক ভাবতে ভাবতে পৌঁছে যান সেই ধ্যান-অবস্থায়। যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা দীপো নিবাতস্থো
নেংগতে সোপমা স্মৃতা ॥

—বায়ুশূন্য স্থানে দীপের শিখা যেমন দোলে না—সূক্ষ্ম ধ্যানের উপমা হচ্ছে তাই। যোগীই শুধু তেমন মনের অবস্থা লাভ করেন, বহিঃপূজা, জপ ও স্তুতির শেষে।

সেই যোগীর স্থান কত উচ্চে তার কথা তো শ্রীভগবানই বলেছেন—

তপস্বীভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মীভ্যোশ্চাধিকো যোগী
তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥

—হে অর্জ্জুন, যোগী যে সেই শ্রেষ্ঠ তপস্বী, সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সেই শ্রেষ্ঠ কর্মী সুতরাং তুমিও যোগী হয়ে ওঠো।

বাস্তবিকপক্ষে যোগী যে দিকে যেতে চান অবাধে যেতে পারেন—তাই প্রত্যেকেরই উচিত যোগী হওয়া।

॥ যোগ কাকে বলে ॥

এখানে যোগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যোগাভ্যাসের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে মহামুনি পতঞ্জলি যোগসিদ্ধির শেষ উপায় বলেছেন—

ঈশ্বরো প্রণিধানাদ্ বা॥ অর্থাৎ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেও যোগসিদ্ধি হয়—আর সেইটিই শেষ উপায় ও যোগের সর্বার্থসিদ্ধি।

সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার শক্তি কার আছে? যিনি আত্মোপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনিই পারেন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে। এই আত্মা তো ঈশ্বরের অংশ। অংশের স্বরূপ জানতে পেলে পূর্ণকে জানা আর দূরের পথ নয়। সেই ঈশ্বর তো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জড়জঙ্গম মাত্রেরই মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলছেন—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব॥

এই বস্তুসত্তাকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে অনুভব করা যায় না। সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টাকে জানা আদৌ সম্ভব নয়—যেমন সম্ভব নয় কবির রচিত কাব্যকে বাদ দিয়ে সেই কবিকে পরিপূর্ণভাবে জানা। আবার ঐ কবি শব্দের অন্য অর্থই তো ঈশ্বর। কিন্তু যোগের কথা যা বলছিলাম, তাই বলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ বলতে কি বোঝায় তা নানা ভাবেই এই প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখ করেছি। এখন আর এক দিক থেকে বলার চেষ্টা করি। যোগ শব্দের অতি সাধারণ যে অর্থটি আছে—সেইটুকু মনে রাখলেই যোগ আর জটিল থাকে না। যোগ বলতে আমরা বুঝি একের সঙ্গে অন্যের সন্ধি বা মিলন। সত্যিই যদি পারি আমরা এই বিশ্বচরাচরের সব কিছুর সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করে নিতে—সেই হবে শ্রেষ্ঠ যোগসিদ্ধি। ঈশ্বর এই জগৎ প্রপঞ্চের মূলীভূত কারণ, এ সত্য যাঁর মনে উদ্ভাসিত হয়েছে—তিনি যে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সবাইকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারেন—সেই তো পরম যোগসংসিদ্ধি। মূলকে চিনতে পারলে আর তো ভুল থাকে না—আর সেই মূলকে চিনে নেবার একমাত্র উপায় এই সূক্ষ্মধ্যান। সেই ধ্যান যাঁর পুষ্ট হয়েছে. তিনি তো কবীর দাসের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠবেন—

কস্তুরী কুণ্ডলী বসেঁ
মৃগ্ ঢুঁঢ়ে বন্‌মাহী।
আয়সী রাম ঘটি ঘটি হ্যায়
দুনিয়া দেখে নাহী॥

—মৃগের নাভিতেই রয়েছে কস্তুরী, সে তবু তার গন্ধে বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তেমনি রাম বা ঈশ্বর রয়েছেন ঘটে ঘটে কিন্তু দুনিয়ার লোক তাঁকে দেখছে না।

আমরা জানি সন্ত কবীর দাসের রাম শুধু দশরথাত্মজ অযোধ্যাপতি নন, তিনিই হরি, কৃষ্ণ, কেশব, বিষ্ণু, গোবিন্দ, চিন্তামণি, বিশ্বম্ভর, শিব, শক্তি, দুর্গা, রহিম, আল্লা, খুদা, বিসমিল্লা, সাহিব, হক, নূর, সাঁই, অলখ, নিরঞ্জন—এক কথায় তিনি সব। এ রামের অর্থ করতে হলে বলতে হয়—রময়তে ইতি রামঃ॥ অর্থাৎ যিনি আপনার আনন্দে স্থাবর জঙ্গম সব কিছুর মধ্যে খেলা করছেন। সেই রাম বা ব্রহ্ম বা শক্তিকে যিনি প্রণিধান করেছেন—তিনিই তো যোগসংসিদ্ধি লাভ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—আমাদের শাস্ত্রে যত স্তবস্তুতির উল্লেখ আছে—তার প্রত্যেকটিতে একটি বিচিত্রতা দেখা যায়। যদিও প্রত্যেক দেবদেবীর স্থূল ধ্যানগুলিতে তাঁদের বিশেষ রূপগুণের বর্ণনা পাই, কিন্তু স্তবগুলির মধ্যে তাঁরা সবাই হয়ে আছেন নির্বিশেষ। যেমন দেখি—শিবের স্তব করতে গিয়ে তাঁকেই ব্রহ্মা, তাঁকেই বিষ্ণু বলা হয়েছে, আবার বিষ্ণুর স্তবেও ঠিক তেমনি ব্যাপার। এমন কি দেবীদের স্তবের মধ্যেও ঐ সত্য প্রকটিত। এমন কেন হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে এই কথাই মনে হয় যে—সিদ্ধ-পুরুষ যখন ঈশ্বরের উপলব্ধি লাভ করেন, তখন বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে যে পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাত্মতা ও অভিন্নতা আছে তাই দর্শন করে সবাইকে সমান আসনে বসিয়ে দেন। এই একাত্মতা-বোধ লাভ হয় ওই সূক্ষ্ম ধ্যানের বলেই। নির্বাণতন্ত্র সেই ধ্যানকে বলেছেন—

ধ্যানেন লভতে সর্বং
ধ্যানেন বিষ্ণুরূপকঃ।
ধ্যানেন সিদ্ধিমাপ্নোতি
বিনা ধ্যানং ন সিদ্ধতি ॥

—সর্ব সম্বন্ধে বোধ লাভ হয়ে যায় ধ্যানে। সেই ধ্যানের দ্বারা সাধক হয়ে যান বিষ্ণুর তুল্য। সিদ্ধিও আসে সেই ধ্যান ধরে। ধ্যান ছাড়া সিদ্ধি সম্ভব নয়।

ধ্যানের দ্বারা যখন সাধক সবাইকে আত্মতুল্য দর্শন করেন, তখন সবাইকে পালন করার ইচ্ছা জাগে তাঁর। সেই পালন শক্তির প্রতীক হচ্ছেন বিষ্ণু। উপরের শ্লোকটিতে সেই কথাই নিহিত রয়েছে।

এবার ঐ সূক্ষ্ম ধ্যানের ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। বাস্তব জীবনে এই ধ্যান আমাদের কোনো উপকারে আসে কি—এইটুকুই তো জানবার।

এ প্রশ্নের বিচার করতে গিয়ে এই রূঢ় সত্য বারবার মনে জাগে যে—আমাদের কার মধ্যে যে কি শক্তি নিহিত আছে—তা আমাদের অজ্ঞাত, তাই আমরা সবাই নানা পথে নানা ভাবে ঘুরে মরি— আমরা ঠিক কি চাই বুঝে নেবার জন্যে—আর সেই কারণে বিরোধও করে বেড়াই পরস্পরের সঙ্গে। কেবলি ভাবি আমার যা প্রাপ্য, তা সবই বুঝি আমার প্রতিবেশীর পাতেই পড়ে গেল—আমি হলাম বঞ্চিত। কিন্তু হায়! ওই ভাবে পরের সঙ্গে তুলনা করে নিজের অবস্থাকে হীন ভেবে বাইরে বাইরে খুঁজে বেড়ালে আমরা তো আরো পতিত হবো, সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন উপনিষৎ—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ॥

—উঠতে হবে মাথা তুলে, জাগতে হবে, আমার যা প্রাপ্য বরণীয় বস্তু, তা নিশ্চয় করে বুঝে নিতে হবে।

সে বস্তু বুঝে নেব কি করে? বাইরে যা কিছু দেখি সবি তো লাভের যোগ্য কিন্তু আমাদের নেবার শক্তি কতখানি—তাতো জানতে হবে আমার অন্তরের পানে চোখ মেলে। সেই অভীষ্ট বা কাম্য রয়েছে আমাদের অন্তর্লোকে—তাকে নিশ্চিতভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতক্ষণ ধারণা করে নিতে না পারি, ততক্ষণ তো কোন প্রাপ্যই লাভ করতে পারব না। নেবার শক্তি যে আমাদের সীমাবদ্ধ আর নেবার সময়ও যে স্বল্পায়ত। তাইত প্রয়োজন ধ্যান বলে আমাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে জাগিয়ে দৃঢ়ভাবে জেনে নেয়া আমাদের অভীষ্টকে, না হলে তো আমাদের অবস্থা হবে, সেই প্রবাদে যেমন বলে—'বাঁশ বনে ডোম কানা'র মতোই। সারাজীবন কেবল বৃথা ছুটে বেড়াতে হবে- পরের অনুকরণ আর অনুসরণ করে। সেই বিষম অতৃপ্তির অবস্থা থেকে আমরা উদ্ধার পাই ঐ ধ্যানবলে আত্মদর্শনের ফলে। ধ্যানবলেই আমরা জানতে পারি আমাদের প্রকৃতি বা স্বভাবকে, জানতে পারি আমাদের ধারণা করার শক্তিকে, আর জানতে পারি এই বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের সম্বন্ধকে। বুঝতে পারি কি আমরা দিতে এসেছি আর কিই বা নিতে এসেছি, এই বোধ জাগলে আর কি সিদ্ধি দূরে থাকে ?

এ জগতে সত্যিই যে যা চায়, সে তা পায়। এ কথা শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥

—যে আমাকে যে ভাবে চায়, আমি তাকে ঠিক তাই ভাগ করে দিই।

কিন্তু যে জানে না সে কি চায়, সে কি করে কিছু পেতে পারে এ জগতে ? মানুষ যদিও জন্তুজগতের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে, তবু কি দুর্ভাগ্য—সে দেখে ভুল, শোনে ভুল, বোঝেও ভুল। একটি বৃক্ষের নিজস্ব প্রার্থনা সম্বন্ধে যেটুকু সহজবোধ আছে, তাও নেই মানুষের। তাই দেখা যায় তেঁতুল গাছ ঠিক টক রসটুকু টেনে নেয় পৃথিবী থেকে, নিমগাছ নেয় তিক্তরসটুকু আবার আম বা কাঁঠাল নেয় মিষ্টরসটুকু। কিন্তু মানুষ তার উন্নততম দেহযন্ত্র দিয়ে আরো অগ্রসর হবার শক্তি রাখে বলেই কি আলস্যে, অবহেলায় ও অজ্ঞতায় কেবলি বিচ্যুত হচ্ছে স্বধর্ম থেকে ?

তাই যদি না হবে, তবে কেন মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব হয়েও সিদ্ধি বা সাফল্য লাভ করতে পারছে না প্রত্যেকে, কেন আত্মান্ধ হয়ে পরস্পরে প্রবল বিরোধ করে মরছে চিরকাল ? অথচ একবার যদি মানুষ পণ করে বসে নিজেকে জানতে, একবার যদি বুঝে নেয় এ জীবনে সত্য সে কি চায় ধ্যানবলে, তবে কি আর অসাফল্য থাকে তার জীবনে ? যে তৃষ্ণা বুঝেছে, সে তো তখনি ছোটে জলপান করতে কিংবা যে ক্ষুধা বুঝেছে সে তো তখনি যায় অন্নের সন্ধানে। ঠিক সেইভাবে যিনি ধ্যানসিদ্ধ হয়েছেন, আত্মদর্শন করেছেন—তিনিও তখনি পেয়ে যান তাঁর পরমার্থ, তাঁর জীবনের সবার্থসিদ্ধি। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানই হচ্ছে বিজ্ঞানময় কোষের ক্রিয়া। এর পরের অবস্থাই হচ্ছে ব্রহ্মসদ্ভাব—যা পূজা পদ্ধতির শেষ লক্ষ্য।

॥ পূজকের সিদ্ধি—ব্রহ্মসদ্ভাব ॥

সেই ব্রহ্মসদ্ভাবই হচ্ছে তদ্ধাম বা জ্যোতিঃস্বরূপ অবস্থা। যার কথা বলতে গিয়ে গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন—

যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে
তদ্ধামং পরমং মম॥

—সেই হচ্ছে পরম জ্যোতির্লোক। যেখানে গেলে আর নিবর্তন করতে হয় না। এই নিবর্তন বলতে সাধারণত বলা হয় পুনর্জন্ম। ঐ শ্লোকাংশটির অর্থ করা হয় তাই—যেখানে গেলে আর পুনর্জন্ম হয় না—সেই হচ্ছে তদ্ধাম।

পুনর্জন্ম তো তখনি দুঃখকর হয়, যখন ভাবি যে—আমি যে অবস্থায় ছিলাম আবার সেই অবস্থার মধ্যেই এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু জীবনের পরাগতি যিনি বুঝেছেন, তিনি তো আর পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কোনই ভয় রাখেন না—তিনি তো তখন নিবৃত্তিও চান না। সেই কথাই অতি স্পষ্ট করে পাই গীতায়—

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্
যোগী মুহ্যতি কশ্চনঃ॥

এই দু'টি গতি যা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি আনে, তা যিনি সম্যকরূপে বুঝেছেন, তিনিই তো যোগী—তিনি আর প্রবৃত্তিতেও মোহ প্রাপ্ত হন না বা নিবৃত্তিতেও মোহপ্রাপ্ত হন না। সেই অনুত্তম অবস্থা হচ্ছে ব্রহ্মসদ্ভাব। যার গূঢ় অর্থ হচ্ছে ব্রহ্ম সর্বত্র সর্বদা আছেন—এই বোধ। তখন তো আর ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বলে কিছু থাকে না। যে সাধক বহিঃপূজা থেকে শুরু করে উত্তরোত্তর গতি লাভ করে সেই ব্রহ্মসদ্ভাবে পৌঁছে গিয়েছেন—তিনি তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পেয়েছেন। সে অবস্থা থেকে আর কি কখনো তিনি বিচ্যুত হন—সে যে অচ্যুত অবস্থা, যার অন্য নাম তুরীয়। সে তো বর্ণনার বিষয় নয়। তাইতো রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—'নুনের পুতুল সমুদ্রের খবর নিতে গিয়ে আর ফিরে আসে না, লোনা জলে গলে বিলীন হয়ে যায়।' আবার বলেছিলেন—'ঈশ্বর লাভের ফল ঈশ্বরলাভ, তার তুলনা নেই।' এই তো আনন্দময় কোষের ক্রিয়া—যা অবর্ণনীয়।

সেই অবস্থায় পৌঁছবার ইচ্ছা তো মানুষ মাত্রেরই মনে সুপ্ত রয়েছে। কোন পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রসর হলে ধীরে ধীরে সেই গন্তব্যে পৌঁছান যায় তারই তো বিস্তৃত নির্দেশ রয়েছে পূজা-পদ্ধতির মধ্যে। এখন কি প্রকট হয়ে ওঠে নি আমাদের কাছে যে, এই পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করার উপযোগিতা কতখানি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ? এ কি পুরোহিতের ওপর ভার দিয়ে বকলমে নিষ্পন্ন করার ?

॥ পঞ্চ মকার সাধনের রহস্য ॥

এতক্ষণে বোধ হয় প্রকাশ করে দেবার সময় হয়েছে পঞ্চ মকার সাধনের রহস্য। শবসাধনা ও ষট্‌চক্রভেদের রহস্য তো যতখানি সম্ভব আগেই আলোচিত হয়েছে—এবার বলি পঞ্চ মকার সাধনের কথা।

পঞ্চ মকার সাধনের পাঁচটি অঙ্গ আছে যথা—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। এই পাঁচটি অঙ্গের নাম শুনেই বহুজনে বহু বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন—এমন কি এই সাধনা যে মানুষকে একেবারে উৎসন্নে নিয়ে যায়, তা বলতেও দ্বিধা করেন না তাঁরা। কিন্তু একটু যদি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতেন তাঁরা, তা হলে নিশ্চয়ই পঞ্চ মকার সম্বন্ধে অতখানি ঘৃণা পোষণ করতেন না। অবশ্য তন্ত্রমতে পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাবে সাধনা করার কথাও বলা হয়েছে—এবং সেই ভাব অনুযায়ী ওই পঞ্চ মকারের অর্থও বিভিন্ন। এখানে কেবল ঐ দিব্যভাবে পঞ্চ মকার বলতে কি বোঝায় তারি আলোচনা করছি।

পূজাপদ্ধতির পাঁচটি অঙ্গ তো হচ্ছে বহিঃপূজা, জপ, স্তুতি, ধ্যান ও ব্রহ্মসদ্ভাব। পঞ্চমকারের ঐ মদ্যাদি পাঁচটি অঙ্গ যে সেই বহিঃপূজাদিরই দ্যোতক, তা একটু অনুধাবন করলেই প্রকাশ পায়।

॥ মদ্যসাধন ॥

প্রথম হচ্ছে মদ্যসাধন। সেই মদ্য কি তার বিশ্লেষণ পাই তন্ত্রে—

যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম
নির্বিকারং নিরঞ্জনং।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং
তন্মদ্যং পরিকীর্তিতম্ ॥

—যাঁকে বলা হয়েছে নির্বিকার নিরঞ্জন পরম ব্রহ্ম, তাঁকে নিয়ে বা তাঁর মধ্যে প্রমদনলাভ করার জ্ঞানই হচ্ছে মদ্য।

এ কি ওই সাধারণ মদ্য—যা শৌণ্ডিকালয়ে কিছু মূল্য ধরে দিলেই যে কেউ পেতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে? এ যে ব্রহ্মজ্ঞান। সে জ্ঞানলাভ করার প্রথম উপায় তো বহিঃপূজা। সে বহিঃপূজা করার ফলে প্রবল আসক্তি জাগে বারবার পূজা করে আরো অগ্রসর হবার। ঠিক সেই কথাই তো প্রকাশ পেয়েছে তন্ত্রে মদ্য সম্বন্ধে—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা
পতিত্বা চ মহীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা
পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

—এই মদ্য পান করে, পান করে, আবার পান করে ভূতলে গড়িয়ে পড়ে; আবার উঠে আবার পান করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

যারা সাধারণ মদ্য পান করে তারা তো একবার মাটিতে পড়ে গেলে আর উঠে দাঁড়াতেই পারে না, কাজেই তাদের পক্ষে আর পান করা সম্ভব নয়। আসলে বলা হচ্ছে ঐ বহিঃপূজার কথা। পূজক একবার পূজো করে পূজো করার আস্বাদ লাভ করে আবার পূজোয় বসেন। শেষে আনন্দে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন অভীষ্ট দেবতার সামনে—উঠে আরও পূজো করার ফলে তিনি পূজকত্ব থেকে লাভ করেন জাপকত্ব—সেইভাবেই দূর হয় তাঁর পুনর্জন্মের বন্ধন অর্থাৎ একই অবস্থার দাস হয়ে থাকা।

॥ মাংসসাধন ॥

দ্বিতীয় হচ্ছে মাংসসাধন। মাংস কাকে বলে তাও তো তন্ত্রে পাই—

মা শব্দাৎ রসনা জ্ঞেয়া
তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি
স এব মাংসসাধকঃ॥

—হে রসনাপ্রিয় দেবি, মা শব্দের অর্থই হচ্ছে জিহ্বা—সেই জিহ্বার অংশ যে সর্বদা ভক্ষণ করে—তাকেই তো মাংসসাধক বলে।

অনেকে এর অর্থ করেন যে, বাক্‌সংযমই হচ্ছে মাংসসাধনা। কিন্তু মাংস তো চর্বণ করে খেতে হয়। যিনি সদাসর্বদা চর্বণ করে খান মাংসকে, তিনিই হচ্ছে যথার্থ মাংস-সাধক। সেই চর্বণ করার বস্তুটি কি—তার সন্ধান পাই সন্ত কবীর দাসের দোহায়। তিনি বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিজন হংসদশা লিয়ে ডোলে।
নির্ম্মল নাম চবায় যস বোলে॥

—যাঁরা হরিজন অর্থাৎ ভক্ত সাধক, তাঁরা সর্বদা হংসের দশা লাভ করে দোলা খান—আর সর্বদা চিবোতে থাকেন নির্মল নাম।

বাস্তবিক জপই তো হচ্ছে সর্বক্ষণ চিবিয়ে খাওয়ার বস্তু। সেই তো মাংস।

॥ মৎস্যসাধন ॥

তৃতীয় হচ্ছে মৎস্যসাধন। মৎস্য কাকে বলে—তার সম্বন্ধে তন্ত্র বলেন—

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে
মৎস্যৌদ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু
স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥

—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যে দু'টি মাছ সর্বদা বিচরণ করে, যে সে দুটিকে ভক্ষণ করতে পারে—সে হচ্ছে মৎস্যসাধক।

অনেকে এর অর্থ করেন প্রাণায়াম। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসকেই তাঁরা বলেন দু'টি মৎস্য, যা সর্বদাই চরমান, তাদের ভক্ষণ করা বা রোধ করাই হচ্ছে মাংসসাধনা। কিন্তু গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশ বা সঙ্গমস্থান কোথায়? শ্বাসের ক্রিয়া তো হয় নাসিকায় সেখানে কি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থান? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে জানা দরকার—গঙ্গা ও যমুনা বলতে কি বোঝায়? এ সম্বন্ধে আবার একবার শরীর-বিজ্ঞানের কথা তুলতে হয়। গঙ্গা বলতে বোঝায় আর্টারি বা ধমনী আর যমুনা বলতে বোঝায় ভেইন বা শিরা। ওই ধারা সংযুক্ত হয়েছে হৃৎপিণ্ড বা হৃদয়দেশে। আমরা আগেই জেনেছি যে, হৃদয়েই হচ্ছে বিষ্ণুর স্থান—তাই গঙ্গাকে বলা হয় বিষ্ণুপাদনিঃসৃত অর্থাৎ হৃদয়দেশ থেকে পরিস্রুত হয় রক্ত অক্সিজেনের সাহায্যে এবং তা ছড়িয়ে যায় শরীরের বিভিন্ন অংশে। আর যমুনাও গিয়ে পড়েছে সেই বিষ্ণুপাদপদ্মে। শাস্ত্রে পাই যমুনা সূর্যের কন্যা। সূর্য ও বিষ্ণু যে অভিন্ন তারও প্রমাণ শাস্ত্রেই আছে। যাই হোক, যমুনাই শরীরের সমস্ত অংশ থেকে ক্রিয়াদুষ্ট রক্তকে বয়ে নিয়ে যায় ঐ হৃদয় দেশে—সেই রক্ত আবার পরিস্রুত হয়ে গঙ্গার পথে প্রবাহিত হয়। সুতরাং গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থান হচ্ছে ঐ হৃদয়দেশ। রক্তচলাচলের এ তথ্য এ যুগে প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন হার্ভে সাহেব—তার লোকবিশ্রুত তথ্যটির নাম—থিওরি অব ব্লড্ সার্কুলেশান। কিন্তু সে কথা থাক।

গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থানে মৎস্যরূপে কোন সত্য সর্বদা বিচরণ করে তাই আমাদের জ্ঞাতব্য। সেই হৃদয়দেশ যে অতি গভীর তা বলাই বাহুল্য—আর সেই গভীরে থাকে বলেই মৎস্য শব্দ প্রয়োগ করে সেই সত্যের দিকে সবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু আসলে মৎস্য বলতে কি বোঝায়? বোঝায় হৃদয় নিহিত দু'টি ভাবকে—যার একটি হলো দ্বৈতবাদ আর একটি হলো অদ্বৈতবাদ অথবা আরো সহজ করে বলতে পারা যায়—একটি হলো ব্যক্তি বা ব্যষ্টিগত স্বার্থ আর একটি হলো সমাজ বা সমষ্টিগত পরার্থ। হৃদয়ের গভীরে সর্বদাই চলেছে সেই দুই ভাবের খেলা। কিন্তু তা বুঝে নিতে হলে প্রথম দরকার বহিঃপূজা, তারপর দরকার জপ—সেই দুই সাধনায় যখন হৃদয়ের আলোড়ন দূর হয়—সরোবরের জল নিস্তরঙ্গ হয়—তখনি দেখতে পাওয়া যায় ওই গভীরের মৎস্যদু'টি বা ভাবদু'টিকে। আর তখনি তো সাধকের পক্ষে সম্ভব হয় স্তুতির দ্বারা স্বার্থ ও পরার্থকে সামঞ্জস্য করে নেয়—এই হলো মৎস্যসাধনার গূঢ় রহস্য। বাস্তবিক পক্ষে স্তুতি তো পাঠ করি আমরা সবাইকে শোনাবার জন্যে।

॥ মুদ্রাসাধন ॥

চতুর্থ হচ্ছে মুদ্রাসাধন। মুদ্রা সম্বন্ধে তন্ত্র বলেন—

সূর্যকোটিপ্রতীকাশং
চন্দ্রকোটিসুশীতলং।
অতীব রমণীয়ঞ্চ
মহাকুণ্ডলিনীযুতং।
যস্যজ্ঞানোদয়স্তত্র
মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥

—মুদ্রা সাধক তাঁকে বলে, যাঁর মহাকুণ্ডলিনী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়েছে। সেই মহাকুণ্ডলিনী অতীব রমণীয়, যাঁর প্রভা কোটি সূর্যের মতো আর শীতলতা কোটি চন্দ্রতুল্য।

এই মুদ্রাই তো সূক্ষ্মধ্যান—যার বলে সাধক আপন অন্তরস্থিত পরমচৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনীর বা আত্মশক্তির সম্বন্ধে অবহিত হন। তখন তিনি জানেন ঐ সূর্য চন্দ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে যাঁর দিব্যজ্যোতি স্ফুরিত, তাঁর নিজের মধ্যেও তাঁরই জ্যোতি অহরহ বিগ্তমান। তখন যে আপনা থেকেই নয়ন মুদ্রিত হয়ে যায়—মনে মনে কেবলি অনুভব করেন তিনি ভিন্ন নন, পৃথক নন এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে। এ অনুভূতি যিনি লাভ করেছেন, তিনি আর দেখবেন বা কি, শুনবেন বা কি? পরম পরিপূর্ণতায় তিনি তো বিভোর হয়ে যান, সেই সুখে নয়ন যে আপনি মুদ্রিত হয়ে যায়। এই তো মুদ্রা সাধনার অন্তর্নিহিত সত্য।

॥ মৈথুনসাধন ॥

এবার শেষ অঙ্গ মৈথুনসাধন। মৈথুন সম্বন্ধে তন্ত্রে পাই—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং
স্থষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্
ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ॥

—মৈথুনই হচ্ছে পরম তত্ত্ব, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূল কারণ। সেই মৈথুন থেকেই দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

সেই মৈথুন কি সাধারণ কামজ মৈথুন? মোটেই তা নয়। মুদ্রাসাধক যখন নিজের অন্তরস্থিত কুণ্ডলিনীর স্বরূপ জানতে পেলেন, তখনি তো তাঁর অধিকার জন্মাল মৈথুন সাধনার। তিনি প্রণিধান করলেন তাঁর মধ্যে যিনি ঘটাকাশ-রূপে অবস্থিত, তিনিই বাহির বিশ্বে মহাকাশরূপে বিরাজ করছেন। শুধু তাই নয়, সর্বক্ষণ চলছে সেই ঘটাকাশ ও মহাকাশের মিলন। অতি সাধারণভাবে তো দেখা যায় যে, নাসারন্ধ্র দিয়ে অবিশ্রান্ত ভাবে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করছে, আবার ভিতরের বায়ু বাইরে মিশে যাচ্ছে। আরো লক্ষ্য করার যে গ্রীষ্মঋতুতে মানুষমাত্রেরই ঘাম বের হয় লোমকূপ দিয়ে। শরীর-তত্ত্ববিদ্‌রা জানেন যে—প্রতিটি লোমকূপ হচ্ছে এক একটি ছিদ্র সেই পথে বাহিরের শক্তিপ্রবাহ অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম রূপে অবিরত শরীরের মধ্যে চলাচল করছে। অবশ্য সাধারণ চোখ দিয়ে তো লোমকূপগুলিকে ছিদ্র বলেই মনে হয় না, তেমনি সাধারণ চোখ দিয়ে লক্ষ্য করাও যায় না কি করে সেই ছিদ্রপথে আকাশ, বায়ু ও তেজ প্রবাহিত হচ্ছে—কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান যন্ত্রের চক্ষু দিয়ে তা প্রত্যক্ষ করেছে। পূর্বযুগের তান্ত্রিকরা তাঁদের সাধনা-বলে উপলব্ধি করেছিলেন এই সত্য। তাইতো তাঁরা বুঝেছিলেন সর্বক্ষণ চলেছে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের মৈথুন আর তার ফলে দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। এই বোধই তো পরম সিদ্ধি, এই বোধই তো ব্রহ্মজ্ঞান— তবে হ্যাঁ, এ বোধ লাভ করা সত্যিই অতি দুর্লভ। যাঁর এ বোধ হয়েছে তিনিই ধন্য, তিনিই পারেন সন্ত কবীর দাসের মত বলতে যে—'বেঁচে আছি তো রামের মধ্যে, মরেও তো মিশে যাব সেই রামেরই মধ্যে—তবে ভয় কোথায় এবং কিসের ?'

শাস্ত্রেও দেখি এই অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে এই ভাবে—

আত্মনি রমতে যস্মাৎ
আত্মারামস্তদুচ্যতে ॥

—যেহেতু আত্মাকে নিয়েই তখন ক্রীড়া চলে, তাই সেই অবস্থায় যিনি পৌছেছেন তাঁকে আত্মারাম বা আত্মক্রীড় বলা হয়।

আত্মাই তো আছেন সর্বব্যাপী হয়ে। কে জানে, ইওরোপের অ্যাটম্ শব্দটি ওই আত্মা শব্দ থেকেই উৎপন্ন কিনা। সেই আত্মা বা অ্যাটম্ জীব জড়রূপে সর্বত্র প্রকাশমান, আবার তার বাইরেও অদৃশ্য অবস্থায় বর্তমান। এই সত্য যাঁর মনে উদ্ভাসিত হয়েছে তিনিই তো 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই আপ্তবাক্যের সারবত্তা বুঝে প্রতিলোমকূপে মৈথুনানন্দ উপভোগ করেন। এই তো মৈথুনসাধনার শেষ কথা।

'শ্যামারহস্যম্' পুস্তকখানি প্রণয়ন করতে গিয়ে পূর্ণানন্দ পরমহংস জানিয়েছেন—অথ পঞ্চমকারেণ সর্বং আপ্নোতি বিদ্যাং। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে মোক্ষায় জ্ঞানায় ধর্মায়। তৎ সর্বং ভূতং ভব্যং যৎকিঞ্চিৎদৃশ্যাদৃশ্যমানং স্থাবরং জঙ্গমং ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥

—তাই এই পঞ্চ মকার সাধনার দ্বারা সবাই বিদ্যালাভ করে। মোক্ষ হোক, জ্ঞানই হোক আর ধর্মই হোক, অন্য কোন পথেই লাভ করা যায় না। এই যে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ, এখানে যা কিছু হয়েছে ও হবে, তা স্থাবরই হোক আর জঙ্গমই হোক সবই সেই তৎ বা ব্রহ্ম থেকেই হয়েছে। ইতি শ্রুতি।

তাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ছিল বা আছে বা হবে, সবই তো সেই ব্রহ্ম বা আত্মা বা শক্তির প্রকাশ, এ-বোধ যাঁর জেগেছে তিনিই ধর্মলাভ করেছেন, জ্ঞানলাভ করেছেন এবং মোক্ষলাভ করেছেন। ধর্মকে ধরে থাকলেই জ্ঞান জাগে, আর জ্ঞানই জাগায় মোক্ষ বা সর্বত্র অবন্ধনের বোধ। এ সত্যটিই প্রতিভাত হয়েছে ঐ শ্রুতিবাক্যটিতে। সেই বোধ যাঁর জেগেছে তিনি সর্বদাই চাইবেন সবকিছুর সঙ্গে মিথুনীভূত বা যোগযুক্ত হয়ে আনন্দলাভ করতে। সেই তো পূজাপদ্ধতির ব্রহ্মসদ্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বদা সর্বত্র অবস্থিত এই বোধ লাভ করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ তান্ত্রিক পঞ্চ মকার সাধনা ও বৈষ্ণব পঞ্চ তত্ত্বসাধনা ॥

বৈষ্ণবাচার্যরা যে পঞ্চ তত্ত্বসাধনার নির্দেশ দিয়েছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর নামে—তার সঙ্গে পঞ্চ মকারের কতখানি মিল, তা একটু না বলে পারছি না।

আমরা জেনেছি মদ্যসাধন বা বহিঃপূজা হচ্ছে অশান্ত চিত্তকে শান্ত করার উপায় তাকেই কি বৈষ্ণবরা শান্তভাবের উপাসনা বলেন না? মাংসসাধন বা জপই তো দাস্যভাব—সর্বদাই প্রভুর নাম জপ করে যাওয়া। মৎস্যসাধন বা স্তুতি তো সখ্যভাব—সখাই তো হয় সমপ্রাণ—সর্বদা সখার সুখের কথা ভাবে। মুদ্রাসাধন বা ধ্যানই তো বাৎসল্যভাব—সেইভাব যাঁর জেগেছে তিনি তো কেবলি অন্ধের মতো চোখ মুদ্রিত করে সন্তানের শুভ চিন্তা করেন। মনে পড়ে কীর্তন পদাবলীতে পাই—

যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সাহসে উঠই না পারে।

আর মৈথুনসাধন বা ব্রহ্মসদ্ভাব তো মধুরভাব—সে ভাবে তো রাধিকা বা আরাধিকা আরাধ্য কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

বলাই বাহুল্য বৈষ্ণব পঞ্চ তত্ত্বেও প্রকটিত হয়েছে পঞ্চকৌষিক ক্রিয়ার সার সত্যটুকু।

॥ পঞ্চ মকারের নামকরণ ॥

একটি প্রশ্ন মনে আসে যে—এমন পরাবিদ্যালাভের পথ দেখাতে গিয়ে কেন তান্ত্রিক আচার্যরা সাধনমার্গের নামগুলি অমন দ্ব্যর্থক করেছিলেন। পঞ্চ মকারের মদ্যাদি নাম শুনলেই তো মনে দ্বিধা জাগে। এমন কাণ্ড তাঁরা কেন করেছিলেন ভাবতে গেলে এই কথাই মনে হয় যে, তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে তন্ত্রসাধনাকে লোভনীয় করার আগ্রহেই বোধ হয় এ পথ ধরেছিলেন। এ ধারণা আরো দৃঢ় হয় যখন দেখি যে, প্রতিটি সাধারণ মানুষের কাছে মৈথুনের আনন্দই হচ্ছে চূড়ান্ত। ঠিক সেই নামটিই তান্ত্রিক আচার্যরা দিলেন ব্রহ্মসদ্ভাবের পরমানন্দবোধকে। ওই আনন্দই যে শেষ লক্ষ্য, এ কথা তো আনন্দময় কোষের কথা থেকে জানতে পাই। আবার উপনিষদেও পাই—

আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্
/ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ॥

—ব্রহ্মের সেই আনন্দকে জানলে আর কোথাও ভয় বলে কিছুই থাকে না।

বাস্তবিক,ভয়ই তো রোধ করে আমাদের আনন্দকে। সেই ভয় জাগে দ্বৈতবোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে। যতক্ষণ ভাবি আমার আশেপাশে যা কিছু আছে, সবই আমার থেকে ভিন্ন—ততক্ষণ ভয় যায় না। কিন্তু যেই অদ্বৈতবোধ জাগে—বুঝতে পারি আমিও যা আমার আশেপাশে যারা আছে তারাও ঠিক তাই, তখন আর ভয় করব কাকে? পরমানন্দেই যে তখন সবাইকে আঁকড়ে ধরি বা ছেড়েও দিই।

সেই আনন্দের রমণীয়তা বোঝাতে গিয়েই আরো বলা হয়েছে—রসো বৈ স:॥—তিনি রস ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু সেই রস আবার মানুষকে অবশও করে দেয়। সেই রস আস্বাদন করার পরে সহজে আর সাধক সংসারের কোনো কাজে যোগ দিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তাই রামকৃষ্ণদেব প্রার্থনা করতেন—"মা, আমায় রসে বশে রাখিস।"

বাস্তবিক রসিক বা ভাবুক বা ব্রহ্মজ্ঞানী যদি অবশী হন, তার চেয়ে বিপর্যয় আর কিছু নেই। তাই গীতায়ও দেখি শ্রীভগবান্ অর্জুনকে সন্ন্যাসযোগ শেখাতে গিয়ে 'বশী' হবার উপদেশ দিচ্ছেন।

মৈথুন সম্বন্ধে আরো কিছু কথা বলি। একটি সত্য তান্ত্রিকরা প্রমাণ প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন যে, দ্বার যেখানেই আছে, যদিও তা স্বভাবতঃ নির্গমনের জন্যে ব্যবহৃত হয় কিন্তু সাধনা বা অভ্যাসের দ্বারা সেই দ্বারকে বিপরীত ক্রিয়ায়ও ব্যবহার করা যায়। সেই অভ্যাসের দ্বারা আমাদের প্রতি লোমকূপ দিয়েই প্রত্যক্ষভাবে অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমকে গ্রহণ ও ত্যাগ করা যায়। আর স্বাভাবিক নিয়মে ওই লোমকূপগুলি দিয়ে কেবল মাত্র আমরা গ্রহণই করে থাকি, যদিও তার সম্বন্ধে মানুষ অবহিত নয়। কিন্তু এ সত্য তো আমরা প্রায়ই উপলব্ধি করি যে যখন বাতাসের বা তেজের সম্পর্ক লাগে আমাদের বহিরঙ্গে তখন অন্তরঙ্গেও তার ক্রিয়া জাগে। এই ভাবে সর্বক্ষণ আমাদের শরীরের মধ্যে বদ্ধ শক্তির সঙ্গে ওই বাহিরে অবস্থিত বিরাট শক্তির মৈথুন সম্পন্ন হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওই ভাব আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অন্যের যোগও রক্ষা করে চলেছে ওই শক্তি, পৃথক আমরা কোথায়? একটু চিন্তা করলে তো দেখি—যে পৃথিবীতে আমি দাঁড়িয়ে সেই পৃথিবীতো অন্য সবাইকে ধারণ করে আছে এবং সবায়ের সঙ্গে সবায়ের যোগ রক্ষা করে চলেছে। এ কথা বিশ্বব্যাপী জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ সম্বন্ধে অনুরূপ সত্য। সে দিক দিয়ে বিচার করলে কেউ তো আমরা কারো থেকে দূরে নই। সেই সত্য তো বর্তমান যান্ত্রিক যুগে আরো প্রত্যক্ষ ভাবে জানছি আমরা রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে। বর্তমান যুগ যন্ত্র সাহায্যে যা প্রমাণ করছে, পূর্বকালের তন্ত্রযুগে সেই সত্যই অধিগত করেছিলেন তান্ত্রিকরা তাঁদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্র বা মননশক্তি বলে। সেই কাল থেকেই তো মানুষের মনে জেগেছে দেশগত ও কালগত দূরত্বকে অপসারণ করে দেবার চিন্তা—সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নেবার চেষ্টা। সেই তো হবে ব্রহ্মসদ্ভাব বা মৈথুনের পরম পরিণতি। বিশ্বের সমস্ত মানুষ তখনি তো চিনতে পারবে পরস্পরকে—ভেদবোধের যে দুরন্ত ভয় জেগে আছে প্রত্যেকের মনে—তা একেবারে সব নিশ্চিহ্ন হবে। তখনই এই মর্ত্যধামে আনন্দময় স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হবে।

॥ তন্ত্রের মূলতত্ত্ব ॥

বিশ্বজনের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের উপায় বলতে গিয়েই এদেশে প্রথম প্রচারিত হলো সেই আপ্তবাক্য "আত্মানং বিদ্ধি"। পাশ্চাত্য দেশেও মহাজ্ঞানী সক্রেটিস ওই কথাটির প্রতিধ্বনি শোনালেন 'নো দাইসেলফ'। বাস্তবিক যে ব্যক্তি নিজের পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ তার পক্ষে তো কখনোই সম্ভব হয় না পার্শ্বস্থিত অন্য ব্যক্তি ও বস্তুর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আহরণ করা বা তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা। এই অজ্ঞানতাকেই চিরকাল অন্ধতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাই গুরুপ্রণামের মন্ত্রটিতে পাই—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য
জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

—অজ্ঞানের অন্ধকারে যে অন্ধ তার চক্ষু যিনি জ্ঞানের অঞ্জন শলাকা দিয়ে উন্মীলিত করে দেন—সেই সর্বসুন্দর গুরুকে প্রণাম করি।

যে ব্যক্তি নিজেকেও চোখ খুলে দেখে নি বা কান পেতে শোনে নি—সে আর কি করে জগৎসমগ্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে? এখানে আবার একবার বলে নিই, যোগ সম্বন্ধে শাস্ত্র যা জানিয়েছেন—

ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে
ন ভূমৌ ন রসাতলে।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্
যোগং যোগবিশারদাঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যোগের খোঁজে আকাশের পারেও যেতে হবে না, পৃথিবী ঢুঁড়েও বেড়াতে হবে না বা রসাতলেও নামতে হবে না, যোগবিশারদরা বলেন -জীবের সঙ্গে আত্মার অথবা ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির ঐক্য ঘটালেই যোগ সিদ্ধ হয়।

আরো পাই—

যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং
পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো
ন যোগো ন চ পূজনম্॥

—যোগ হচ্ছে জীব ও আত্মার ঐক্য আর পূজা হচ্ছে সেবক ও ঈশ্বরের একত্র পূজা। শেষে যখন সবই ব্রহ্ম এই বোধ জাগে—তখন আর কে কার সঙ্গে যুক্ত হবে কেই বা পূজো করবে কার? সেই তো ব্রহ্ম জ্ঞান।

সেই যোগসাধনা আমরা যে যেখানে যে পরিবেশের মধ্যে আছি সেখানে সেই অবস্থার মধ্যেই অভ্যাস করতে পারি। কোন পথ ধরে তা অভ্যাস করতে হবে—তার নির্দেশ তো তান্ত্রিক আচার্যরা জানিয়ে দিয়েছেন ঐ পূজাপদ্ধতির মধ্যে দিয়েই। এ কথা কি আর আমাদের বুঝতে বাকী আছে?

॥ তান্ত্রিক ভাবসাধনা ॥

পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে আরো কিছু জানবার কথা আছে। সে হচ্ছে ভাবসাধনা। সাধারণভাবে জগতে তিনটি শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। শাস্ত্রে তাদের বলা হয়েছে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। সেই তিন শ্রেণীর মানুষের জন্যে তিন ভাবের সাধনার ব্যবস্থাই কি—যথা পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব? কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে—প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব তিনটি গুণই যেন মিশ্রিত হয়ে আছে। এমনও তো দেখা যায় যে—কোনো ডাকাত পরের মেয়ের হাত থেকে বালা খুলতে না পেরে তার হাতখানাই কেটে বালা খুলে নিয়েছে—আর সেই বালা এনে তার নিজের মেয়ের হাতে পরিয়ে তাকে আদর করছে। অর্থাৎ অতি নিষ্ঠুর যে মানুষ সামান্য কারণে যে খুন করতেও দ্বিধা করে না—সেও আবার মায়া-দয়ারও অধিকারী হয়। এমনি বিচিত্র চরিত্র মানুষের। তন্ত্রও ঠিক সেই সত্যকেই স্বীকার করেন। ভাবসাধনা সম্বন্ধে রুদ্রযামলে পাই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশুভাবং হি প্রথমে
দ্বিতীয়ে বীরভাবকং।
তৃতীয়ে দিব্যভাবকং
ইতি ভাবত্রয়ং ক্রমাৎ ॥

—প্রথম হচ্ছে পশুভাব, দ্বিতীয় বীরভাব, আর তৃতীয় দিব্যভাব। এ তিনটি ভাবই আসলে ক্রমোন্নতির পর্যায়। অর্থাৎ একই সাধক প্রথম পশুভাবে সাধনা করে বীরভাব লাভ করেন। আবার বীরভাবে সাধনা করে দিব্যভাব লাভ করেন।

এই প্রসঙ্গে চণ্ডী সপ্তশতীর তিনটি চরিত্রে যে অপূর্ব সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাই, তার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথম চরিত্রে পাই কি ভাবে পশুভাবসাধনা বা কর্ম-সাধনার মহা বাধা মধুকৈটভরূপী কাম ও মোহকে নাশ করে ব্রহ্মগ্রন্থী ভেদ করতে হয়। মধ্যম চরিত্রে বীরভাবসাধনা বা জ্ঞানসাধনার মহা বাধা মহিষাসুররূপী ক্রোধ ও মদকে নাশ করে বিষ্ণুগ্রন্থী ভেদ করতে হয়। আর উত্তর চরিত্রে দিব্যভাবসাধনা বা ভক্তি-সাধনার মহা বাধা শুম্ভনিশুম্ভরূপী লোভ ও মাৎসর্যকে নাশ করে শিবগ্রন্থী ভেদ করতে হয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি আর আছে তাদের বাধাস্বরূপ, কাম, ক্রোধ ও লোভ। মজা এই যে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিই বিপথে গেলে হয় কাম, ক্রোধ ও লোভ ; তখনই তা গ্রন্থী হয়ে ওঠে।

গীতায় পাই—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং
দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্
তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ —১৬।২১

—আত্মাকে ধ্বংস করার তিনটি নরকদ্বার হচ্ছে কাম, ক্রোধ আর লোভ। তাই এই তিনটিকে ত্যাগ করতেই হবে।

কাম নষ্ট করে দেহকে বা ব্রহ্মাকে যাঁর বলে জগতে সর্ব কর্ম সম্পন্ন হয়। ক্রোধ নষ্ট করে প্রাণ বা বিষ্ণুকে যাঁর বলে লাভ হয় সর্বজ্ঞান। আর লোভ নষ্ট করে মন বা শিবকে যাঁর বলে পরাভক্তি লাভ হয়। যে সাধকের কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে অর্থাৎ সাদা কথায় যিনি দেহে সক্ষম, প্রাণে উদার ও মনে অতন্দ্র—তিনিই তো সিদ্ধপুরুষ। তন্ত্র সাধককে তো সেই পরিপূর্ণ সিদ্ধির পথেই নিয়ে যেতে চান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশুভাবসাধনায় বা কর্মসাধনায় যে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পাই, সে কথা গীতাতেও তো প্রকাশিত—

সর্বং কর্মাখিলং পার্থ
জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥—৪।৩৩

—হে পার্থ, সমস্ত কিছু কর্মের পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে।

আর সেই জ্ঞানসাধনা বা বীরভাবসাধনার শেষ ফল হচ্ছে—

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্
অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥—৪।৩৯

—জ্ঞানলাভ করলেই পরাশান্তি লাভ করতে আর বিলম্ব হয় না।

সেই পরাশান্তিই তো যোগ বা ভক্তির অন্য নাম—তাকে আবার ব্রাহ্মীস্থিতিও বলে। সেই তো দিব্যভাবসাধনা, যার অধিদেবতা স্বয়ং শিব—তিনি যেমন মহাযোগী, তেমনি মহাভক্ত। সেই শিবের সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেন—

শান্তং শিবং অদ্বৈতম্ ॥

—তিনি শান্ত, শিব, অদ্বৈত। কর্ম ও জ্ঞান একীভূত হয়ে জেগেছে তাঁর মধ্যে ভক্তিরূপে।

আবার দেখি সেই শিব যখন পশুভাবসাধনার উপদেশ দেন তখন তিনি পশুপতি ; যখন বীরভাবসাধনার উপদেশ দেন, তখন বীরভদ্র ; আর যখন দিব্যভাবসাধনার উপদেশ দেন তখন দেবাদিদেব মহাদেব। এতক্ষণে বোধ হয় আমরা পশু, বীর ও দিব্যভাবের মূলতত্ত্ব কি—তা কিছুটা বুঝতে পেরেছি।

॥ তান্ত্রিক আচার ॥

এবার বলি—তন্ত্রশাস্ত্রে আচার সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে। সর্বসমেত সাতটি আচারের উল্লেখ পাই কুলার্ণব তন্ত্রে—যেমন—

সর্বেভ্যোশ্চোত্তমো বেদা
বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরং।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং
শৈবাদ্দিক্ষণমুত্তমম্ ॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং
বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমং।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং
কৌলাৎ পরতরং ন হি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—বেদাচার থেকে শুরু করে ক্রমশ উচ্চতর হচ্ছে বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। কৌলাচারের চেয়ে উচ্চতর আর কিছু নেই।

অনেকে আবার অঘোরাচার ও যোগাচার নামে আরো দু'টি আচারের উল্লেখ করেন। তাতে দাঁড়ায় সর্বসমেত ন'টি আচার। কিন্তু অঘোরাচার ও যোগাচার যে ঐ কৌলাচারের অন্তর্গত, তা আমরা ক্রমশই জানতে পাব।

এখন দেখা যাক, ঐ যে আগে ভাবসাধনার কথা আমরা জেনেছি তার সঙ্গে এই আচারের কি সম্বন্ধ? একটি নির্দেশ পাই তন্ত্রে—

বেদিকং বৈষ্ণবং শৈবং
দক্ষিণং পাশবং স্মৃতং।
সিদ্ধান্তে বামে বীরে তু
দিব্যং সৎ কৌলমুচ্যতে॥

—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবসাধনার অন্তর্গত, বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবসাধনার আর কৌলাচার হচ্ছে দিব্যভাবসাধনার অন্তর্গত।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, চারটি আচার পালন করলে শেষ হয় পশুভাব-সাধনা বা কর্মযোগীর সাধনা, দু'টি আচার পালন করে শেষ হয় বীরভাবসাধনা বা জ্ঞান-যোগীর সাধনা আর শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি আচার পালন করতে হয় দিব্যভাবসাধনায় বা ভক্তিযোগীর সাধনায়। সত্যিই তো ভক্তি হচ্ছে এক এবং অদ্বিতীয়—তাই গীতাও বলেন—

একভক্তির্বিশিষ্যতে॥ —৭।১৭

যাঁরা তন্ত্রের ন'টি আচারের খবর দেন—তাঁরা জানান যে প্রত্যেক ভাবসাধনায় তিনটি করে আচার পালন করতে হয়। সেইভাবে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণকে আয়ত্ত করে নিতে হয়। এ কথা কিন্তু তর্কগ্রাহ্য নয়। সাধারণভাবে তো দেখা যায় যে, কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে গেলে প্রথমেই সেই বিষয়টির সব দিককার পরিচয় নেয়া দরকার। ক্রমশ শিক্ষা হয়ে ওঠে একমুখী। সেদিক থেকে তো পশুভাবে চারটি আচার, বীরভাবে দু'টি ও দিব্যভাবে একটি আচার পালন করাই যুক্তিযুক্ত। নানাত্ব তো ততোক্ষণ থাকে, যতোক্ষণ একত্বে না পৌঁছতে পারি। মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণদেবের উক্তি—"বৌ পোয়াতি হলে শাশুড়ী ক্রমশই তার কাজ কমিয়ে দেয়। শেষে ছেলে হলে, সেই ছেলেটিকে নিয়ে বৌ নাড়ে চাড়ে। সেই একটিমাত্র কাজ থাকে তার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার মোক্ষযোগেও তো সেই সত্য উদ্ঘাটিত—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ ॥ —১৮।৬৬

—আর ধর্ম নেই, আর আচার নেই, সব ত্যাগ করে সেই একের শরণ নিয়ে চলাই তো শেষ কথা।

চণ্ডী সপ্তশতীতেও তো উত্তর চরিত্রে দেবী বলছেন শুম্ভকে—

একৈবাহং জগত্যত্র
দ্বিতীয়া কা মমাপরা ॥ —১০।৫

—আমি একাই তো আছি জগতে। অন্য দ্বিতীয় আবার কে এখানে?

বাস্তবিক, কৌলাচারের মধ্যেই যে অন্য সমস্ত আচার বিলীন হয়ে যায়—তার কথাও তো তন্ত্রেই পাই—

করিপাদে নিমজ্জন্তি
সর্বে প্রাণিপদা যথা।
কুলধর্মে নিমজ্জন্তি
সর্বে ধর্মাস্তথা প্রিয়ে ॥

—হে প্রিয়ে, হাতীর পদচিহ্নে যেমন অন্য সমস্ত প্রাণীর পদচিহ্ন বিলীন হয়ে যায়, সেইভাবে কুলধর্মে অর্থাৎ কৌলাচারে অন্য সমস্ত আচারই বিলীন হয়ে যায়। ধর্ম মানেই তো আচার।

বাস্তবিক ভক্তির চেয়ে বড় আর কি আছে? সেই ভক্তিই তো সমন্বয় করে দেয় কর্ম ও জ্ঞানের। ভক্তিমান্ ব্যক্তিই তো যথার্থ সমদর্শী। তাঁর কাছে বিদ্যাবিনয়ে ভূষিত ব্রাহ্মণ, গোরু, হাতী, কুকুর, চণ্ডাল সবই এক হয়ে যায়—সর্বত্রই তিনি দর্শন করেন ব্রহ্মকে। সেই তো কৌলাচার্যের মহত্ত্ব। তাঁদের সম্বন্ধে তন্ত্র বলেন—

অন্তঃশাক্তাঃ বহিঃশৈবাঃ
সভায়াং বৈষ্ণবাচরেৎ।
নানারূপধরাঃ কৌলাঃ
বিচরন্তি মহীতলে ॥

—অন্তরে অগাধ শক্তিধারণ করে, বাইরে শিবের মতোই নিস্পৃহ হয়ে, সভায় অর্থাৎ জনসমাজে বৈষ্ণবের মতে আচরণ করেন কৌলরা। নানারূপ ধারণ করে তাঁরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকে কিন্তু এই শ্লোকটির অর্থ করেন কৌলদের প্রতি বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে। তাঁরা বলেন কৌলরা না শাক্ত, না শৈব, না বৈষ্ণব—পৃথিবীতে তাঁরা যা খুশী করে বেড়ান। তাঁরা ভুলে যান যে অন্তরে যাঁর শক্তি জেগেছে, তাঁরই পক্ষে সম্ভব শিবের মতো উদাসীন হয়ে থাকা এবং বিষ্ণুর মতোই প্রভাব বিস্তার করে সর্বত্র সর্ব অবস্থায় বিহার করা। ব্রহ্মদর্শন করেছেন যিনি, তিনি কি আর কোন বিশেষ ভাব বা অবস্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেন?

সেই কৌলদেরই তো দেখা যায় অঘোরপন্থী বা যোগাচারী রূপে। সেই কৌলাচারের গূঢ় রহস্য না জেনে অনেকেই তাই কৌলকে দেখে তাঁদের চরিত্র না বুঝে নানা ভাবে তাঁদেরকে অপাংক্তেয়, অনাচারী মনে করেন। এর জন্যে দায়ী বোধ হয় ঐ তান্ত্রিক পঞ্চ মকারসাধনার পরিভাষা।

॥ তান্ত্রিক পরিভাষা ॥

বাস্তবিক তান্ত্রিক সাধনায় ঐ মদ্যমাংস থেকে মৈথুন পর্যন্ত শব্দগুলি প্রচলিত, দেখে স্বভাবতই তো মনে হয় যে, তন্ত্র বুঝি কেবল ব্যভিচারেরই প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তন্ত্রের গভীরে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, তাঁরা জানেন কি সত্য।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে বৈদিক সাধনার ত্রিসবন-ক্রিয়াকে ঘিরে যে অদ্ভুত কাহিনীটি প্রচারিত আছে। সেটি পুরূরবা ও উর্বশীর প্রেমকাহিনীরূপেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ঋগ্‌বেদে সে সম্বন্ধে যে সূক্তটি আছে—অনেকে মনে করেন যে নাটক বা কথোপকথনে কোনো কাব্য রচনা করার প্রথম সূত্রপাত হয় সেই সূক্তে। যাই হোক, তাতে যে কাহিনীটি বিধৃত তা থেকে জানা যায় যে, পুরূরবা প্রতিদিন তিনবার; সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় উর্বশীকে নিয়ে আনন্দ করতেন। এ ইঙ্গিতটি ঐ তন্ত্রের পঞ্চ মকারসাধনার মতোই আপাতঅশ্লীল।

কিন্তু যখন জানি— উর্বশী অর্থে অগ্নিকে বোঝায়—সেই অগ্নিতে ঋঙ্‌মন্ত্রে প্রাতঃসবন, যজুর্মন্ত্রে মাধ্যন্দিনসবন ও সামমন্ত্রে সায়ংসবন করার পদ্ধতি প্রথম প্রয়োগ করেন পুরূরবা—তখন তো ঐ কাহিনীর সম্পূর্ণ অন্য তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়। ভাগবত মহাপুরাণ তো পুরূরবাকেই বেদের বিভাগকর্তা বলেন। পুরূরবা বলতে বোঝায় উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণকারী যাজ্ঞিককে। তিনি দিনে তিনবার সবন করার ফলে লাভ করলেন—পুত্র আয়ুকে। অর্থাৎ সেই যজ্ঞই তো ছিল অন্নপ্রস্তুতের ক্রিয়া। আর সেই অন্নগ্রহণ করেই তো মানুষ মাত্রেই লাভ করে আয়ু বা জীবনীশক্তি। তখনকার দিনে স্বপাক আহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাই ছিল বিধি। সেই অতি সহজ সত্যটিকে কি ভাবে ঋষিরা ঐ কাহিনীর মধ্যে অন্যরূপে বর্ণনা করেছেন জেনে তো কেবলি মনে হয়, তান্ত্রিকাচার্যরাও ঠিক ওইভাবে রূপকের আবরণে, কাব্যের মাধুর্যে মুড়ে রেখেছেন তাঁদের সাধনতত্ত্ব।

এইভাবে সাধারণ মানুষকে আপাতরম্যতা ধরে দেয়া হয়েছে যুগে যুগে পুরাণাদির মধ্যে, ধর্ম সম্বন্ধে তাকে আগ্রহান্বিত করে তুলতে। কিন্তু কালবশে তার মূলতত্ত্ব আমরা হারিয়ে ফেলেছি—পৌরাণিক উপাখ্যান তাই আমাদের কাছে রূপকথার মতই অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিতজনেরা কেবল যে প্রাচীনকালেই ঐ ব্যবস্থা করতেন সর্বসাধারণের জন্যে তাই নয়—আমাদের বাংলাদেশে তো চৈতন্যদেবের পরবর্তী কালেও একটি অমনি ছড়া প্রচলিত হয়েছিল—যা শুনলে মনে হয় যে, বৈষ্ণবধর্ম বুঝি ভোগবাদের ভিত্তিতে স্থাপিত। ছড়াটি এই—

বোল হরি বোল।
মাগুর মাছের ঝোল॥
যুবতী মেয়ের কোল॥

শুনলেই তো মনে হয় যে, হরিবোল বললেই দিব্যি পেয়ে যাব মাছের ঝোল ভাত, আর সেই সঙ্গে যুবতী মেয়ের সঙ্গ। কিন্তু আসলে তো মোটেই তা নয়। মাগুর মাছের ঝোলের অর্থ হচ্ছে—আমার গুরু যে মন্ত্র দিয়েছেন তা জপ করতে করতে যখন পরম নিষ্ঠায় চোখের জলে বুক ভেসে যাবে—সেই হবে মাগুর মাছের ঝোল। আর যুবতী মেয়ে তো এই পৃথিবী, সেই মন্ত্র জপ করতে করতে যখন লুটিয়ে পড়বো তার কোলে, তখনই সার্থক হবে হরিবোল বলা।

সব ধর্মই তো কেবলি বলে স্বার্থত্যাগের কথা ; সবায়ের সঙ্গে আত্মীয়তার কথা। সে যে বড় কষ্টের, বড় পরিশ্রমের। তাই কি সাধারণকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে অমন সব মোহন শাস্ত্র-বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে? বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে অনেকে বলেন তিনি নাকি মোহনশাস্ত্র প্রচার করেছিলেন সাধারণের মধ্যে! কিন্তু আমরা তো এতোক্ষণ সেই মোহনশাস্ত্রেরি গূঢ় রহস্যভেদ করার চেষ্টা করছি। যা খুঁজে পাচ্ছি তার থেকে, তা তো অত্যন্ত আদরনীয় বলেই মনে হচ্ছে।

॥ অভিচার-ক্রিয়া ॥

এবার একটু অভিচার-ক্রিয়ার রহস্যভেদ করার চেষ্টা করা যাক। সকলেই জানেন যে তন্ত্রশাস্ত্রে মারণ, উচ্চাটন, মোহন, স্তম্ভন ও বশীকরণ নামে পাঁচটি অভিচার ক্রিয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লেখ আছে। আর সেই কারণে তান্ত্রিক সাধকের নামে সবাই ভয়ও পান যতো পাছে সেই সাধকরা তাঁদের ওপরেই ওই ক্রিয়ার প্রয়োগ করেন—আবার নিজের নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তাঁদের কাছে ছুটেও যান ততো সাহায্যলাভের আশায়। কিন্তু দিব্যভাবের সাধনায় যিনি চলেছেন, তিনি কি ঐ সব নিকৃষ্ট প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করতে পারেন? মনে পড়ে রামকৃষ্ণদেব একবার স্বামীজীকে অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে বলেছিলেন যে—'অষ্টসিদ্ধির বলে ঈশ্বরলাভ হয় না।' স্বামীজী তাই প্রত্যাখ্যান করেন অষ্টসিদ্ধি। কিন্তু মজা এই যে—সত্যই যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেন, তাঁদের পক্ষে কিছুই আর অপ্রাপ্ত থাকে না। সন্ত তুলসীদাস বলেছেন—'অষ্টসিদ্ধি তো রামের দাসী।' যিনি প্রভুর খবর পেয়ে গিয়েছেন, তিনি কি আর তাঁর দাসদাসীর দিকে দৃষ্টি দেন? তবে প্রভুর পার্শ্বদ জেনে তারাও তখন সেবা করে তাঁর। ওই স্বামীজীর জীবনেই তো দেখা যায় তার উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু অভিচারের কথাই বলি।

॥ মারণ ॥

অভিচার শব্দের অর্থ হচ্ছে—অভি=সম্মুখ+চার=চলা। অর্থাৎ সামনে এগিয়ে চলা। সামনে কে আছে? সামনে আছেন ঈশ্বর বিশ্বরূপে মূর্তিমন্ত হয়ে। তাঁর কাছে যেতে হলে প্রথম তো আমাকেই অর্থাৎ অহং-বোধকেই মারতে হবে। আমার এক বন্ধু প্রায়ই বলেন—

আমি মার।
মা আমার॥

'আমি' তো আছে আমার পথ আটকে। তাকে ঐ মারণ-অভিচারে যদি বধ করতে বা বাধ্য করতে না পারি, তবে আর কি করে যাব ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে?

সন্ত কবীর দাসের সাধন অঙ্গের একটির নাম—'জীওন মৃতক কৌ অঙ্গ্' অর্থাৎ জীবন্মৃত থাকার সাধনা। সেই অঙ্গের একটি সব্দ্ এই—

কবীর মন্ মৃতক্ ভয়া
দুরবল্ ভয়া সরীর।
তব্ পৈঁড়ে লাগা হরি ফিরৈ
কহত—কবীর কবীর॥

—হে কবীর, তোমার মন বা অহং যখন মরবে, তোমার শরীর দুর্বল হবে, তখন সেই হরি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবেন, তোমায় সদাই ডাকবেন—কবীর কবীর—বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যসাধনায় নিজেকে মেরেই সার্থক হয় মারণ-অভিচার। এটি অন্নময় কোষের ক্রিয়া।

॥ উচ্চাটন ॥

উচ্চাটন শব্দের অর্থ উচ্চে অটন বা বিচরণ করার শক্তি। নিজেকে যিনি ভুলতে পেরেছেন, মোহ যাঁর কেটেছে, তিনিই তো পারেন যত্র তত্র গমন করতে। তিনি তখন বহূদক হয়ে ওঠেন। এই উচ্চাটন-অভিচার হচ্ছে প্রাণময় কোষের ক্রিয়া।

॥ মোহন ॥

তখনি তো সর্বত্র সেই ভুবনেশ্বর বা ভুবনেশ্বরীর রূপ দেখে সাধক মোহিত হবেন। এটি মনোময় কোষের ক্রিয়া। ভারি মজার কথা যে—মোহন শব্দটি কেবল মন শব্দটির সঙ্গেই যুক্ত হয় ব্যাকরণে—দেহমোহন বা প্রাণমোহন বলে কোন শব্দ পাই না অভিধানে, পাই মনোমোহন ; আর পাই ভুবনমোহন। ভুবন তো মনেরই বিস্তার।

॥ স্তম্ভন ॥

এর পরের অবস্থাই হচ্ছে স্তম্ভন। বহূদক তখন কুটিচক হয়ে ওঠেন। বিশ্বের মধ্যে নিজের স্থানটি বুঝে নিয়ে সাধক স্তম্ভের মতো বসে থাকেন। মনে পড়ে সন্ত তুলসীদাসের দোহা—

সবসে হিলিয়ে সবসে মিলিয়ে
লিজিয়ে সবকা নাম।
হাঁজী হাঁজী করতে রহিয়ে
বসে আপনা ঠাম॥

—এই তো স্তম্ভন। এটি বিজ্ঞানময় কোষের ক্রিয়া।

॥ বশীকরণ ॥

সর্বশেষ অভিচার-ক্রিয়া হচ্ছে বশীকরণ। যতোক্ষণ নিজেকে বিশ্বের বশে এবং বিশ্বকে নিজের বশে না পাচ্ছেন সাধক, ততোক্ষণ তো তাঁর আনন্দ অব্যাহত হতে পারে না। তাকেই রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'রসে বশে থাক। সেই তো আনন্দময় কোষের ক্রিয়া—পরাগতি, পরামুক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু যত্ন করে মিলিয়ে নিলে দেখা যায়, তান্ত্রিকের পঞ্চ মকার-সাধন, বৈষ্ণবের, পঞ্চতত্ত্বসাধন আর এই অভিচারের পঞ্চ ক্রিয়া চলেছে একই লক্ষ্যের দিকে। সেই উত্তরণের পথে তো কারো সঙ্গে কারো ভেদ নেই। তাই তো রামকৃষ্ণদেব বলেছেন —'যত মত, তত পথ কিন্তু পৌঁছেছে সবই সেই এক ঠিকানায়।'

॥ তান্ত্রিক বীজমন্ত্র ॥

তান্ত্রিক সাধকরা যে বীজমন্ত্র ব্যবহার করেন—তার সম্বন্ধে ধারণা তো কারোর বিশেষ কিছু স্পষ্ট নয়। অথচ বিভিন্ন মন্ত্রকোষেই তার উল্লেখ পাই। কোন কোন পুরাণের মধ্যেও আছে বীজমন্ত্রের সন্নিবেশ। অনেকেই কিন্তু বলেন যে, ওই বীজমন্ত্রগুলির মধ্যে অগাধ শক্তি নিহিত আছে। সেই বীজগুলি প্রায়শই একাক্ষরী বিসর্গ, অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দু যোগে উচ্চারিত হয়। এর সম্বন্ধে চিন্তা করলে ভারি অদ্ভুত খবর পাওয়া যায়।

এই বীজ যার ইংরাজী প্রতিশব্দ 'ফরমুলা', তার ব্যবহার আজো করেন ইওরোপের রসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরা। তাঁরা জলকে প্রকাশ করেন—এইচ্-টু-ও—দিয়ে। পটাসিয়াম সায়েনাইডকে প্রকাশ করেন—কে-এন্-ও-থ্রি—দিয়ে।

আধুনিককালে অনেকেরই ধারণা যে, এইভাবে বীজ বা সাংকেতিক ব্যবহারের রীতি এসেছে মূলত ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে থেকে। কিন্তু তা যে সত্য নয় তার প্রমাণ আছে।

শ্রদ্ধেয় আচার্য স্বর্গত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় অপূর্ব তথ্য প্রকাশ করেছেন হিন্দুদের রসায়নচর্চা সম্বন্ধে। এখন আর আমাদের অজ্ঞাত নয় যে, ভারতের প্রাচীন অধিবাসীরা রসায়ন-শাস্ত্রের প্রয়োগে কতদূর পারদর্শী হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে থেকেই সে বিদ্যা লাভ করেন প্রাচীন আরবের অধিবাসীরা—তাঁরাই তার নামকরণ করেন—অল্‌কিমিয়া। ইওরোপবাসীরা আরবের কাছে সেই বিদ্যা শিখে নাম দেন—'অ্যালকেমী'। সেই অ্যালকেমী হচ্ছে ইওরোপের বর্তমান কেমিষ্ট্রী-র জনক।

তখনকার দিনে ইওরোপে যাঁরা অ্যালকেমীর চর্চা করতেন—তাঁদের ওপর প্রবল পীড়ন জাগতো চার্চ বা ধর্মগুরুদের কাছে থেকে, বা ক্ষেত্রবিশেষে রাজার কাছে থেকেও। মূলকথা ছিল এই যে, অ্যালকেমিষ্টরা বলতেন যে, তাঁরা খুঁজে বের করবেন 'ফিলজফার্স ষ্টোন', যা দিয়ে অবর ধাতুকে সোনা করে দেয়া যায় আর বের করবেন 'এলিক্সার অব লাইফ', যা মানুষকে অমর করবে। যা কেউ মানতেই চাইতো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁদের মধ্যে আবার রজার বেকন তো আরো ভয়ানক কথা বলেছিলেন যে, তিনি এমন আবিষ্কার করবেন যার সাহায্যে মানুষ যে কোন জন্তুর চেয়ে জোরে মাটিতে চলতে পারবে, হাঁসের চেয়ে জোরে জলে সাঁতার দেবে এবং পাখীর চেয়ে জোরে আকাশে উড়ে বেড়াবে। ফলে তাঁকে চোদ্দ বছর কারাগারে থাকতে হয়েছিল, কারণ ইওরোপের ধর্মশাস্ত্রে এমন কথা লেখা ছিল না। অথচ সেইকালে তিনি যা বলেছিলেন রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার উন্নতির ফলে আজকে তো আমাদের সম্মুখে সেই যান্ত্রিক আবিষ্কার দেখা দিয়েছে। মাটিতে মোটর, ট্রেন প্রভৃতি, জলে জাহাজ প্রভৃতি এবং আকাশে এরোপ্লেন প্রভৃতি তো রজার বেকনের সেই স্বপ্নকে সার্থক করেছে। আর তাদের গতির বেগ তো দিনে দিনে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেদিনের ধর্মজ্ঞজন রজার বেকনকে সহ্য করতে পারেন নি। বৈজ্ঞানিকরা তো সে যুগে বহু অত্যাচার সহ্য করেছেন গোঁড়া মানুষের হাতে। গ্যালিলিওকেও তো তারা ঢিল ছুঁড়ে মারতো।

॥ তান্ত্রিকরা কি বৈজ্ঞানিক ॥

কিন্তু যা বলছিলাম, আমাদের দেশের লোকে বিশ্বাস করে যে, তান্ত্রিকরাও পারেন যে কোনো নীচ ধাতুকে সোনা করে দিতে আর জানেন মরাকে পুনর্জীবন দান করতে। তাঁরাই কি তবে আমাদের দেশের অ্যালকেমিষ্ট ছিলেন? অ্যালকেমিষ্টরাও যেমন গোপনে চর্চা করতেন তাঁদের বিদ্যা, তান্ত্রিকরাও তো ঠিক তেমনি গোপনে বিদ্যার চর্চা করতেন। বাস্তবিক পক্ষে যে কোন বিদ্যার চর্চা নিবিষ্ট মনে করতে হলেই প্রয়োজন গোপনতার, যতোদিন সাধক বা বিদ্বান্ সেই বিদ্যার সম্বন্ধে নবতর উপলব্ধি লাভ না করেন। এ সত্য তো আজকের দিনে যাঁরা আবিষ্কারক, তাঁরাও মেনে চলেন।

তন্ত্রের মধ্যে যে দেহতত্ত্ব বিধৃত রয়েছে, তার থেকে তো আমরা ভালো ভাবেই জানতে পারছি যে, তান্ত্রিকরা ছিলেন আসলে বৈজ্ঞানিক, তাঁরা অর্গানিক কেমিষ্ট্রীর চর্চা করতেন, তাঁদের নিজস্ব পথে। কিন্তু হায়! কালবশে আমাদের দেশের সেই বৈজ্ঞানিক চর্চা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাই আজ বিজ্ঞানচর্চার জন্যে আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় পাশ্চাত্য দেশের। অবাক হয়ে যাই আমরা পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক বিভূতি দেখে। অথচ আমাদের দেশের বিজ্ঞান কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ এখনো পাই। অথর্ববেদ ও আয়ুর্বেদের আলোচনা তো এ প্রবন্ধে নানাভাবে করেছি। আরো খবর পাচ্ছি যে, কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আর বরোদার পুঁথিশালায় আজো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু পুঁথি আছে, যার মধ্যে ভারতীয় রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার মূলমন্ত্র বা ফরমুলাগুলি পাওয়া যায়। তবে তার মধ্যে একটি সাংঘাতিক নিষেধবাক্যও আছে যে, সেই মন্ত্র যারা প্রয়োগ করবে তারা নির্বংশ হবে। এ কথা জানলেই কি মনে হয় না যে, ভারতে বৈজ্ঞানিক চর্চাকে কোণঠাসা করার কি প্রচণ্ড চেষ্টাই হয়েছিল! অনেকে মনে করেন যে, আচার্য শংকর যখন বৌদ্ধ কাপালিকদের উৎখাত করেন, তখন থেকেই তন্ত্রসাধনার তথা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চর্চার ধারা ব্যাহত হয়েছে। ইতিহাসে তো পাই কি তুমুল বিরোধ সেদিন বেধেছিল শৈবদের সঙ্গে বৌদ্ধদের। যাই হোক, সেই যুগের তান্ত্রিকাচার্যরাই যে, মন্ত্র ও বীজের প্রথম প্রয়োগ করেন, তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন বলেই তাঁদের নিজস্ব সাংকেতিক ও পরিভাষা ছিল, আর তাঁরাই তা উদ্ভাবন করেন। কিন্তু আজকে চর্চার অভাবে সে সব মন্ত্রের মর্মার্থ ও বীজের রহস্য একেবারেই ভুলে গিয়েছি আমরা। সে সবই হয়ে উঠেছে নির্জীব আমাদের কাছে। অথচ শোনা যায় জার্মানীতে সংগৃহীত হয়েছে আমাদের সেই সব প্রাচীন পুঁথি নানাস্থান থেকে, আর সে দেশের বৈজ্ঞানিকরা চর্চাও করছেন সেই সব মন্ত্র ও বীজ নিয়ে। কে জানে, সেই কারণেই জার্মানীর অধিবাসীরাই রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় সমধিক পারদর্শী হয়ে ঐ দু'টি বিষয়ে সব থেকে বেশী 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেছেন কিনা?

আমরা কি পারব না ওই সব বীজের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করে শক্তির রুদ্ধ দ্বারকে আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করতে?

॥ তন্ত্রের স্থান ॥

অনেকের ধারণা যে, তন্ত্র হচ্ছে বেদ বহির্গত শাস্ত্র, কারণ পুরাণাদিতে বৈদিক ধর্ম ও তান্ত্রিক ধর্মের উল্লেখ ভিন্নভাবে করা হয়। কিন্তু তা যে সত্য নয়, তার কিছু আলোচনা আমরা করেছি আরো একটু করার চেষ্টা করি।

আমরা জানি, উচ্চতর তিন বর্ণের বৈদিক দীক্ষা বা সংস্কার হওয়ার পরেও, তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করার রীতি আছে। এর থেকেই কি প্রমাণ হয় না যে, বৈদিক মতের সঙ্গে তান্ত্রিক মতের কোনো বিরোধ নেই। কেউ কেউ তো মনে করেন যে, বৈদিক ধর্মই পরিণতি লাভ করেছে, তান্ত্রিক ধর্মের মধ্যে। কিন্তু আমরা তো যতোদূর জানতে পাই, তাতে বেশ মনে হয় যে, তন্ত্র যেন বেদের আবির্ভাবের পূর্বেও প্রচলিত ছিল—যদিও নাম হয়তো তখন তন্ত্র ছিল না। কিন্তু আচারানুষ্ঠানাদির দিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে সেই প্রাক্‌বৈদিক যুগেই তন্ত্র-সাধনার একটি বিশেষ ধারা বা পথ জেগেছিল। সেই পথ ছিল যোগসাধনার।

যোগসাধনার রীতি যে অতি প্রাচীন তার সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ দেখা যায় না। আজকে তো জাপান, রাশিয়া, ইওরোপ ও আমেরিকার বহুস্থানে এই যোগবিদ্যার চর্চা চলেছে, বহু শিক্ষাগারও স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তন্ত্রের যে মূলক্ষেত্র বাংলা যেখানে যোগী কপিল, যোগী মহাবীর, যোগী বুদ্ধ এককালে তপস্যা করে গণশক্তিকে উদ্বোধিত করেছিলেন, সেখানে যোগ বা তন্ত্র নিয়ে সম্যক চর্চা হচ্ছে কই? অবশ্য কয়েকটি আশ্রমাদি আছে বাংলায়, কিন্তু সেখানে সাধারণের অবাধ প্রবেশ নেই। আশ্রমবাসীরা যেন যোগ তথা তন্ত্রের পথকে সংসারীদের কাছে থেকে গোপন করে রাখতেই চান। কিন্তু যোগ তথা তন্ত্রের পথকে যিনি নিশ্চয় করে বুঝেছেন, তিনি কি তার প্রসারের পন্থা অবরুদ্ধ করে পুঁজিবাদী আত্মসর্বস্ব হয়ে উঠতে পারেন?

কৌলিক যিনি বা কুলপতি যিনি তাঁর স্বভাবই তো হচ্ছে চক্র বা সমাজ সৃষ্টি করা। তার প্রমাণ দেখি আজ পর্যন্ত জগতে যতো মহাযোগী, মহামানব জন্মেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্রাদি থেকে শুরু করে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বুদ্ধদেব, মহাবীর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ কিংবা কংফুসিয়াস, লাওৎসু, সক্রেটিস, মুসা, যিশু, জরথুস্ত্র, মহম্মদ প্রভৃতি সবাই তো ধর্ম বা সমাজ স্থাপনেরই চেষ্টা করেছেন—প্রত্যেকে যাতে প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ লাভ করে। সেই ধর্মই তো ধরে রাখে সবাইকে অথবা যা ধরে থাকি আমরা সবাই। সেই ধর্মের যে মধ্যে মধ্যে গ্লানি জাগে তার উল্লেখও আমরা গীতায় পাই। তাই ধর্মকে পুনরায় যথার্থ রূপদান করতে স্বয়ং ঈশ্বরই ব্যবস্থা করেন। মনে পড়ে শ্রীভগবানের বাণী—

ধর্মসংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে॥ —৪।৮

আজ কি সেই দিন আমাদের সামনে উপস্থিত হয় নি? সবাই কি আজ মনে প্রাণে চাইছি না নূতন সমাজআদর্শ?

॥ গণপূজা ॥

আরও একটি কথার উল্লেখ করতেই হয়। তন্ত্রমতে যে কোনো দেবদেবীর পূজার প্রথমেই পূজা করতে হয় গণপতিকে। গণপতি তো গণশক্তির প্রতীক। আবার আদ্যাশক্তির পূজাকালেও তাঁর সঙ্গে পূজিত হন অষ্টনায়িকা, ষোড়শ মাতৃকা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৌষট্টি যোগিনী বা কোটি যোগিনী। এর থেকে কি বেশ বোঝা যায় না যে, মানুষের সভ্যতা ও সমাজ মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণশক্তির ওপরেই নির্ভর করে, তাই সে শক্তির পূজা না করে উপায় নেই। সেই ঐক্য ও সংযোগ রক্ষা করেন বলেই কি চণ্ডী সপ্তশতীতে দেবীকে 'সংসারস্থিতিকারিণী বৈষ্ণবী শক্তি' বলা হয় নি ?

বাস্তবিক, আমাদের পরস্পরের যোগাযোগ যাতে বৃদ্ধি পায়—প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর প্রতিবেশী, তাঁর প্রদেশবাসী, তাঁর দেশবাসী থেকে শুরু করে—তাবৎ পৃথিবীর সবায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদির সঙ্গেও সংযুক্ত হতে পারেন —সেই তো সত্যিকারের শক্তির মূল সাধনা। তন্ত্র সেই পরম পন্থাটিই উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন আমাদের সবায়ের সম্মুখে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! সেই পরমতত্ত্ব ওই মৃৎ-প্রতিমার প্রতীকে আরোপিত হয়ে একেবারেই মাটি হয়ে গেল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ঐ প্রতীকপূজার কাদাজল ঘেঁটে আর দেখতেই চান না, প্রতীকপূজা পূজককে কোন ঠিকানায় পৌঁছে দিতে চায়।

॥ প্রতীক পূজায় বিসর্জন ॥

ঐ প্রতীককে যে তান্ত্রিক সাধকরা সর্বস্ব বলে মনে করেন না, তার নিদর্শনও আমরা পাই। যে কোন মৃন্ময়মূর্তি পূজার শেষে যে বিসর্জন দেয়া হয়—সেইটিই তো অতি উত্তম নিদর্শন। কতো আয়োজন, কতো সমারোহ করে সেই মৃৎপ্রতীকে করা হলো প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চক্ষুর্দান প্রভৃতি সাড়ম্বর অনুষ্ঠান—পূজক স্বয়ং যে সমস্ত ভোগরাগশয্যা-বিলাসাদির প্রতি আকৃষ্ট, তা সমস্তই নিবেদন করা হলো প্রতিমাকে—কতো প্রাণপাত পরিশ্রম, অজস্র অর্থব্যয়ই না ঘটে সেই খাতে। অথচ পূজার শেষে কিনা অত আনন্দের কারণস্বরূপ প্রতিমাটিকে একেবারে জলে টেনে ফেলে দেয়া হয়, ঠিক যে ভাবে সৎকার করা হয় মৃত মানুষের—কেন এ প্রথা ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আবার একবার পূজাপদ্ধতির গোড়ার কথায় ফিরে যেতে হয়। আমরা জেনেছি—পূজার প্রথমে যে স্থূল ধ্যানটির বিনিয়োগ আছে—তার মূল উদ্দেশ্য আমাদের অন্তরস্থিত শক্তি বা অভীষ্টকেই সম্মুখস্থ প্রতিমায় আরোপ করা। ক্রমে সেই সম্মুখস্থ প্রতীককে সর্বতোভাবে সম্পন্ন করে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবাদির সঙ্গে একত্রিত হয়ে কায়মনোবাক্যে পূজাপর্ব উপভোগ করে, সবায়ের সঙ্গে যুক্ত হবার বাসনাকে আরো পূর্ণরূপে সফল করে নেয়া হলো। সেই তো সংকল্পসিদ্ধি। যেমনি সেই সংকল্প সিদ্ধ হয়ে গেল—প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল প্রতীকের। তখন তাকে চোখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আড়াল করে মনের ভাবকে আবার ফিরিয়ে পেলাম মনে। শুরু হলো বিজয়ার উৎসব, সবায়ের সঙ্গে হৃদয় মিলিয়ে আলিঙ্গনাদি করে। আবার ঐ বিজয়া শব্দের আর এক অর্থও তো সিদ্ধি।

বিসর্জন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও হচ্ছে—বিশেষরূপে সৃজন। রূপের পূজো শেষ করে, যখন ভাবের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলো, বাহিরের সঙ্গে যোগস্থাপিত হলো অন্তরের, তখন কি পূজকের বিশ্বভুবন বিশেষভাবে সৃজিত হয়ে উঠলো না ?

বাহিরের সঙ্গে অন্তরের কতোখানি যোগ ঘটানো সম্ভব, বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে ব্যক্তি-চৈতন্যের কতোখানি সামঞ্জস্য জাগানো যায় মনস্তত্ত্বের প্রসার বৃদ্ধির ফলে, তারই পূর্ণতম প্রকাশ দেখি দেবী দুর্গার রূপকল্পনা ও পূজাপদ্ধতির মধ্যে। তন্ত্রসাধনার কি নিবিড় সমগ্রতাই না বিধৃত হয়ে আছে দুর্গাপূজা মহোৎসবে, পরের পর্বেই আমরা তা জানতে পাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম পর্ব

॥ দেবী দুর্গা ॥

॥ দুর্গা শব্দের উৎপত্তি ॥

দুর্গাপূজা যে তন্ত্রচর্চার সর্বশেষ অবদান আর তা এই বাংলাদেশেরই কৃষ্টি, তার সম্বন্ধে পণ্ডিতজনেদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এখন দেখা যাক দুর্গা, শব্দটির উৎপত্তি কি ভাবে দেখা দিল—আর কি বা তার অর্থ ছিল।

বৈদিক মন্ত্রে বহু স্থানেই 'দুর্গ' এই শব্দের উল্লেখ আছে। তার একটি মন্ত্র তো দ্বিজগণের আহ্নিককৃত্যের অংশ। তাতে পাই—

স নঃ পর্যদতি দুর্গাণি বিশ্বাঃ॥

—সেই তিনি (অগ্নি) আমাদের পার করে দেন সমস্ত আপদ থেকে। এখানে দুর্গ শব্দের অর্থ পাচ্ছি—আপদ। দুর্গা শব্দকে যদি দুর্গ শব্দেরই স্ত্রীলিংগ-বাচক শব্দ বলে মেনে নেওয়া যায়—তা হলে কিন্তু দুর্গাদেবীকে যে বিপত্তারিণী মহাশক্তি রূপে আমরা চিন্তা করি—তার যেন কিছু আভাস পাই। সেই দেবী উদ্ধার করেন আমাদের আপদ থেকে। বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে যে দুর্গাষ্টক বা দুর্গাস্তবরাজ আছে—তাতেও দেখি—

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে
হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতুর্
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

—সেই দুর্গা যিনি জগত্তারিণী তাঁকে প্রণাম করি—তিনিই একমাত্র গতি ও নিস্তারহেতু অরণ্যে, রণে, দারুণ শত্রু মধ্যে, অনলে, সাগরে বা প্রান্তরে যত বিপদেই পড়ি না কেন।

তবে 'দুর্গা' এই শব্দটি পাই তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। সেখানে তার আরো একটি অন্যরূপও আছে 'দুর্গি'। দেবীর একটি গায়ত্রী মন্ত্রেও দেখি—

তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাই হোক, ঐ তৈত্তিরীয় আরণ্যক হচ্ছে কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত। বেদজ্ঞজনেরা জানেন কৃষ্ণযজুর্বেদের সঙ্গে অথর্ববেদের কতখানি মিল আছে। আবার এ কথাও তো পুরাণ-প্রসিদ্ধ যে – বেদবিভাগ হবার আগের যুগে সমগ্র চতুর্বেদেরই একত্রে 'যজুর্বেদ' আখ্যা ছিল। অবশ্য আচার্য্য সায়ন বেদভাষ্য ভূমিকায় প্রমাণ করেছেন নানাভাবে কেন অথর্ববেদই সর্ব প্রাচীন—কিন্তু সে আবার অন্য কথা।

উপস্থিত ঐ যজুর্বেদের কথাই বলি। আমরা জানি—যজুর্বেদের উপবেদ হচ্ছে ধনুর্বেদ। অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল যজুর্বেদের। তাই সেই বেদের অন্তর্গত আরণ্যকে 'দুর্গা' নামটি পেলে স্বভাবতই কি মনে হয় না যে, তিনি যুদ্ধবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী?

দুর্গা বা শক্তির সম্বন্ধে তো ওই চণ্ডী সপ্তশতী থেকে জানতে পারি যে, তিনি বাস্তবিকই যুদ্ধের দেবী। যুদ্ধ বাধে কখন? যখনি একটি দেশ বা জাতির প্রসারে বাধা দেয় অন্য দেশ বা জাতি, তখনি সূচনা হয় যুদ্ধের—আর শত্রুপক্ষকে তো সকলেই দস্যু, দানব, রাক্ষস ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। ঠিক সেই সত্যই তো প্রকটিত হয়েছে দেবীবাক্যে – যখন তিনি বলছেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা
দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং
করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

—১১।৫৪, ৫৫

—এইভাবে যখনি যখনি দানবের অভ্যুত্থান দেখা দেবে, বাধার সৃষ্টি হবে—তখনি তখনি আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রুক্ষয় করবো।

এ প্রমাণও তো পাই যে—ঐ দেবী কি ভাবে নানা জনকে বাধার থেকে রক্ষা করেছেন। প্রথম তো ব্রহ্মা উদ্ধার পেলেন মধুকেটভের হাত থেকে ঐ দেবীকে স্তব করে। শিবও ত্রিপুরাসুরকে বধ করার শক্তি পান ঐ দেবীকে পূজা করে। দেবরাজ ইন্দ্র যখন দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মী হারালেন, তখন ঐ দেবীর পূজো করে স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। রাজা সুরথও মেধস্ মুনির উপদেশে ঐ দেবীর পূজো করে হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন—শেষে জন্মান্তরে সাবর্ণি মনু রূপে সমস্ত ভুবনের আধিপত্যও লাভ করবেন। আর রামচন্দ্রও ঐ দেবীর পূজা করে রাবণবধ করেন, সীতা—উদ্ধারের জন্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভারতে দেখি—কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত সৈন্যগণের মধ্যে অর্জুনকে দুর্গাস্তোত্র পাঠ করাচ্ছেন বিজয়লাভের উদ্দেশ্যে, গীতার উপদেশ দেবার আগেই।

সব দিক থেকেই তো তাই এই ধারণার স্বপক্ষে নানা সূত্র পাই যে—দেবী দুর্গা সত্যিই যুদ্ধজয়ের দেবী।

আবার একদিক থেকে দেখি—দুর্গ রচনা করার যে কতখানি প্রয়োজন যুদ্ধজয় করতে গেলে—তার সম্বন্ধে সমধিক অবহিত ছিলেন প্রাচীনকালের সবাই—অগ্নিপুরাণই তার সাক্ষ্য। অগ্নিপুরাণেই দেখি—আট প্রকার দুর্গ নির্মাণের কথা ; যথা—ধনুর্দুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ, বৃক্ষ বা বনদুর্গ, অম্বু বা নাদেয় দুর্গ, গিরিদুর্গ, শৈলদুর্গ ও সোদক্র দুর্গ। তাই মনে হয় দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই 'দুর্গা' নামে স্মরণ করা হতো। একথা এই পর্যন্ত যাক।

এখন বলি চণ্ডী সপ্তশতীতে একাদশ অধ্যায়ে দেবী স্বয়ং যা বলেছেন, তাঁর দুর্গা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে। সেখানে পাই—

শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং
তদা যাস্যাম্যহং ভুবি ॥
তত্রৈব চ বধিষ্যামি
দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং
তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥

—১১।৪৯, ৫০।

—যখন আমি শাকম্ভরী নামে পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করবো—তখন দুর্গম নামে এক ভীষণ অসুরকে বধ করবো আর সেই কারণেই আমার নাম হবে দুর্গা দেবী।

অথচ দুর্গা প্রতিমায় যে অসুরকে দেখা যায়—তার নাম তো মহিষাসুর। অবশ্য চণ্ডী সপ্তশতীতে এক মহিষাসুরের নাম পাই। দেবী তাকে বিনাশ করেন বটে, কিন্তু তখন তাঁকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হয় নি—তখন তাঁর নাম ছিল জয়া, চণ্ডিকা, অম্বিকা বা সাধারণভাবে দেবী। তবে কেন দুর্গা প্রতিমায় মহিষাসুরের স্থান হলো? তা হলে কি এই সত্য যে দেবী দুর্গার নামটিও যেমন স্বতন্ত্র কারণে উদ্ভূত, মহিষাসুরও তেমনি অন্য কিছুর প্রতীক রূপে দুর্গা প্রতিমায় অবস্থিত? এ দু'টি প্রশ্নের জবাব যথাকালে দেবার চেষ্টা করবো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শারদীয়া পূজায় রামচন্দ্রের সম্পর্ক ॥

এখন দেখা যাক শারদীয় পূজার সংগে রামচন্দ্রের নাম কেন যুক্ত হলো? আদি কবি বাল্মিকী তো তাঁর মূল রামায়ণে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নি। এ প্রবাদের মূল দেখি আমাদের বাংলার কবি কৃত্তিবাসের অপূর্ব উপাখ্যান, ঐ রামচন্দ্রের অকালবোধন। কিন্তু তিনি অকালবোধনের কাহিনী জানতে পেরেছিলেন পুরাণ থেকে, সে কথা পরে বলছি।

তার আগে বলি—ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে তো স্বভাবতই মনে হয় যে, রামচন্দ্র ছিলেন অযোধ্যার অধিবাসী শুধু নয়, মহারাজা। যদি তিনিই প্রবর্তন করে থাকেন অকালবোধনের বা দুর্গোৎসবের—তবে কেন অযোধ্যা অঞ্চলে সে উৎসবের প্রচলন নেই? বর্তমানে তো দেখা যায় বাংলাদেশের বাইরে আর কোথাও নেই শারদীয়া দুর্গাপূজা বা মৃণ্ময়ীমূর্তি রচনার প্রথা। তবে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে নবরাত্র পূজা হয় কিছু অন্যভাবে, ঐ দেবীপক্ষের প্রতিপদ থেকে নবমী তিথি পর্যন্ত। সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। আর উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই ঐ সময়ে দসেরা উৎসব পালিত হয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশে যে সময়ে দুর্গোৎসব হয়ে থাকে—সেই সময়েই রাম রাবণের যুদ্ধ ও ফলে রাবণ বধ ঘটেছিল। বলা বাহুল্য এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে, রাম দুর্গার পূজা করেই রাবণকে বধ করেছিলেন—শুধু এইটুকুই জানা যায় যে—শরৎকালেই রাম রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছিলেন।

কিন্তু যে সব পুরাণে দুর্গাপূজার মন্ত্র সন্নিবেশিত আছে, যেমন বৃহন্নন্দিকেশ্বর, দেবী ও কালিকা পুরাণ, তার থেকে জানা যায় যে—রাম রাবণবধের জন্য অকালবোধন করে দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন। ঐ তিনটি পুরাণেই অকালবোধনের যে মন্ত্র আছে, তার থেকে ওই প্রমাণ পাই। যদিও তিনটি পুরাণের মধ্যে যে তিনটি মন্ত্র আছে, তার পাঠ অভিন্ন নয়, কিন্তু মূলতঃ মন্ত্র তিনটির বক্তব্য একই। এখানে দেবী পুরাণের মন্ত্রটি উদ্ধার করছি—

রাবণস্য বধার্থায়
রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো
দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা ॥

—পুরাকালে রাবণের বধ ও রামের অনুগ্রহের জন্য ব্রহ্মা অকালে দেবীর বোধন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকাল বলতে পণ্ডিতজনেরা বোঝেন শয়ান-একাদশী অর্থাৎ জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার পরদিন থেকে উত্থান-একাদশীর পূর্বদিন অর্থাৎ জগদ্ধাত্রী পূজার পরদিন পর্যন্ত প্রায় চার মাসব্যাপী সময়—যে সময়ে বর্ষা ও শরৎ এই দুই ঋতুর আবির্ভাব হয়। আমাদের শাস্ত্রে ঐ চারমাস সময়কে দেবতাদের নিদ্রার সময় বলে গণ্য করা হয়। তাই শারদীয়া পূজায় অকালবোধন আবশ্যক, কিন্তু বাসন্তী পূজায় তার আবশ্যক নেই—কারণ বসন্তকালে দেবতারা জেগেই থাকেন।

যাই হোক, ঐ অকালবোধনের মন্ত্রটির অবশিষ্টটুকু উদ্ধার করি—

অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্
বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্।
শক্রেণাপি চ সংবোধ্য
প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি
বিভূতি-রাজ্য-প্রতিপত্তি-হেতোঃ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্
তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥

—আমিও সেইভাবে আশ্বিনমাসে সুরেশ্বরীর বোধন করছি। এইভাবে তাঁর বোধন করে ইন্দ্রও সুরলোকে রাজ্যলাভ করেন। তাই আমি তোমায় প্রতিবোধন করছি, কারণ আমি চাই ঐশ্বর্য্য, চাই রাজ্য, চাই প্রতিপত্তি। ঠিক যে ভাবে রাম রাবণকে বধ করেছিলেন, সেইভাবে আমিও বিনাশ করবো আমার শত্রুদের।

মন্ত্রটি থেকে বেশ কয়েকটি তথ্য পাচ্ছি—প্রথম অংশে পাচ্ছি ব্রহ্মা রামকে অকাল-বোধন করে দেবীপূজায় উদ্বুদ্ধ করেন আর দ্বিতীয় অংশে পাচ্ছি যে, ইন্দ্রও এইভাবে অকালবোধন করেছিলেন। সুরথ রাজার কোন উল্লেখ এ মন্ত্রে নেই—তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তিনি শরৎকালে নয়, বসন্তকালেই দেবীর পূজা করেছিলেন। তবে দেবীর পূজার মূল উদ্দেশ্য যে শত্রুনিপাত, তাও তো জানতে পাই মন্ত্রটির শেষাংশ থেকে।

॥ ব্রহ্ম কাকে বলে ॥

এখন দেখা যাক ঐ ব্রহ্মণ বা ব্রহ্মার প্রকৃত অর্থ কি? পুরাণে তো ব্রহ্মাকে লোক-পিতামহ বলা হয়েছে। তিনিই কি তবে রামকে অকালবোধনে উৎসাহ দেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ব্রহ্মণ শব্দের একটি অপূর্ব ব্যাখ্যা পাই পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এস, এ, ডাংগের লেখা 'ফ্রম প্রিমিটিব কম্যুনিজম্ টু স্লেভারি' বইখানিতে। বেদাদির নির্ঘণ্ট করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে—ব্রহ্মণ অর্থে বোঝায় সংহত শক্তি। প্রাচীনযুগে সেই সংহত শক্তিকে সর্বদা সঞ্জীবিত রাখার কি রীতি ছিল তাঁর বহু প্রমাণ সংগৃহিত করেছেন তিনি বইখানিতে। এখানে তার কিছু বিবরণ দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথম দেখা যায় দ্বিজমাত্রেই যে আহ্নিককৃত্যের মন্ত্র পাঠ করেন—তা যদিও ব্যক্তিগত কর্তব্য, কিন্তু তার মধ্যে সংহতি-ভাবনার উজ্জ্বল উদাহরণ জেগে রয়েছে। অন্য মন্ত্রাদির কথা রেখে আহ্নিকের যে মূল মন্ত্র গায়ত্রী—তাতে পাই—

ধিযো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥—যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণা দান করেন।

আবার উপনিষদের শান্তিপাঠ মন্ত্রেও পাই—ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ হে দেবগণ আমরা যেন কানে কেবল শুভকর বাক্য শুন্‌তে পাই। কিংবা আবার পাই—

শন্নো ন মিত্রঃ শং বরুণঃ ॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ মিত্র আমাদের সুখদায়ক হোন, সুখ-দায়ক হোন বরুণ। এ ছাড়া সাধারণ শান্তি-কর্মেও যে মন্ত্র পড়ি—স্বস্তি ন ইন্দ্রো ॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ ইন্দ্র আমাদেরকে স্বচ্ছন্দময় জীবন দান করুন।

এইভাবে প্রত্যেক মন্ত্রের মধ্যেই তো ব্যষ্টিকে সমষ্টির সাথে যুক্ত করে দেবার চিন্তা নিহিত রয়েছে। আর সেই সমষ্টিই তো ব্রহ্মণ বা ব্রহ্মা। পুরাণে লোকপিতামহ ব্রহ্মার কল্পনার মধ্যেও তো রয়েছে সেই ভাব উহ্য হয়ে। যিনি তাবৎসৃষ্টির জনক, তিনিই তো অংশরূপে বর্তমান রয়েছেন সমস্ত জড় ও জীবের অন্তরে। তাই তাঁকে স্মরণ করলে তো পরোক্ষভাবে স্মরণ করি আমরা বিশ্বসত্তার সবকিছুর সঙ্গে আত্মীয়তার কথা। সেই তো সংহত শক্তির মূল কথা।

সংহত শক্তি সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করা যাক। প্রথমেই তো মনে পড়ছে চণ্ডী সপ্তশতীর কথা, যে ভাবে দেবীর আবির্ভাব হলো—

অতুলং তত্র তত্তেজঃ
সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী
ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ —২।১৩।

—সব দেবতার শরীরের তেজ একত্রিত হয়ে একটি নারীরূপ দেখা দিল—যাঁর জ্যোতিতে তিন লোক পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের আরাধ্যা শক্তি সমস্ত দেবতার তেজোসম্ভূতা সংহত শক্তি। সেই কথাই কি ওই মন্ত্রে প্রকাশ পাচ্ছে না? বাস্তবিকপক্ষে যেখানে অনেক মানুষ একত্র হয়—সেখানে অপূর্ব একটি আগন্তুক শক্তির সঞ্চার হয়। এ সত্য আমাদের দেশের সবাই বহুকাল থেকেই জানেন। তাই তো পুরাণে পাই—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে
যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি
তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

—হে নারদ, আমি আকাশের পারে বৈকুণ্ঠলোকেও থাকি না, বা কোন যোগীর হৃদয়ের মধ্যেও থাকি না, আমি থাকি সেখানে, যেখানে আমার ভক্তেরা একত্রভাবে গান করে।

এই একত্রভাবে গান করা, যার অন্য নাম সংকীর্ত্তন তার কি শক্তি তা, বুঝেছিলেন চৈতন্যদেব। তিনিই তো আমাদের বাংলায় সংকীর্তনবিধি প্রচার করেন। মনে পড়ে সেই সঙ্গে বেদগানের কথা, যা সর্বদাই বহুজনে মিলিত কণ্ঠে গাইতে হতো—তখন কোথায় ছিল ইওরোপের 'কোরাস' গান।

সংকীর্তনস্থানে যে হরি বা ব্রহ্মের আবির্ভাব হয়, এ কথা জানতেন বলেই আমাদের দেশের মানুষ সংকীর্তন-সভায় ধূলোট করতেন অর্থাৎ সেখানকার ধূলোয় গড়াগড়ি দিতেন—যদিও সেখানে বিভিন্ন অন্ত্যজ ব্যক্তিরও পদরজঃ পড়তো। তীর্থস্থান বা দেবক্ষেত্রর মাহাত্ম্যও ঐখানে যে, সেই সব স্থানে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। ব্যষ্টি যেখানে সমষ্টিতে মিশতে পায়, সেখানেই তো জাগে সংহত শক্তির পরম প্রকাশ।

অতি সাধারণ ক্ষেত্রেও তো দেখি - যখন অনেক মানুষ একত্রে কোন কাজ করে, তখন তারা প্রত্যেকে ঠিক ব্যক্তিগত বলবীর্যানুযায়ী চালিত হয় না, চালিত হয় সংহত দল বা গোষ্ঠির সমবেত বলবীর্যানুযায়ী। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যায় যে কোনো একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে, যে কোনো কর্মক্ষেত্রে একত্রিত কর্মীদের মধ্যে, যুদ্ধকালীন সৈন্যসমাবেশ বা অন্য কোনো আন্দোলনে একত্রিত স্বেচ্ছাসৈনিকদের মধ্যে। একক যখন দেখে যে, তার সহায়রূপে রয়েছে অনেকজন প্রত্যক্ষভাবে, তখন তার দেহ-প্রাণ-মনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার ঘটে, সেই সমষ্টিগত সত্তার আবেশে যে কোন ব্যষ্টি স্বাভাবিক সাহস, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের চেয়ে ঢের বেশীগুণ সামর্থ্য দেখায়। সেই সমষ্টিগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তাকেই প্রাচীনকালে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হতো—যার প্রেরণা দেবার শক্তি সত্যই অসীম।

॥ সংখ্যা বৃদ্ধিতেই গুণ বৃদ্ধি ॥

এখানে রসায়ণশাস্ত্রে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তার কথাও বলে নিই। বর্তমানে ইওরোপের রসায়ণবেত্তারা এই সত্যে উপস্থিত হয়েছেন যে, মৌলিক পরমানুর সংখ্যা যত বাড়ে, রাসায়নিক পদার্থের গুণও তত বৃদ্ধি ও পরিবর্তন লাভ করে। এ বড় বিচিত্র কথা—সংখ্যাই বদলে দেয় গুণকে। এর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন স্বনামধন্য এঙ্গেলস, তাঁর রচিত 'অ্যান্টি ডুরিন'—পুস্তকে।

কেমন করে তা সম্ভব হয় মানুষের মধ্যে তার কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণও দিই। কোন ছেলে বা মেয়ে স্বভাবত দুর্বল কি ভীরু হলেও, যখন সে সমবয়সীদের দলে ভিড়ে কাজ করে, তখন আর তার স্বভাবগত দুর্বলতা কি ভীরুতার চিহ্নমাত্র থাকে না, বরং দলের প্রেরণায় সে তখন এমন অসমসাহসের কাজ নিষ্পন্ন করে, যা সেই দলের সব থেকে সাহসীর দ্বারাও সম্পন্ন হয় না। আবার দেখা যায়, শ্রমিক দল যখন কোন অতিভার বস্তুকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যায়, তখন তারা নায়কের হাঁক শুনে একত্রে হাঁক দিয়ে নিজ নিজ স্বাভাবিক শক্তির কত বেশীগুণ সামর্থ্য প্রকাশ করে। তখন মনে হয় যেন তাদের সবায়ের সত্তা একটি বৃহৎ ঘনীভূত সত্তায় মিশে গিয়েছে, আর তাদের কাজও এগিয়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে।

আবার একবার প্রাচীনকালের যজ্ঞ-প্রথার কথা বলতে হচ্ছে। তখনকার দিনে যজ্ঞের যিনি প্রধান, পরিদর্শক-ঋত্বিক্ থাকতেন, তার নাম হতো ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মাই লক্ষ করতেন হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা নামের অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণ তাঁদের কাজ যথাযথ নিষ্পন্ন করছেন কিনা—কোনো ত্রুটি দেখলে ব্রহ্মাই মৌনভাবে যজ্ঞের সেই ত্রুটিটুকু সেরে নেবার ব্যবস্থা করতেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাই যজ্ঞের মাধ্যমে সংহত শক্তিকে প্রকটিত করে তুলতেন। সুতরাং বেশ বলা যায় যে, শ্রীযুক্ত ডাংগে ব্রহ্ম শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন - তা অতি যুক্তিযুক্ত। যুক্তি ছাড়া আর কিসের বলেই বা আমরা পারি কোনো সত্য নির্ণয় করতে? তাই দেখি রুদ্রযামলে—

যুক্তিমূলং মহাভাবং
যুক্তিমূলং হি সাধনং।
যুক্তিক্রমেণ কালেন
সিদ্ধো ভবতি সাধকঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—মহাভাব বা ব্রহ্মভাবের মূলই হচ্ছে যুক্তি, সমস্ত সাধনার মুলও সেই যুক্তি। সেই যুক্তির ক্রম ধরেই সাধক যথাকালে সিদ্ধি লাভ করেন।

সন্ত কবীরদাসও বলেছেন—যুগতি বিন্ পিণ্ড কাঁচা॥ অর্থাৎ যুক্তি ছাড়া এই দেহপিণ্ড পক্বতা লাভ করে না।

আবার আর এক দিক থেকে যুক্তির অর্থ হচ্ছে যোগ। যদি সবায়ের সঙ্গে সবায়ের যোগই না ঘটে, তবে আর আমাদের জীবনে কোন্ কাজ সিদ্ধ হবে? কোনো কাজই তো কোনো মানুষ একাকী সম্পন্ন করতে পারে না।

এখন তাহলে অকালবোধনের মন্ত্রে যে, ব্রহ্মণ বা ব্রহ্মা শব্দের উল্লেখ পাচ্ছি তার অর্থ যে গণশক্তি বা সংহত শক্তি, তা আর অস্বীকার করি কি করে? যুদ্ধে তো আরো বিশেষ করে প্রয়োজন সেই সংহত শক্তির। বর্তমান যুগ যাকে জনতা বা 'মব্' আখ্যা দেয়, কে না জানে সেই 'মব্' কি প্রচণ্ড শক্তিমান!

॥ অকাল কাকে বলে ॥

যুদ্ধের জন্যই তো অকালবোধনের উদ্যোগ করেছিলেন রাম। পণ্ডিতরা তো বলেন অকাল হচ্ছে বর্ষাশরতের চারটি মাস—সে কাল কি যুদ্ধের পক্ষে অকাল? দেখি—এ প্রশ্নের কি উত্তর পাই শাস্ত্রাদি থেকে?

সংস্কৃতকাব্যের যুগে তো দেখি, শরৎকালেই রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বেরোতেন। অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রার প্রশস্তকালই তখন ছিল শরৎঋতু। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ করবার অবকাশ আছে। সংস্কৃতকাব্য যে যুগের তার পূর্ববর্ত্তী যুগে বসন্তকালই ছিল যুদ্ধযাত্রার প্রশস্ত সময়। তার বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম প্রমাণ—মুনি ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্রে'র ছন্দঃ অধ্যায়ে সর্বযমক ব পূর্ণযমক কবিতার উদাহরণ। সেটি এই—

বারণানাং অয়মেব কালো
বারণানাং অয়মেব কালঃ।
বা রণানাং অয়মেব কালো
বা রণানাং অয়মেব কালঃ॥

—বারণ বা পুষ্পপুঞ্জের এই হচ্ছে সময়, হাতীদের এই হচ্ছে সুসময়, শত্রুদের এই হচ্ছে সময় আর যুদ্ধযাত্রার এই হচ্ছে সময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ কবিতাটি সম্বন্ধে প্রাচ্যবিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ যে মন্তব্য করেছেন, তা হচ্ছে যে—ঐ কবিতাটি বসন্তকালকে উপলক্ষ্য করেই লেখা। কাজেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে—বসন্তকালই ছিল সেকালে যুদ্ধযাত্রার দিন। রাজা সুরথও সেই বসন্তকালেই যুদ্ধযাত্রা করে তাঁর শত্রুদের পরাভূত করেন।

এখানে একটি তথ্য আরো পাচ্ছি যে—তখনকার দিনে যে চতুরঙ্গবাহিনী নিয়ে রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বের হতেন, তাতে থাকতো রথ, অশ্ব ও গজ আর পদাতিক বাহিনী। অর্থাৎ স্থলযুদ্ধের উপযোগী সৈন্য সমাবেশ করতেন তাঁরা। যা কেবল বসন্তকালেই চালনা করা যায়—কিন্তু শরৎকালে, বিশেষ করে নদীবহুল ভারতবর্ষে যখন সর্বত্রই জলস্রোত প্রবাহিত থাকে, তখন চতুরঙ্গবাহিনী চালনা করা একেবারেই সম্ভব নয়। রাজা সুরথেরও বাহন ছিল অশ্ব। আরো একটি কথা—অনেক ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে আর্যরা কোনো না কোনো ইওরোপীয় অঞ্চল বা তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকেই ভারতবর্ষে আগমন করেন—যে অঞ্চলে শীতের সমধিক প্রকোপের জন্য শীতের অন্তে বসন্তকালেই যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করা হতো। সে আয়োজনের প্রশস্ত সময় ছিল মার্চ মাস। ঐ মার্চ মাসের নামটিও এসেছে যুদ্ধের দেবতা মারস্-এর নামানুযায়ী। প্রসঙ্গত মনে আসে প্রবন্ধকার নিউম্যান সাহেবের লেখা 'নর্থম্যান' প্রবন্ধটির কথা। তাতে তিনি দেখিয়েছেন—কি ভাবে উত্তরের যাযাবর দস্যুরা শীতের শেষে তাদের পশুবধের অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো, দক্ষিণের স্থাবর শান্তিপ্রিয় মানুষদের ওপরে আর কি ভাবে লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো সঞ্চিত শস্যাদি। যাই হোক—ঐ মার্চ মাস কিন্তু আমাদের দেশের বসন্ত কালেরই সমসাময়িক।

॥ রাম ও জলপথযুদ্ধ ॥

এবার রামের কথা বলি। তিনি তো ছিলেন আর্যবংশধর। বাল্মিকী রামায়ণে তো রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিকের সীমা সংখ্যা নেই। ভরত যখন রামকে ফিরিয়ে আনার জন্যে চিত্রকূট যাত্রা করলেন, গেলেন চতুরঙ্গবাহিনী নিয়ে। কিন্তু গঙ্গা পার হবার জন্যে তাঁকে নির্ভর করতে হলো অনার্য গুহক ও তার সহকারীদের চালিত নৌকোর ওপরেই। অর্থাৎ অযোধ্যার নৌবাহিনী বলে কিছু ছিল না বলেই মনে হয়। রামও, তাই জানতেন স্থলচারী সৈন্য নিয়েই যুদ্ধ করতে। কিন্তু বনবাসে যখন সীতাহরণ হলো, তখন আর কোথায় পাবেন স্থলচারী সৈন্য। তার ওপর তখন আবার বর্ষা নেমে গিয়েছিল। তাই দেখি—সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতালাভ করে বালিবধশেষে রাম বাধ্য হলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিষ্কিন্ধ্যার পর্বতগুহায় বর্ষাকাল কাটাতে। তিনি তো ভেবেই পেলেন না—জলপ্লাবিত পথে কি করে অগ্রসর হবেন ? সমস্যা আরো জটিল হলো যখন জানলেন যে, সীতা-হরণকারী রাবণ বাস করে সমুদ্রবেষ্টিত লংকাদ্বীপে।

এদিকে তো সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতার ফলে দক্ষিণের সমস্ত গণগোষ্ঠীই একত্রিত হলো রামকে সাহায্য করার জন্যে। রামায়ণে তাদের বানর, হনুমান, ভল্লুক, পক্ষী, প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। আসলে তাঁরা ছিলেন অনার্য বা প্রাগার্য—তাঁরা বাস করতেন গণবদ্ধ হয়ে—বংশগত প্রতীক বা টটেম ছিল তাঁদের বানর, হনুমান, ভল্লুক, পক্ষী ইত্যাদি। অথচ সেই অনার্যরা স্থপতিবিদ্যায় কত পারদর্শী ছিলেন—তার তো প্রমাণ পাই, তাঁরা সমুদ্রে সেতুবন্ধন করছেন দেখে। শুধু তাই নয়, যখন হনুমান প্রথম রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ব্রাহ্মণের বেশে—তখন তাঁর শ্লক্ষ্মমধুর ভাষা শুনে রাম ভালই বুঝলেন কতখানি কৃতবিদ্য হলে তবে অমন উচ্চারণে, অমন শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করা যায়। আবার বুদ্ধিতে, শক্তিতে, ভেষজবিদ্যায় তাঁরা কতখানি পারঙ্গম ছিলেন—তার প্রমাণও আছে রামায়ণের মধ্যেই। সেই বিভিন্ন গণের লোককে একত্রিত করতে পেলেন রাম সুগ্রীবের সহায়ে, গড়ে উঠলো একটি দুর্ধর্ষ মিত্রশক্তি। আর তাঁদের নিয়েই তো অবরোধ করতে পেলেন রাবণের সুরক্ষিত লংকা-দুর্গ সমুদ্র পার হয়ে। কিন্তু সে পরের কথা।

তার আগে দেখি—সীতার অন্বেষণে তো নানাদিকে ছুটলেন বানর ও হনুমানরা। তাঁরা কি ভাবে সেই বর্ষাপ্লাবিত স্থলভাগ পার হয়ে এমন কি সমুদ্র পার হয়েও পৌঁছলেন লংকা দ্বীপে ?

॥ বানর—প্লবঙ্গম—জলপথযাত্রী ॥

রামায়ণে দেখি বানরদের একটি নাম আছে প্লবঙ্গম। অর্থাৎ যারা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে তারাই বানর বা হনুমান। বাস্তবিক তো দেখা যায় আজো পর্যন্ত বানরাদিরা লাফিয়ে লাফিয়েই চলাফেরা করে। কিন্তু প্লব শব্দের অন্য একটি অর্থ হচ্ছে ভেলা। যাঁরা ভেলা নিয়ে সাগরে ভাসেন—তাঁদের দেখেও তো মনে হয় যে—তাঁরা যেন ঢেউয়ের মাথায় মাথায় লাফিয়ে চলছেন। অর্থাৎ বানর হনুমানরা কেবল স্থলে নয়, জলেও যাতায়াত করতে পারতেন ভেলার সাহায্যে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নৌযুদ্ধও জানতেন—যে বিদ্যা রামের অজ্ঞাত ছিল। রাম তাই ভেবেই পান নি শরৎকালে জলমগ্ন পথ পেরিয়ে কি করে আক্রমণ করতে যাবেন দ্বীপের রাজা রাবণকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনি তো সম্মিলিত গণশক্তি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলো যুদ্ধযাত্রায়। সেই সত্যই নিহিত রয়েছে ঐ অকালবোধনের মন্ত্রটিতে।

॥ রাম ও গণশক্তি ॥

রাম যে গণশক্তির মতে চলতেন—তার প্রমাণ তাঁর পরবর্তী জীবনের মধ্যে প্রকট। তাই প্রজানুরঞ্জনের জন্যে তাঁকে শম্বুককে বধ করতে হয়েছিল, সতী স্ত্রীকেও নির্বাসন দিতে হয়েছিল, শেষে সীতার পাতাল প্রবেশেরও নিমিত্ত হতে হয়েছিল। আর স্নেহের ভাই লক্ষ্মণকে বর্জন করে সরযূতে আত্মবিসর্জনও দিতে হলো। এ সবের মধ্যেই তো প্রকটিত হয় যে, রাম ছিলেন গণমতে প্রতিষ্ঠিত রাজা—আধুনিক কালের সিভিক্স যাকে বলে—"কিং মেড বাই সোশ্যাল কনট্রাক্ট থিয়োরী।"

যাই হোক, জলচারী সৈন্যদের সমাবেশ করেই যে রাম শরৎকালে যুদ্ধযাত্রা করার সাহস পান তাঁদেরই কাছে থেকে, তা অস্বীকার করা যায় না। সেই অনার্যরাই ভাসমান শিলা দিয়ে সেতু নির্মাণ করে রামের লংকায় যাবার পথ সুগম করে দিলেন। ঐ ভাসমান সেতু তো আসলে 'পনটুন ব্রিজ'—সেটি জলযুদ্ধেরই একটি বিশেষ প্রক্রিয়া—এ কথা বর্তমান কালের নৌযোদ্ধারাও জানেন। হাওড়া ও কলকাতার মধ্যবর্তী গঙ্গা-পারাপারের জন্যে নবনির্মিত ক্যান্টিলীবর ব্রিজ যখন ছিল না, তখন তো পনটুন ব্রিজই যোগাযোগ রক্ষা করতো।

এখানে আবার একবার দেখি ঐ শক্তি বা দেবী বা দুর্গার কি রূপ উদবাটিত হয়েছে চণ্ডী সপ্তশতীর মধ্যে।

প্রথম চরিত্রে তো দেখি মধুকৈটভের বধের জন্যে, মধ্যম চরিত্রে মহিষাসুর বধের জন্য আর উত্তর চরিত্রে শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের জন্য তাঁকে আবাহন করা হচ্ছে। এর থেকে কি বেশ বোঝা যায় না যে—তিনি হচ্ছেন যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী? যখনই প্রবল বাধা জাগে জীবনের প্রসারের পথে, তখনি তাঁকে স্মরণ করতে হয় যেন শত্রু-নিপাতের শক্তি জাগে। সেই কথা তো তিনি নিজেও বলেছেন—সেই—

ইত্থং যদা যদা বাধা—ইত্যাদি মন্ত্রে—যা আগেই আমরা পেয়েছি। দুর্গা নামও তাঁর দুর্গমাসুরকে বধ করে। যুদ্ধ জয়ের আগে সেই দেবীকে আবাহন করার পরামর্শ রামকে দিয়েছিলেন ঐ গণশক্তি বা ব্রহ্মা, আর অকালে বা শরৎকালেই যে যুদ্ধযাত্রা সম্ভব, তারও নির্দেশ দিলেন তাঁরাই—এ কথা বোধ হয় এতক্ষণে আমরা ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। তাই ঐ পুরাণে দৃষ্ট অকালবোধনের মন্ত্রে বা কৃত্তিবাসের রামায়ণে লেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহিনীর মধ্যে কল্পনা কিছু নেই—যা আছে তা হচ্ছে কবির প্রকাশভঙ্গীর স্বাধীনতা। আর ঐ যে অকালবোধনের মন্ত্রে ইন্দ্রের যুদ্ধজয়ের উল্লেখ পাই, তারও তো বিশদ বিবরণ আছে বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে। যেখানে দেখি ইন্দ্র মরুদ্‌গণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অহি বা বৃত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলেছেন—সেও যে বর্ষা বা শরৎকালের ঘটনা—তাও যুদ্ধের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়।

॥ দুর্গা প্রতিমার বিশ্লেষণ ॥

এ প্রবন্ধের শুরু থেকেই তো আমরা এই সত্যই বুঝে নেবার চেষ্টা করছি যে—মানুষ কি ভাবে বস্তুবিচার করতে করতে ভাবে উত্তীর্ণ হচ্ছে। আজকে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে নানা দর্শনবাদ জেগেছে—তার সূত্রপাত তো হয়েছিল মানুষের আত্মজ্ঞান থেকেই। নিজেকে বিশ্লেষণ করতে করতেই মানুষ পৌঁছেছে ঈশ্বরের আদর্শে। যদিও আজকে আর মনেই হয় না যে—আমরাই সৃষ্টি করেছি আমাদের ঈশ্বরকে। যেমন মনে হয় না যে—দুর্গাপ্রতিমার সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট কোন কিছুর ভিত্তিতে। যাই হোক—এখন বিচার করা যাক দেবী দুর্গা কোন্ ভাব বা রূপের প্রতীক-কল্পনা!

দুর্গাপ্রতিমাতে যে যে মূর্তি ও বস্তুর সংস্থান আছে—তা হচ্ছে, প্রতিমার দক্ষিণ দিকে দেখা যায়, নবপত্রিকা, যাকে চলতি ভাষায় বলা হয়—কলা-বৌ। সেটি অবশ্য প্রতিমার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই থাকে পৃথক চৌকিতে। প্রতিমা যে চৌকিতে অবস্থিত—তার মধ্যভাগে দেখা যায় দেবী দুর্গার সিংহবাহিণী দশ প্রহরণধারিণী মূর্তি, পদতলে স্কন্ধচ্যুত মহিষমুণ্ড; বাম পদে পীড়িত করছেন তিনি মহিষাসুরকে, দক্ষিণ পদ সিংহের পৃষ্ঠে স্থাপিত; বাম হস্তের একটিতে নাগপাশ যার দ্বারা অসুরের কণ্ঠবদ্ধ, আর দক্ষিণ হস্তের একটিতে ত্রিশূল—যা ভেদ করছে অসুরের বক্ষ। দেবীর অব্যবহিত দক্ষিণে পদ্মের উপরে অধিষ্ঠিত লক্ষ্মীর মূর্তি, আরো দক্ষিণে মূষিকবাহনে গণপতি আর বামে দেবীর অব্যবহিত পার্শ্বে পদ্মের ওপরে বিরাজিত সরস্বতীর মূর্তি, আরো বামে ময়ূরবাহনে কার্তিক। চালচিত্রে দেবীর মুকুটের অন্তরালে বিরাজ করছেন শিব, আর তাঁর দক্ষিণে বামে বিভিন্ন দেবতা।

দুর্গাপূজার একটি ক্রমও নির্দিষ্ট আছে বোধনপর্ব শেষ করে প্রথমে নবদুর্গা বা নবপত্রিকার পূজা তারপর গণেশ, অষ্টশক্তিসমন্বিতা দেবী দুর্গার, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করতে হয়। শেষে দেবীর বাহন সিংহ, সর্প, ময়ূর, মূষিক ও মহিষাসুরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা বিধেয়। এ ছাড়া তো সমস্ত দিকপাল, সমস্ত দেবদেবী এমন কি অস্ত্রাদিরও পূজার বিধান আছে।

এবার বিশ্লেষণ করা যাক প্রতিমার মূর্তিগুলিকে।

॥ নবপত্রিকার তত্ত্ব ॥

প্রথম বলি নবপত্রিকার কথা।

অনেকের ধারণা যে নবপত্রিকার পূজা আসলে কৃষিলক্ষ্মীর পূজা। প্রকৃতপক্ষে তো ন'টি গাছেরই পূজো করে সেগুলি বস্ত্রে আচ্ছাদিত করেই নবপত্রিকার রূপদান করা হয়। অবশ্য দেবী বা শক্তিপূজা যে কৃষিজীবীদেরই অবদান এ সম্বন্ধে আমরা তো প্রথম পর্বেই জেনেছি, তাই আর সে আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

এখন বরং প্রতিমায় উপস্থাপিত পঞ্চ মূর্তির বিশ্লেষণ করি।

॥ গণপতির তত্ত্ব ॥

প্রথম ধরা যাক গণপতি-মূর্তিটি। গণপতি বলতে কি বোঝায় তার কিছু আভাস পাই, গণপতির স্থূল ধ্যানমন্ত্র থেকেই। তাতে আছে—

বন্দে শৈলসুতাসুতং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু ॥

বন্দনা করি সেই শৈলসুতাসুতকে, যিনি সকল কর্মে সিদ্ধিদান করে।

ঐ মন্ত্রের পাঠান্তরও আছে—তাতে কর্ম্মসু না বলে কামদং বলা হয়েছে। অর্থের দিক থেকে তা একই ভাব ব্যক্ত করে। কর্ম যিনি সিদ্ধ করে দেন, কামনাও তো তিনি পূর্ণ করেন। কারণ কর্ম মাত্রেই তো কাম্য। পরবর্তী যুগে অবশ্য গীতা প্রভৃতিতে নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা করা হয়েছে, কিন্তু বৈদিক যুগ থেকেই কর্ম মাত্রেই ছিল কাম্য।

যাই হোক - সিদ্ধি কে দান করতে পারেন? স্বভাবতই মনে হয়—সিদ্ধি যিনি লাভ করেছেন, তিনিই তো পারেন তা দান করতে। সিদ্ধি লাভ করেন কে? যিনি জ্ঞানী, কিন্তু গণেশের যা মূর্তি—তা দেখে তো মনেই হয় না যে, তিনি জ্ঞানের সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক রাখেন। সবাইতো গণ্ডমূর্খকেই 'হস্তীমুর্খ' আখ্যা দেয়। সেই হস্তীর মুণ্ড যাঁর স্কন্ধে তিনি কি জ্ঞানী হতে পারেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে মনে পড়ে ব্যাসদেবের মহাভারত রচনার কথা। ব্যাসদেব তো রচনা করতে গিয়ে মুশকিলে পড়লেন যোগ্য লেখক কে হবে ভেবে। শেষ পর্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেলেন গণেশকে। গণেশ বললেন—"লিখতে পারি তোমার হয়ে, যদি শ্লোক তৈরি করতে গিয়ে, আমার লেখার বিরাম না ঘটাও।"

ব্যাসদেব বললেন—"বেশ তাই হবে। কিন্তু আমি যা শ্লোক রচনা করবো, তুমি তার অর্থ বুঝে তবে লিখবে। অর্থ না বুঝে লিখলে চলবে না।"

গণেশ বললেন—"ঠিক আছে। রচনা কর তুমি শ্লোক—আমি তার অর্থ বুঝেই লিখবো।"

সেই ভাবে অর্থ বুঝে গণেশ লিখে ফেললেন ব্যাসদেবের মুখনিঃসৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারত। পণ্ডিতরা জানেন সেই লক্ষশ্লোকের মধ্যে কতগুলি দুরূহ শ্লোক আছে—যার অর্থবোধ করা সাধারণ জ্ঞানীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাই সেই শ্লোকগুলির নাম হয়ে আছে—ব্যাসকূট। গণেশ পরম জ্ঞানী না হলে কি কখনো পারতেন সেই সব দুরূহ শ্লোকের অর্থ বোধ করতে?

আরও একটি উপাখ্যান পাই গণেশের জ্ঞানবত্তা সম্বন্ধে। একবার ময়ূরবাহন কার্তিক মূষিকবাহন গণেশকে বললেন—"চলো, দাদা, দেখি কে পারে আগে ত্রিভুবন ভ্রমণ করে আসতে।"

কার্তিকের ধারণা ছিল তিনি তো যাবেন ময়ূরবাহনে বায়ুপথে অতি দ্রুতবেগে আর গণেশ যাবেন মূষিকবাহনে স্থলপথে অতি মন্থর বেগে—কাজেই গণেশকে অতি সহজেই পরাভূত করবেন তিনি। গণেশ সম্মত হলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কার্তিক কালবিলম্ব না করে ময়ূরবাহনে যাত্রা করলেন। দেখে গেলেন গণেশ তখনো মায়ের পদসেবা করছেন। ভাবতে ভাবতে গেলেন যে—'দাদা যখন এখনো বের হলো না, তখন কোনো রকমেই জিততে পারবে না আমার কাছে।'

ত্রিভুবন ঘুরে এসে কার্তিক দেখেন যে—গণেশকে তিনি যে অবস্থায় দেখে বের হয়েছিলেন, তখনো সেই অবস্থায় মায়ের পদতলে বসে আছেন গণেশ। হেসে বললেন—"কি দাদা! হেরে গেলে তো?"

গণেশও সহাস্যে বললেন—"না, হারবো কেন? মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ না।"

বিস্মিত হয়ে কার্তিক মাকেই প্রশ্ন করলেন—"দাদা এ কি বলছে, মা?"

মাও হাসলেন, বললেন—"কেন? গণেশ তো ঠিকই বলছে। তুই যাত্রা করার পরেই তো গণেশ আমাকে প্রদক্ষিণ করলো—একবার কেন, তিনবার।"

গণেশ হেসে বললেন—"মাকে প্রদক্ষিণ করলেই ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করা হয়—তুই তা কি জানিস না?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথা হেঁট করে কার্তিক গণেশের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। গণেশ কার্তিককে সাদরে আলিঙ্গন করে বললেন—"ভাইরে! মা যার ঘরে তাকে কি ত্রিভুবনে ছুটে বেড়াতে হয়? মার চরণ ছুঁলে যে সর্বার্থসিদ্ধি লাভ করা যায়।"

এমন জ্ঞানী গণেশের হস্তীমুণ্ড কেন? এর মধ্যে জেগে আছে যেন ঠিক সেই শ্লেষ, বর্তমানে 'হ্য মব' বলে যা প্রকাশ করা হয় যে কোন জনতার সম্পর্কে। যাঁরা বিদ্বান ও বাগ্মী তাঁরা চিরকালই প্রকৃত জ্ঞানী ও কর্মীদের হেয় চক্ষেই দেখেন। কিন্তু যাঁরা সার্থক পণ্ডিত তাঁরা জানেন যে—বিদ্যার সঙ্গে জ্ঞানের কোনই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। বিদ্যা তো মানুষকে বাগ্মী করে, কিন্তু জ্ঞান করে মানুষকে কর্মী। অতি অল্প ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিদ্যার সঙ্গে জ্ঞান যুক্ত হয়েছে। আরও এক কথা বিদ্যা লাভ হয় অভ্যাসের দ্বারা কিন্তু জ্ঞান হচ্ছে স্বাভাবিক শক্তি। বিদ্যার কথা আরো জানতে পাব আমরা সরস্বতীর তত্ত্বপর্যায়ে। এখন জ্ঞানের কথা বলি—শ্রদ্ধা যার আছে সেই লাভ করে জ্ঞান—শ্রদ্ধা শব্দের গূঢ় অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস। সেই সরল বিশ্বাস তো দেখা যায় তথাকথিত মূর্খদের মধ্যে—আর তাদের মধ্যে থেকেই দেখা দেন কবীরদাস, দাদূদাস বা রামকৃষ্ণ। তাঁদের মত সরল বিশ্বাস কোথায় বিদ্বানদের মধ্যে কিংবা তাঁদের মত তত্ত্বজ্ঞানী?

গণেশের স্কন্ধে হস্তীমুণ্ড যোজনার একটি অতি উত্তম ব্যাখ্যা এই পাওয়া যায় যে, যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী, সিদ্ধ তাঁদের শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ গ্রহণ করার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, হস্তীমুণ্ডের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করা সম্ভব। শ্রুতির শক্তি দেখাতে লম্বকর্ণ, স্পর্শগ্রাহিতার পরিচয় দিতে লম্বোদর, তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রকাশ দেখাতে ক্ষুদ্র চক্ষু, রসগ্রাহিতার লক্ষণে দীর্ঘরসনা আর ঘ্রাণশক্তির বৈশিষ্ট্য দেখাতে দীর্ঘনাসা তো হস্তীমুণ্ডেই সন্নিবেশিত। গণেশ যে সর্বকৃপালাভ করেছেন মায়ের কাছে তারও পরিচয় দেবীর 'গণেশজননী' নামটি। মা গণেশকে এতো স্নেহ করেন যে তাঁর নামেই তিনি পরিচিত—কার্তিকজননী বলে কেউ তাঁকে তো ডাকে না। অবশ্য বড় ছেলের মা বলে মায়েদের ডাকা একটি লোকাচার। মায়ের দাক্ষিণ্য যে গণেশের প্রতি, সমধিক তা বেশ জানা যায় গণেশ মায়ের দক্ষিণে অবস্থিত দেখে। অথবা বলা যায় জ্ঞান বা গাণপত্য লাভ করা যায় দক্ষিণাচারেই এটি একটি সহজাত বৃত্তি।

এই জ্ঞানের আর এক নাম হচ্ছে—বিবেকবুদ্ধি। আর ইরাজী প্রতিশব্দ হচ্ছে—'কন্‌সেন্‌স্'। হাবার্ট স্পেনসার সাহেবের কাছে জানতে পাই যে—কন্‌সেন্‌সের সংজ্ঞা হচ্ছে—ষ্টোর্ড রেসিয়াল এক্‌স্‌পিরিয়েন্‌স্। সেই তো গণচৈতন্য। তাই কি গণপতির বীজ মন্ত্র - গং অর্থাৎ গণচৈতন্যের প্রথম শব্দ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোটকথা, গণেশ হচ্ছেন কৃষিজীবীদেরই একজন—কে জানে, সেই কারণেই কলা-বৌ বা নবদুর্গাকে তাঁর সঙ্গিনী বলা হয় কি না। তবে তিনি যে মাটির অত্যন্ত নিকটস্থ তা অস্বীকার করা যায় না। সেদিক থেকে তিনি ক্ষিতিতত্ত্বের প্রতীক। সেই ক্ষিতি বা পৃথিবীই তো ধরে আছে সব কিছুকেই—তাই গণেশকে ধর্মের প্রতীক বললেও বোধ হয় ভুল হয় না।

এবার গণেশের বাহন মূষিক সম্পর্কে যা বলার আছে বলি। মূষিকের বিশেষত্ব এই যে, সে সর্বদা সচেষ্ট থাকে শস্য সংগ্রহ করতে। শস্যই তো সার বা জ্ঞান। যেখানে মূষিক সেই শস্য খুঁজে পায় না—সেখানে সে কি ভাবে সব কিছু ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়—তা কারোর অজ্ঞাত নয়। মূষিকের এই উপদ্রবের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয় হনুমানের সেই কাহিনীটি। শোনা যায়—সীতা একবার খুশী হয়ে হনুমানকে একটি গজমুক্তার মালা উপহার দেন। মালা পেয়ে হনুমান ছিঁড়ে ফেলে প্রত্যেক মুক্তা চিবিয়ে দেখতে থাকেন। সীতা তাই দেখে বললেন—"ও কি করছ? অমন মূল্যবান মালাটি নষ্ট করছো?"

হনুমান তার উত্তরে বললেন—"মা, আমি দেখছিলাম এর মধ্যে তোমার ও প্রভু রামচন্দ্রের মূর্তি আছে কিনা?"

মূষিকও তো সেই ভাবে সর্বত্র খুঁজে বেড়ায় সারবস্তু—শস্য। সুতরাং সবাহন গণপতি যে মহাজ্ঞানেরই প্রতীক—তা বোধ হয় আমরা এতোক্ষণে বেশ বুঝতে পেলাম।

॥ লক্ষ্মীর তত্ত্ব ॥

এবার লক্ষ্মী। এঁর স্থানও দেবীর দক্ষিণে। অর্থাৎ ইনি যে শক্তির প্রতীক তাও দক্ষিণাচারেই লভ্য বা সহজাত। কে না জানে যে জ্ঞান আর ঐশ্বর্য্য সেই পরাশক্তির দাক্ষিণ্যের মূর্ত্য প্রকাশ, যার সঙ্গে বিদ্যা বা বীর্যবত্তার কোনই সম্বন্ধ নেই।

ঐশ্বর্য্য বা লক্ষ্মীলাভ করার উপায় তো দেখি—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্ধং কৃষিকর্মণি।
তদর্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—পূর্ণভাবে লক্ষ্মীলাভ হয় বাণিজ্য করলে, তার অর্ধেক লাভ হয় কৃষিকর্মে, তার এক চতুর্থাংশ লাভ হয় রাজসেবায়। কিন্তু ভিক্ষায় কখনই কিছু লাভ হয় না।

কিন্তু কি বাণিজ্য, কি কৃষিকর্ম আর কি রাজসেবা, যে জীবিকাই গ্রহণ করি, বিনা পরিশ্রমে কোন ফল ফলে না। তাই দেখি বর্তমান যুগের অর্থনীতিবিদ্‌রা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন—লেবার্ বিগেট্‌স্ ক্যাপিট্যাল্। শ্রমই হচ্ছে ধনোৎপাদনের মূলীভূত কারণ।

এই শ্রম সম্বন্ধে জ্ঞানতন্ত্রে পাই—

শ্রমাধীনং জগৎ সর্বং
শ্রমাধীনশ্চ দৈবতাঃ।
শ্রমাধীনং মহামন্ত্রং
শ্রমাধীনঃ পরন্তপঃ॥

—সমস্ত জগৎই হচ্ছে শ্রমের অধীন, সমস্ত দেবতা, সমস্ত মহামন্ত্র, সমস্ত শ্রেষ্ঠ তপস্যাও শ্রমসাধ্য।

যদিও জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য লাভ করার অধিকার মানুষ মাত্রেরই সহজাত, কিন্তু আলস্যের বশীভূত যে—তার পক্ষে কিছু লাভ করা সম্ভব হয় না। তাই প্রবাদে পাই—উদ্যোগী পুরুষের কাছেই লক্ষ্মী এগিয়ে আসেন। হস্তপদ তো সকলেরি আছে কিন্তু সেই হস্তপদ যদি কেউ সঞ্চালন না করে আলস্যবশে—তবে আর সে কি লাভ করবে, কিই বা অর্জন করবে?

ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য
প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

—সুপ্ত সিংহের মুখের মধ্যে গিয়ে তো কোন পশুই প্রবেশ করে না। সিংহকে আহার লাভ করতে হয় সদাজাগ্রত উদ্যমের বলে।

পুরাণের উপাখ্যানেও তো দেখি—দুর্বাসার শাপে ইন্দ্রকে ছেড়ে গেলেন লক্ষ্মী। তখন লক্ষ্মীকে উদ্ধার করার জন্যে পরম উদ্যমে সংহত হলেন দেবতাগণ ও অসুরগণ। শুরু হলো বিপুল পরিশ্রমে সমুদ্রমন্থন। তারি ফলে হারানো লক্ষ্মী আবার ইন্দ্র ফিরে পেলেন। এর থেকেও তো বেশ বোঝা যায় যে, কত শ্রমের মূল্যে তবে লক্ষ্মীকে লাভ করা যায়। কে জানে, সেই জন্যেই লক্ষ্মীকে কোথাও কোথাও বিজয়া নামে অভিহিত করা হয় কিনা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাণের ঐ উপাখ্যান থেকেই জানা যাচ্ছে যে, লক্ষ্মী সমুদ্রের কন্যা—অর্থাৎ সমুদ্র-গামী বণিকরাই তাঁর কৃপা সমধিক লাভ করে। আর এও জানা যাচ্ছে যে—লক্ষ্মী হচ্ছেন অপস্তত্ত্বের প্রতীক। আবার চতুর্বর্গের দ্বিতীয় যে অর্থ—লক্ষ্মী তারও প্রতীক বটে।

কিন্তু যেদিক থেকেই বিচার করি—দেখতে পাই লক্ষ্মীলাভের মূলমন্ত্র হচ্ছে শ্রম। তাই কি লক্ষ্মীর বীজমন্ত্র শ্রীং অর্থাৎ শ্রমের প্রথম অক্ষরকে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত করে নেয়া হয়েছে?

॥ সরস্বতীর তত্ত্ব ॥

এবার সরস্বতী। ইনি দেবীর বামে অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ বিদ্যা লাভ করতে হলে সহজ সাধনায় তা লাভ করা যায় না। অতি কঠিন দুঃসাধ্য তপস্যায়, বামাচারে লাভ করা যায় এই বিদ্যা।

এই বিদ্যার চতুঃষষ্টি ভাগ আছে—যা চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা নামে বিখ্যাত। তন্ত্রে এই চৌষট্টি কলাবিদ্যাকেই বলা হয়েছে চৌষট্টি যোগিনী। বাস্তবিক বিদ্বান্ পারেন অতি সহজে সবায়ের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে।

এই সরস্বতীকে পুরাণে ব্রহ্মার কন্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিজগণ জানেন— গায়ত্রীর সান্ধ্যকালীন সংজ্ঞা হচ্ছে—সরস্বতী। বেদজ্ঞজনেরা তাই সরস্বতীকে শিবরূপিনী বলেই কীর্তন করেন।

এখানে আহ্নিকমন্ত্র অনুযায়ী সরস্বতীর রূপ কি ভাবে জেগে উঠলো—তা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—যদিও কোন কোন পণ্ডিত জানিয়েছেন যে—সরস্বতী নদীর তীরে প্রথমে বেদপাঠ করার স্মৃতিকে চিরন্তন রূপ দিতে গিয়েই সরস্বতীর রূপকল্পনা জেগেছে। কিন্তু শীতে যখন সরস্বতী নদীর জল জমে তুষারশিলায় পরিণত হতো, তখন কোথায় ফুটতো পদ্ম আর কোথায় বা বিচরণ করতো হংস? কাজেই তাঁরা যে বলেন যে—সরস্বতী নদীর শীতকালীন তুষারাচ্ছন্ন স্মৃতি থেকেই দেবী সরস্বতীর রূপ জেগেছে তা মেনে নেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় আহ্নিকমন্ত্রে গায়ত্রীর যে তিনটি ধ্যান আছে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে পাঠ্য—সেই তিনটি ধ্যানের সমন্বয় করেই জেগেছে সরস্বতীর রূপ ॥ প্রভাতের ধ্যান থেকে নেয়া হয়েছে ব্রহ্মার পদ্ম ও হংসাসন। মধ্যাহ্নের ধ্যান থেকে নেয়া হয়েছে বিষ্ণুর নিত্য যৌবনের রূপ আর সন্ধ্যার ধ্যান থেকে নেয়া হয়েছে শিবের বর্ণ ও বেশভূষা। সরস্বতীর এ রহস্য অতি গুহ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাই হোক, বেদ বা পুরাণ কিন্তু এ বিষয়ে একমত যে—সরস্বতী হচ্ছেন বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সেই বিদ্যার অনুশীলনই মানুষকে দান করে বিনয়, দান করে নমনীয়তা। যে মানুষ নম্র নয়, সে কখনো পারে না জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্য ঘটাতে। সেই সামঞ্জস্যকেই তো ইংরাজীতে বলে—'হার্‌মনি'। হার্‌মনি সৃষ্টি করা যায় আবার বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র একত্রে বাজিয়ে, যাকে বাংলায় বলি—ঐক্যতান। দেবী সরস্বতীর হাতে দেখি বীণাযন্ত্র, যাতে সরু মোটা নানা মাপের নানা তার একত্র সন্নিবেশিত থাকে। তার প্রত্যেকটি যদি ঠিক সুরে বাঁধা না থাকে—তা হলে বীণাবাদন একেবারেই অশ্রাব্য হয়ে ওঠে, ঐ হার্‌মনির অভাবে। তেমনি যিনি বিদ্বান্ তিনি যদি সবায়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে নাই পারেন, তবে তো তিনি বিদ্যার ভারবাহী মাত্র। যিনি সার্থক বিদ্যালাভ করেছেন তিনিই সর্বদা সুশানিত ঔজ্জ্বল্যে সবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, সর্বত্র জয়লাভ করেন—ঠিক যে ভাবে শুভ্র শ্বেতবর্ণ সবায়ের দৃষ্টিগোচর হয়। কে জানে, সেই কারণেই সরস্বতীকে কোথাও কোথাও জয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে কিনা! বর্ণবিদ্যার যাঁরা অধিকারী তাঁরা তো বলেন—প্রেজেন্স্ অব্ অল্ কালার্ ইজ্ হোয়াইট্—হোয়াইল্ অ্যাবসেন্স্ অব্ অল্ কালার্ ইজ্ ব্ল্যাক্।

বাস্তবিক তো দেখা যায় যে, সূর্যে সপ্তবর্ণের সমাবেশ আছে বলেই সূর্যকে শ্বেতবর্ণ দেখায়। অবশ্য চিত্রকরেরা ঐ বর্ণতত্ত্ব মানেন না—তাঁরা বিশ্বাস করেন কোনো বর্ণ যেখানে নেই তাই সাদা, আর সব বর্ণ যেখানে মিশেছে তা কালো। অবশ্য আমাদের তন্ত্রে যেমন শ্বেত সরস্বতীর উল্লেখ পাই, তেমনি পাই নীল সরস্বতীর। কিন্তু সে আবার অন্য কথা।

বিদ্যার অন্তর্নিহিত গুণ হচ্ছে ঐক্য সৃষ্টি করা। এখানে একটি কথা মনে রাখার যে—জ্ঞান বা শ্রমের অনুশীলন যে কোন মানুষ একা একা আপনার মতোই করে যেতে পারে। কিন্তু বিদ্যার অনুশীলন ঐক্য ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত যত বিদ্যাই স্তূপীকৃত হয়েছে, তা হতে পেরেছে ঐক্যেরই ভিত্তিতে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কি ভাবে দিগ্‌বিজয়ীর দল জয়মদে মত্ত হয়ে বিজিতদের পুঁথিশালা কতোবার অগ্নিতে ভস্মসাৎ করেছে। এ স্বভাব মানুষের চিরন্তন। আজও তাই দেখা যায় যে পরমতসহিষ্ণুতার অভাবে কতোদেশে পুঁথিপুস্তকপ্রমাণাদি ধ্বংসীভূত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মানুষের মধ্যে আরো এক দুর্বুদ্ধি আছে যে সহজে নিজের লব্ধ কোন বিশেষ বিদ্যাকে, অপরের কাছে প্রকাশ করতেও রাজী নয় কেউ। এই ভাবে কত যে মন্ত্র—কত যে বিদ্যা লোপ পেয়েছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবীতে, তারও প্রমাণ ইতিহাসেই পাই। এ সবি তো অনৈক্যের পরিচয়। বিদ্যাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাই ঐক্যের বোধ থাকা একান্ত আবশ্যক। এ সত্য জানতেন তান্ত্রিক আচার্যরা। তাই বোধহয় সরস্বতী, যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁর বীজমন্ত্র স্থির করেছিলেন তাঁরা 'ঐং', যা হচ্ছে ঐ ঐক্য শব্দেরই প্রথম অক্ষর।

আবার গুরুর বীজও দেখি 'ঐং', গুরুমুখ থেকেই তো শিষ্যরা বিদ্যালাভ করেন। সেই গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যদি ঐক্য না থাকে, তবে আর কি করে সম্ভব হবে বিদ্যাচর্চা বা বিদ্যার দান ও গ্রহণ?

আবার আর একদিক থেকে বিচার করলে দেখি—সরস্বতী মরুৎ-তত্ত্বের প্রতীক। যত কিছু বিদ্যা জগতে আছে সবি তো প্রকাশ পায় শব্দের মাধ্যমে—সেই শব্দকে গতি ও বিস্তৃতি দান করে মরুৎ—এ কথা বিজ্ঞানবিদ্‌রা জানেন। সেই মরুৎই তো ঘটান জড় ও জঙ্গমের পরম ঐক্য; পূর্ণ করেন সবায়ের বিস্তৃতির কামনা। তাই চতুর্বর্গের তৃতীয় বর্গ কামের প্রতীক হচ্ছেন সরস্বতী।

॥ কার্তিকের তত্ত্ব ॥

এবার কার্তিক। ইনিও দেবীর বামে অবস্থিত। কার্তিকের অন্য নাম পাই দেবসেনাপতি। অনেকে অর্থ করেন যে, তিনি দেবসেনা নামে একটি নারীর পতি ছিলেন। কিন্তু এ কথা তর্কগ্রাহ্য নয়। কার্তিককে আকুমার ব্রহ্মচারী বলেই সবাই জানেন। ছান্দোগ্যউপনিষদে পাই নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ। সেখানে ঐ সনৎ-কুমার, যার অর্থ চিরকুমার, নারদকে দিচ্ছেন ব্রহ্মোপদেশ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপলব্ধি ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কেউই লাভ করতে পারেন না। যাই হোক—ঐ সনৎকুমারকেই স্কন্দ বা কার্তিকেয় বলে স্বীকার করা হয়।

কার্তিকের আর একটি নাম ষড়ানন। পুরাণে পাই কার্তিক হচ্ছেন অগ্নি ও স্বাহার সন্তান। লোকলজ্জা ভয়ে স্বাহা তাঁর সদ্যোজাত পুত্রকে শরবনে নিক্ষেপ করেন। সেখানে কৃত্তিকারা ছয় বোনে কার্তিককে দেখে তাঁকে পালন করার ভার নেন। তাঁদের ছ'জনের স্তন্য একত্রে পান করার জন্যেই কার্তিকের ছ'টি মুখ জেগে উঠেছিল। কিন্তু ব্রহ্মা চতুর্মুখ ও শিব পঞ্চানন—এই দুই দেবতার সঙ্গে তুলনা টানতে গেলে একটি অপূর্ব রহস্য প্রকাশ পায়। ব্রহ্মা চতুর্মুখ হলেন চার মুখে চারটি বেদ প্রকাশ করে, শিব পঞ্চানন হলেন চারমুখে চতুর্বেদ ও পঞ্চম মুখে তন্ত্র প্রকাশ করে। শিবের সম্বন্ধে আরো একটি আভাস পাই ছান্দোগ্য উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে যে—শিব পূর্ব মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্‌বেদ, দক্ষিণ মুখে যজুর্বেদ, পশ্চিমমুখে সামবেদ, উত্তর মুখে অথর্ববেদ ও ঊর্দ্ধ মুখে তন্ত্র প্রচার করেন। এ কথার উল্লেখ আগেই একবার অন্যভাবে করেছি। তাই সন্দেহ করার অবকাশ আছে যে—ষড়ানন শিবের মত পাঁচ মুখে পাঁচটি বিদ্যার প্রচার তো করলেনই, উপরন্তু অধোমুখে অন্য একটি বিদ্যারও প্রচার করেন। কি সেই বিদ্যা ?

সে বিদ্যা হচ্ছে—যোগবিদ্যা। যে যোগবিদ্যা জেগেছে বিবস্বান্ বা সূর্য থেকে। গীতায় পাই—

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ
মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

—সূর্য যোগবিদ্যা বলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে, মনুও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেন।

কিন্তু কার্তিক কি সূর্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ? হ্যাঁ—কার্তিক প্রকৃত পক্ষে সূর্যের প্রতীক। সেই আভাস পাই তাঁর ময়ূরবাহন-মূর্তি থেকে। ময়ূরের পাখাতেই আছে রামধনুর বর্ণসমাবেশ অর্থাৎ সূর্যের সাতটি রঙের সমাবেশ।

যাই হোক—শিব তো পঞ্চাঙ্গ-বিদ্যা আয়ত্ত করেও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন, লোকালয়ের বাইরে শ্মশানে ছিল তাঁর আবাস। শ্মশান শব্দের অর্থ শূন্যস্থান। কার্তিক কিন্তু শূন্যস্থানে থাকতেন না। উপায় কোথায় তাঁর তা থাকার ? তিনি দেবসেনাদের অধিপতি—সর্বদাই গণবেষ্টিত স্থানে অধিষ্ঠান করতেই হতো তাঁকে। আর সেই অধিষ্ঠান লাভ করেছিলেন তিনি যোগবিদ্যা বলেই। আরো বিশদ করে বলতে গেলে তো এই কথাই বলতে হয় যে—শিবের পঞ্চাঙ্গ-বিদ্যা ছিল একেবারেই মৌখিক বা থিওরেটিক্যাল্, কিন্তু কার্তিকের মধ্যে জেগেছিল সেই পঞ্চাঙ্গ-বিদ্যার প্রকৃত বিনিয়োগ, তিনি হয়ে উঠেছিলেন যোগী বা প্র্যাক্‌টিক্যাল্। সেই হচ্ছে কার্তিকের ষড়াননত্ব।

কার্তিকের ধ্যানে পাই—কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ ॥ অর্থাৎ সেই কুমার কার্তিক, শক্তি যাঁর হাতের মুঠোয়।

শক্তি বলতে অনেকে অর্থ করেন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। কিন্তু শক্তির অন্য অর্থটিও তো সর্বজনপ্রসিদ্ধ। শক্তি বলতে তো সবাই বুঝি—বল বা বীর্য বা সামর্থ্য।

কার্তিক ছিলেন সেই সমর্থ যোগী। যে শক্তিলাভ করে শিব তাঁর হৃদয়ে ধারণ করে নির্লিপ্ত আত্মসাধক হয়ে গেলেন, সেই শক্তিকে প্রয়োগ করতে জেনে কার্তিক হয়ে উঠলেন দেবতাদের রক্ষক—সেই কথাই তো প্রকাশ পাচ্ছে ঐ শক্তিহস্ত শব্দটিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে কদর্থে বা ব্যঙ্গার্থে প্রচলিত দু'টি শব্দের উল্লেখ করি—কার্তিকের তত্ত্ব আরো ভাল করে বোঝবার জন্যে। শব্দ দু'টি হচ্ছে, লবাব আর লবকার্তিক। বর্তমানে যারা সাধ্যের অতিরিক্ত আড়ম্বর প্রকাশ করে, সবাই পরিহাস করে তাদের বলে—লবাব। কিন্তু বাস্তবিক লবাব কথাটি এসেছে নবাব থেকে—সেই নবাবরা কতদূর যোগ্য ছিলেন নবাবী করার বা আড়ম্বর প্রকাশ করার, তার প্রমাণ ইতিহাসেই পাই। ঠিক তেমনি ওই লবকার্তিক কথাটি তাদের প্রতি বিদ্রূপচ্ছলে প্রয়োগ করা হয়—যারা বেশী বাবুয়ানী বা সাজগোজ করে, বেশী স্ফুর্তি করে বেড়াতে চায়। এই কদর্থ থেকে যদি সদর্থে পৌঁছবার চেষ্টা করি—তা হলে বেশ বুঝতে পারি কার্তিক হচ্ছেন আনন্দের মূর্তিমান প্রতীক। সেই আনন্দ কেউই লাভ করে না—যদি সবায়ের সঙ্গে যোগযুক্ত হতে না পারে।

সেই ভাবে যিনি সবাইকে একত্র করে আনন্দ করতে পারেন, তাঁর মন তো সব সময় স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই তিন লোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়—তিনি যেন উড়েই বেড়ান। কে জানে, সেই সত্য বোঝাবার জন্যেই কার্তিককে ময়ূরবাহন করে তোলা হয়েছে কিনা ?

আবার এক কথা আনন্দ যাঁর উপজীব্য, তাঁর পক্ষে সংসারধর্ম করা একেবারেই সম্ভব হয় না। সেদিক থেকেও তো ময়ূরকেই কার্তিকের বাহন কল্পনা করার সার্থকতা আছে। প্রাণীবিজ্ঞানীরা জানেন ময়ূর কখনো সঙ্গম করে না— শুধু মেঘ দেখে নৃত্যই করে, একেবারে নির্লিপ্তের মত। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানীও যেমন সংসারে নিরাসক্ত, যোগীও তেমনি সংসারে নির্লিপ্ত। আর যোগী তো চিরকুমার ছাড়া কেউই হতে পারেন না—তাই কি কার্তিকের কোনই বীজমন্ত্র নেই ?

অন্যদিক থেকে বিচার করলে তো দেখি—কার্তিক হচ্ছেন ব্যোমতত্ত্বের প্রতীক। চতুর্বর্গের যে শেষ বর্গ মোক্ষ—তারও তো প্রকাশ হয় ব্যোম থেকে।

এখানে একবার জ্ঞানীর সঙ্গে যোগীর বা গণেশের সঙ্গে কার্তিকের একটু তুলনামূলক আলোচনা করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

॥ জ্ঞানী ও যোগীর পার্থক্য ॥

জ্ঞানী তো আপন ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন—তাতে অবশ্য সৃষ্টির কাজও তিনি করেন নিজেকে নিয়ে, ফলে ঐশ্বর্যও অনেক আয়ত্তে আসে তাঁর—কিন্তু যতক্ষণ যোগী হয়ে না ওঠেন তিনি, সবায়ের সঙ্গে ভোগ না করেন তাঁর সর্ব ঐশ্বর্য—ততক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ আনন্দ জাগে না। তাই দেখা যায় জ্ঞানীর চেয়ে বেশী আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন জনগণের ওপরে যোগী—যিনি সর্বদাই নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে সমুৎসুক।

আবার দেখি জ্ঞান তো দুর্বল মানুষও লাভ করতে পারে। কিন্তু যোগ বা আনন্দ সবল ছাড়া কারোরই লভ্য নয়। উপনিষদে পাই—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ॥

যোগীর চেষ্টা তো সেই আত্মাকেই লাভ করা; যাঁর স্বরূপ হচ্ছে আনন্দ। সেই আত্মানন্দকে লাভ করতে হলে পরমবীর্য প্রকাশ করতে হয়। কারণ যোগী তো কেবল সুখ নিয়ে আনন্দ করেন না, তিনি যে দুঃখ নিয়েও আনন্দ করেন—সে আনন্দ কি সহজে পাওয়া যায়? আর সুখ ও দুঃখ দুই অবস্থাতেই যিনি আনন্দে থাকেন, তিনিই তো মোক্ষলাভ করেন। সেই অবস্থা লাভ করার উপদেশই তো কৃষ্ণ দিয়েছিলেন অর্জুনকে গীতার মাধ্যমে—

দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ
সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ
স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ —২।৫৬

—যাঁর দুঃখে উদ্বেগ নেই, সুখে স্পৃহা নেই, কারো প্রতি অনুরাগ নেই, ভয় নেই বা ক্রোধ নেই—তাঁকে বলে স্থিতধী, মুনি।

মনে পড়ছে ইংরাজীর সেই কথাটি—"টু এন্‌জয় ইজ টু ওবে।" অর্থাৎ এই ভুবনকে ভোগ করতে পারা মানেই ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে পারা। বিশ্বভুবনের সব কিছু ভোগ করার শক্তি কি দুর্বল মানুষ লাভ করতে পারে? এ তো শুধু সমর্থ যোগী, যাকে তন্ত্রে বলা হয় দিব্যভাবসিদ্ধ পরম কৌলিক, তাঁরই সাধ্য।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই তো সেই সর্বভোগের কথা রয়েছে—তাতে পাই

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং
যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা
মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

—এই জগতে যা কিছু আছে সবই চলমান, কিন্তু সবেরই ভিতরে বাইরে আছেন ঈশ্বর। সুতরাং ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, লোভ করো না, এখানে ধন কারোর নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অর্থ করেছেন এই যে—ঈশ্বর যা ত্যাগ করেন, তাই ভোগ কর।

যে ভাবেই অর্থ করা হোক ওর মধ্যে ভোগের নির্দেশটুকু আছে। কিন্তু লোভ সম্বন্ধে নিষেধ করা হয়েছে। সাধারণত যারা ভোগী তারা লোভী হয়, ধনসম্পদ জমিয়ে রাখতে চায়—কিন্তু যোগী কখনো কিছু জমিয়ে রাখেন :না—এখানেই যোগীর ভোগবৃত্তির বিশেষত্ব। আর এই কারণেই যোগী বুদ্ধশুদ্ধনিত্যমুক্ত।

আর যে ভোগ্যবস্তর ভিতরে বাইরে ঈশ্বরের অবস্থান—তাতো প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের দান; সমস্ত ধনের অধিকারী তো সেই ঈশ্বর—তবে কেন আর ধন জমিয়ে মরা? সে ধন তো ফেলে রেখেই যেতে হয় সবাইকে।

আবার একটি কথা, ভোগ আর ত্যাগ একেবারে অচ্ছেদ্য। ত্যাগ না করলে ভোগ হয় না, ভোগ না করলেও ত্যাগ হয় না। আনন্দ মাত্রকেই বিশ্লেষণ করলে পাই উৎসর্গ বা ত্যাগ। তাই আনন্দ কেবল সুখ নয়, দুঃখজড়িত সুখ অথবা সুখদুঃখের সম অবস্থা। এই সত্য যিনি জানেন তিনি আর দুঃখেও উদ্বিগ্ন হন না, সুখেও মত্ত হন না। সর্ব অবস্থাতেই তিনি সাম্যরক্ষা করতে পারেন।

আর একটি কথা বলেই এ আলোচনার শেষ করি। আনন্দকে বিদ্যার বলে বহুগুণে গুণিত করা যায়। জ্ঞানী তো বিদ্যার ধার ধারেন না—তাই তাঁর কথা হয় স্বভাবত রুক্ষ কর্কশ—কে জানে, সেই আভাস দেখাতে গিয়েই গণেশের অমন অমানুষিক রূপ কল্পনা করা হয়েছে কিনা? বাস্তবিক স্বভাবজ্ঞানীর মধ্যে যেন পঙ্ককর্দমের গন্ধ পাওয়া যায়। যোগীর অবস্থা একেবারেই অন্যরূপ, তাই যোগীর সংস্পর্শে আসতে সবাই শ্লাঘা বোধ করেন। কারণ যোগী তাঁর বিদ্যা ও বিনয় গুণে মুগ্ধ করে দেন সবাইকে—দিব্যভাবের নানা কথা শুনিয়ে। হয়তো সেই সত্যকেই প্রকটিত করার জন্যে কার্তিকের মূর্তিকে অমন চিরনবীন যুবক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। যাঁকে দেখলে—যাঁর কথা শুনলেই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়।

॥ দেবী দুর্গার তত্ত্ব ॥

এবার স্বয়ং দেবী দুর্গার কথা বলি। তিনি হচ্ছেন ঐ গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিকের জননীস্বরূপা। ঐ দেবী বা শক্তি কৃপা করলে তবেই লাভ হয় জ্ঞান,, শ্রম, ঐক্য ও আনন্দ; লাভ হয় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ঐ শক্তি হচ্ছেন সত্যস্বরূপা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যমা—সবকিছুর মধ্যস্থলে তিনি অবস্থিত। একদিকে তাঁর পৃথিবী ও অপ্, অন্যদিকে মরুৎ ও ব্যোম আর মধ্যদেশে তিনি স্বয়ং তেজঃস্বরূপা।

সৃষ্টি ও পালনের ক্ষেত্রে ঐ তেজ, যার প্রকাশ সূর্যের মধ্যে সমধিক, সর্বদা ক্রিয়াশীল। বৈজ্ঞানিকরা বলেন ঐ তেজস্কর সূর্যই হচ্ছেন সর্বভূতের সৃষ্টির মূল কারণ। সৌরকরেই তো পৃথিবীর জল বায়ুপথে আকাশে গিয়ে জমে মেঘরূপে, আবার সেই সৌর-প্রভাবেই তা বৃষ্টিরূপে নেমে আসে, সমস্ত জীবসৃষ্টিকে রক্ষা করতে। বৈদিক সাহিত্যে তো সূর্যের এক নাম বিষ্ণু। পুরাণে সেই বিষ্ণুকে চতুর্ভুজ বলে কল্পনা করা হয়েছে। কে জানে—পৃথিবী, জল, বায়ু ও আকাশকেই বিষ্ণুর চতুর্বাহু বলে মেনে নেয়া হয়েছে কিনা? আর তাদেরকেই বৈষ্ণবদর্শনে যথাক্রমে, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব নামে চতুর্ব্যূহ আখ্যা দেয়া হয়েছে কিনা? যাই হোক, দেবী দুর্গাকে আমরা জানি বৈষ্ণবী শক্তি বলেই, যিনি দশদিক আচ্ছন্ন করে আছেন—তাই দশভুজা; তিনি সকলের সঙ্গে সকলের যোগস্থাপন করেন—তাই মহাযোগিনী; তিনি কোথাও পরাজিত হন না—তাই অপরাজিতা; তিনি সকলের মা, বিশ্বপ্রসবিনী—তাই অম্বিকা; তিনি চণ্ড মূর্তি ধারণ করেন, তাই চণ্ডী; তিনি কোষে কোষে বিরাজ করেন—তাই কৌশিকী। আবার প্রতিমার মধ্যে এমন স্থানে এমন মূর্তিতে তাঁকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যে—দুর্গাপ্রতিমার দিকে চাইলে প্রথমেই তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়ে।

॥ পশু কেন দেবীর বাহন ॥

তিনি শুধু অসুরদলনী নন, তিনি সিংহবাহিনী। পশু কেন দেবীর বাহন হলো—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে মনে পড়ে যে, তন্ত্রশাস্ত্র বিশ্বাস করেন যে মানুষ মাত্রেই পশু। তাই ভাবসাধনার প্রথমেই আছে পশুভাব। কিন্তু মানুষ কি পশু? এ সম্বন্ধে তো ইওরোপীয় পণ্ডিতজনেরাও বলেন—'ম্যান্ ইজ্ এ গ্রিগারিয়াস্ অ্যানিমল্।'

আত্মবিশ্লেষণ করলেই দেখি—আমার মধ্যেও আছে সেই আদিম পশু, অন্ধকারে যে নখদংষ্ট্রা প্রয়োগ করতে জেগে ওঠে। সে বন্য, বর্বর, হিংস্র, হন্তারক। কিন্তু তাকে যদি আমি একেবারেই বধ করে ফেলি, তা হলে তার সঙ্গে আমারও ধ্বংস হয়—জীব-সৃষ্টির পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। সমস্ত সংসার বৃদ্ধিলাভ করছে এই পশুর কল্যাণে। তাকে একেবারে বধ করলে—সমাজে আর শিশু দেখা দেবে না। সমস্ত সমাজ ভরে উঠবে বটে দেবতুল্য সন্ন্যাসীতে, কিন্তু তাঁদের জীবনাবসানেই শেষ হয়ে যাবে মনুষ্যসৃষ্টি। তাই তন্ত্র নির্দেশ দিলেন পশুকে বধ না করে, তাকে বশ করতে; যেন সে মানুষের বাহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে তাকে দেবত্বলাভের সুযোগ দেয়। সেই পশুকে বশ করাই তো মহাবীরের কাজ। মনে পড়ে তন্ত্রের আদি গুরু বশিষ্ঠের কথা—তিনি তো শত পুত্রের জনক ছিলেন—আবার নিয়োগবিধানে বহু রাজার বংশরক্ষার্থে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে সাহায্য করতেন।

প্রসঙ্গতঃ এসে যায় বশিষ্ঠের প্রতিযোগী বিশ্বামিত্রের কথা। তিনিই মনে হয় স্ত্রীরহিত ব্রহ্মচর্য পালন করার প্রথম পথিকৃৎ। কিন্তু তাঁর সেই সংকল্প মেনকার দর্শনে কি ভাবে ব্যর্থ হলো, তার উপাখ্যান তো লোকপ্রসিদ্ধ। পিতামাতার অস্বীকৃত শিশু শকুন্তলার জন্ম তো প্রকৃতপক্ষে সমাজের কলঙ্ক। ভাগ্যে কণ্বমুনি সেই পরিত্যক্ত শিশুটিকে দেখতে পেলেন, তাই কোন প্রকারে জীবন বাঁচলো শকুন্তলার। কিন্তু সে কথা থাক—যা বলছিলাম বলি।

আমরা জেনেছি যে তন্ত্রের সঙ্গে আয়ুর্বেদের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ। সেই আয়ুর্বেদে একটি বচন আছে—ন বেগান্ ধারণীয়াঃ॥ অর্থাৎ শারীরিক কোন বেগকেই ধারণ করতে বা রোধ করতে নেই। তার ফলে শরীর নষ্ট হয়ে যায়। তন্ত্রাচার্যরাও তাই স্বভাব বা প্রকৃতিকে রোধ করার পরামর্শ দেন নি। স্পষ্টতঃ বিধান দিয়েছেন—সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ॥ অর্থাৎ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই ধর্মাচরণ করা কর্তব্য।

অনেকে রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটি বিরূপ মন্তব্য করেন যে—তিনি তো নিজেই তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন জয়রামবাটিতে তাঁর পাত্রী আছে জানিয়ে, অথচ সেই তাঁর নিজের পছন্দ করা মেয়ে যখন তাঁর স্ত্রীরূপে এসে তাঁর কাছে পুত্র প্রার্থনা করলেন—রামকৃষ্ণ কেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন? কি ক্ষতি হতো যদি রামকৃষ্ণ একটি পুত্র উৎপাদন করতেন সারদাদেবীর গর্ভে?

ক্ষতি অবশ্য কিছুই হতো না—কিন্তু তন্ত্রের যে দিব্যভাবকে তিনি স্থাপন করতে এসেছিলেন—তা আর প্রতিষ্ঠিত হতো না। রামকৃষ্ণ তো স্থাপন করে গেলেন তন্ত্রের ঐ আদর্শকে—যাতে বলা হয়েছে স্ত্রীকে নিয়ে ধর্মাচরণ করতে হবে। সেই আদর্শের সর্বোচ্চ নিদর্শন প্রকটিত করে গেলেন তিনি সংসারী মানুষদের সামনে। দেখিয়ে দিলেন পশুকে বশ করে কি ভাবে তাকে বাহন করা যায় ও শেষে দেবত্বে উন্নীত হওয়া যায়, মোক্ষলাভ করা যায়।

অথচ অন্য সর্বদেশে সর্বশাস্ত্রেই বলেছে স্ত্রীসংসর্গ মানুষকে পশুত্বে নামিয়ে আনে। বাইবেলে দেখা যায়—কি ভাবে ইভের সংসর্গে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আদম স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হলো। অন্যান্য বহু কাহিনীই অমনি কথা জানায়। আমাদের পুরাণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো অজস্র কাহিনী আছে এই নিয়ে। তন্ত্রই কেবল বলেছেন—ধর্মাচরণ করতে হলেও স্ত্রী চাই—আমাদের দেশে স্ত্রীর অন্য নাম তাই সহধর্মিণী।

আগেই বলেছি পশুকে বধ করলে সৃষ্টির কার্য লোপ পায়। তাই পশুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বাহন করে, যেমন আছে সিংহ ঐ দেবী দুর্গার পদতলে। এ অবশ্যই অতি কঠিন কাজ। পশুকে বশ করতে, বিশেষ করে কাম-ক্রোধ-লোভ-রূপী পশুকে বশ করতে অত্যন্ত শক্তি আবশ্যক। কিন্তু মানুষের শক্তিও যে কম নয়। আজকে ঐ যে গোরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতিকে আমরা দেখি পোষমানা গৃহপালিত পশুরূপে ওরা কি এক দিনে বশ মেনেছিল মানুষের ? কি প্রচণ্ড শক্তি, কি বিপুল ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায়ে ঐ সব আদি বন্য জন্তুকে গৃহপালিত পশুতে রূপান্তরিত করতে হয়েছে—আজ আমরা তার কথা ভুলে গেলেও, সত্য যা, তা চিরকাল সত্যই থাকবে। মাঝে মাঝে তো পোষমানা বাঘ ও সিংহের খবরও পাওয়া যায়। আর সার্কাসেও দেখি—কি ভাবে অতি হিংস্র বন্য জন্তুরা মানুষের বশ মেনে খেলা দেখায়। এই অসম্ভব ব্যাপার তো সম্ভব হয়েছে মানুষের শক্তির বলে। সেই অদম্য শক্তি বলেই মানুষ পারে অন্তরস্থ কামরূপী অজা, ক্রোধরূপী মহিষ ও লোভরূপী মেষকেও সামলে রাখতে। আজকে যেমন ঐ গৃহপালিত জন্তুগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দিলেও তারা আর অরণ্যে ফিরে যেতে চায় না, ঠিক সেই ভাবেই আমরা আমাদের মনের পশুগুলোকে আমাদের বশে এনে তাদেরকে আমাদের বাহন করে তুলতে পারি। এই হলো তন্ত্রের বীরভাবের সাধনা। যার ফলে পশুভাবসাধনার থেকে উন্নত হয়ে সাধক উত্তরোত্তর দিব্যভাবের দিকে অগ্রসর হন। দেবী দুর্গার সিংহবাহিনী রূপের মধ্যে সেই তত্ত্বটি নিহিত।

॥ মহিষাসুরের তত্ত্ব ॥

মহিষাসুরের সম্বন্ধেও বলে নিই। আমরা তো চণ্ডী সপ্তশতী থেকেই জেনেছি, দানবের উত্থান আনে বাধা, অথবা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি যে—জীবনের বাধা যেখানে যা ব্যাহত করে প্রসারকে, তাই হচ্ছে দানব। কঠিন পণে যুদ্ধ করে সেই বাধা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে হয়। সে শক্তি যিনি যোগান, তিনিই তো দেবী দুর্গা। আবার এক কথা ঐ যে আমাদের অন্তরস্থ পশুদের কথা বলছিলাম—ওই পশুরাও আমাদের জীবন-সাধনার বিষম বাধা। সেই পশুদের থেকেই প্রকাশ পায় দানব। অন্ততঃ মহিষাসুর মহিষের রূপ ধরে প্রথম বাধা সৃষ্টি করেছিল, খড়্গাঘাতে শিরশ্ছেদ করতেই পশুর মধ্যে থেকে প্রকাশ পেলো দানব। অবশেষে তাকে নাগপাশ ও ত্রিশূলের সাহায্যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দমন করতে হলো। প্রতিমায় তো দেখি দেবী মহিষাসুরকে একেবারেই বধ করেন নি —শুধু তাকে আয়ত্তে রেখেছেন। একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে—আসুরী শক্তিই নির্বাহ করে জগতের যা কিছু বৃহৎ কর্ম, যদি দেবী তাকে একেবারেই লোপ করে দেন—তা হলে জগতে আর কর্মসম্পাদনের উপায় থাকে না। তাই দৈবশক্তি, যা কেবল জ্ঞান, তা কখনো আসুরীশক্তিকে বধ করতে চায় না। এ শিক্ষাও পাই ওই প্রতিমা থেকেই। চণ্ডী সপ্তশতীতেও এই আভাসই পাই যে—দেবী অসুরদের বা দানবদের তাঁর নিজের অঙ্গীভূত করে নেন। কথাটি অত্যন্ত অর্থবহ।

ঐ পশু বা দানব কি বাধার সৃষ্টি করে, তার কথাও বলি। তারা দেবতাদের বিচ্যুত করে স্বর্গলোক থেকে। অর্থাৎ প্রত্যেকের স্ব-ধারা, স্ব-ভাব ও স্ব-চ্ছন্দের স্বর্গকে দানবরা করে অত্যাচার, অন্যায় ও অন্তর্বিপ্লবের দ্বন্দে ক্লেদাক্ত, দেবতারা আর স্বস্থানে অবস্থান করতে পারেন না। পূর্ণশক্তি, পূর্ণপ্রজ্ঞা, পূর্ণসত্যের বলে সে বিষম বাধাকে পরাহত করলে তবে জাগে গতির বেগ। সেই গতিই যে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। ঈশ্বরের নাম দিয়েছি তাই আমরা 'অগতির গতি'। শুধু কি তাই ? সংসার বা সংস্থতির অর্থ তো সরে সরে যাওয়া, জগৎ শব্দের অর্থও গতি, আত্মারও অর্থ গতিবান্ বা বিশ্বশব্দের অর্থও তাই।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানও তো বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই গতিশীলতার কথা নিঃসংশয়ে প্রচার করেছে। সেই গতিবেগ আয়ত্তে এনেই তো মানুষের মহাকাশ যাত্রার উদ্যোগ সফল হচ্ছে। সেই গতি যখন বাধা পায়, তখনি তো জাগে দুর্গতি। সেই দুর্গতি হরণ করেন বলেই তো আমরা দুর্গাকে দুর্গতিহারিণী মা দশভুজা রূপে জানি। দশ হাতে মুক্তি আনেন তিনি দশ দিকে। জীবনে আর ভয় থাকে না, সংশয় থাকে না। জ্ঞানে, শ্রমে, সত্যে, ঐক্যে ও আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেন তিনি ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন সচরাচর নিখিল বিশ্ব লোক।

॥ দুর্গার বীজমন্ত্রের তত্ত্ব ॥

দেবী দুর্গার বীজমন্ত্র হচ্ছে হ্রীং। এই হ্রীং সংকেতটি কিসের নির্দেশ দেয় তার বিচার করা যাক। আধুনিক কালেই কি আর সেই অতি পুরাকালেই বা কি যাঁরাই চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা করেছেন—তাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন প্রাণীমাত্রেরই প্রধান শক্তিকেন্দ্র হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। তাঁদের কাছে আরো জানা যায় যে, হৃৎপিণ্ড ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গিয়েছে—তার অভ্যন্তরে একটি শূন্যস্থান আছে—যার পরিমাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা আয়তন অঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্বের তুল্য। অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ প্রাণপুরুষ প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন—এ সত্য বহুদিন থেকেই আমাদের দেশে বিদিত। কঠোপনিষদে পাই—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো
মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি॥ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ শরীরের মধ্যভাগে অবস্থান করেন।

তন্ত্রের মতে ঐ হৃৎপিণ্ডকেই তো অনাহত পদ্ম বলা হয়। ঐ পদ্ম থেকেই নির্গত হয় অনাহত নাদ—যে ধ্বনি শোনবার জন্যে ঐকান্তিক সাধনা করেন তান্ত্রিক ও যোগীরা। সেই হৃৎপিণ্ড তো সর্বদা চলমান—তার গতিশব্দটি কানে ধরতে পারলে তবে সাধনার পথ প্রশস্ত হয়। ঐ সব সাধক তো হৃৎপিণ্ডের গতিকেও রুদ্ধ রাখার ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু সাধনার কথা যাক। উপস্থিত চিকিৎসাবিজ্ঞানে যা প্রকাশ আছে, তারি আলোচনা করি।

এই সদা গতিশীল হৃৎপিণ্ডটাই হচ্ছে আমাদের জীবিত থাকার একমাত্র নির্ভর ও চিহ্নস্বরূপ। ঐ গতি কোন কারণে বন্ধ হলেই—দেহীর মৃত্যু ঘটে। অবশ্য সাধকদের ক্ষেত্রে নয়—তার আভাস তো আগেই দিয়েছি। আমরা কেবল সাধারণ মানুষের সম্বন্ধেই বলছি কথাটা।

আবার দেখা যায়—যদি হৃৎপিণ্ডের গতি কোন কারণে অনিয়মিত হয়, ছন্দের ব্যাঘাত জাগে ঐ দোলকটির—সেও তো চিকিৎসকদের মতে অতীব দুর্লক্ষণ। তার ফলে মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। ওদিকে পূজাপদ্ধতির পর্বে আমরা তো জেনেছি যে—এই হৃৎপিণ্ড বা হৃদয়গুহার মধ্যেই জাগে আমাদের সার সত্য বা সার ধর্ম। তাই হৃদ্‌যন্ত্র কোন যদি কারণে সামান্য মাত্র বিকার লাভ করে বা দৌর্বল্য লাভ করে—তা হলে আর দেহীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ আহরণ করা বা কোনো কিছুতে কোনো সার্থক সিদ্ধি লাভ করা। সমাজে তো নানা উৎপাৎ সৃষ্টি করে দুর্বল হৃদয় বা চিত্তের মানুষরা, এ সত্য মনোবিজ্ঞানীরা জানেন।

গীতায় দেখি—যুদ্ধবিমুখ অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন—

ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং
ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ অর্থাৎ হে পরম তপস্বী হৃদয়-দৌর্বল্য আনে ক্ষুদ্রতা, নীচতা—সেটি ত্যাগ করো।

এই হৃদয়ের দুর্বলতাই তো মানুষকে ক্লীব করে দেয়। মানুষ হয়ে যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষণ্ণ, আতংকিত। তাই দরকার একান্ত তপের দ্বারা সেই হৃদয়ের দুর্বলতা পরিহার করা।

রামায়ণেও তো দেখি—যখন সাত দিন সাত রাত্রি অবিশ্রাম যুদ্ধ করেও রাম রাবণকে পরাস্ত করতে পারলেন না—তাঁরও দেখা দিল ঐ হৃদয়-দৌর্বল্য। শেষে অগস্ত্য মুনি এসে তাঁকে 'আদিত্য-হৃদয়' স্তোত্র পাঠ করতে শেখালেন—অর্থাৎ আদিত্য বা সূর্যবংশের ছেলে রাম ভুলেই বসেছিলেন তাঁর স্বভাব—তাই প্রয়োজন হলো তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে—তিনি কত বড় বংশের ছেলে—তাঁর হৃদয়-দৌর্বল্য সাজে না। তাঁর নিজেরি মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং আদিত্য। আদিকবি বাল্মিকীর ভাষায় পাই—

ততো যুদ্ধ পরিশ্রান্তং
সমরে চিন্তয়া স্থিতম্।
রাবণঞ্চাগ্রতো দৃষ্ট্বা
যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্॥
দৈবতৈশ্চ সমাগম্য
দ্রষ্টুমভ্যাগতো রণম্।
উপাগম্যাব্রবীদ্রামম্
অগস্ত্যো ভগবাংস্তদা॥
রাম রাম মহাবাহো
শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
* * * *
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং
সর্বশত্রুবিনাশনম্॥

—তখন রাম যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চিন্তিতভাবে অবস্থান করছিলেন। ওদিকে দেখছিলেন রাবণ তাঁর সামনে যুদ্ধ করার জন্যে উপস্থিত। আর দেবতারাও সবাই তাঁদের যুদ্ধ দেখবার জন্যে সমাগত। সেই সময় ভগবান অগস্ত্য রামের কাছে এসে বললেন—"হে মহাবাহু রাম, শোন—তোমায় অতি গুহ্য, সনাতন ও পবিত্র আদিত্য-হৃদয় স্তোত্র শোনাচ্ছি—এটির প্রভাবে সমস্ত শত্রুনাশ করা যায়।

আদিত্যহৃদয় বললেও তো বোঝায় আদিত্যের হৃদয়মধ্যস্থ শক্তিকেই। মনে পড়ে যায় নারায়ণের ধ্যান-মন্ত্র—তাতে পাই—ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী॥ অর্থাৎ নারায়ণকে সর্বদা ধ্যান করা উচিৎ সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্তী রূপে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবীকেও তো চণ্ডী সপ্তশতীতে 'নারায়ণী' বলে নমস্কার জানানো হয়েছে—তিনিই তো পরমাবৈষ্ণবীশক্তি, যা আদিত্যের মধ্যদেশে বিরাজিত।

যাই হোক—বাধার প্রভাবেই জাগে আমাদের হৃদয়ে সংকোচ—সেই সংকোচকে দূর করার উপায় ঐ হৃদয়ের মধ্যে যে শক্তি আছেন—তাঁরই সাধনা করা। সে কথা তান্ত্রিক সাধকরা জানতেন। ইংরাজীতেও তো শোনা যায়—'টেক হার্ট' কথাটি। যখন কোনো কাজে কেউ পেছিয়ে পড়ে—তখন তাকে উৎসাহ দেবার জন্যেই তো বলা হয়—'টেক হার্ট'!

প্রসঙ্গত মনে পড়ে সাধক রামপ্রসাদের গান—

হৃদ্‌কমল মঞ্চে দোলে
করালবদনী শ্যামা॥

শক্তিকে জাগাতে হলে, সত্যকে পেতে হলে আমাদের তো একান্ত সম্বল এই হৃদয়। আর সেই হৃদয় শব্দের প্রথম অক্ষর তো 'হৃ', তাকেই কি স্ত্রীপ্রত্যয় করে দেবী দুর্গার বীজমন্ত্র 'হ্রীং' নিষ্পন্ন হয়েছে?

সেই হৃদয়শক্তির সাহায্যেই তো মানুষ লাভ করে চতুর্বর্গ—সেই তো জীবনে সত্য-স্বরূপ। সেই তত্ত্ব বোঝাবার জন্যেই কি দেবী দুর্গাকে গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিকের জননীরূপে কল্পনা করা হয় নি?

॥ দুর্গা—দুর্গ সম্বন্ধ বিচার ॥

কিন্তু এতো গেল দুর্গা প্রতিমার ভাবগত ব্যাখ্যার দিক। এবার একবার দেখা যাক্ কোন প্রত্যক্ষ বস্তুকে বিচার করতে করতে দেবী দুর্গার ঐ মহিমময়ী রূপ পরিকল্পিত হলো। আগেই তো আমরা দুর্গা সম্বন্ধে এইটুকু জানতে পেরেছি যে—দুর্গা শব্দটির সঙ্গে দুর্গ শব্দটির রীতিমত সম্পর্ক আছে।

অগ্নিপুরাণে তো দুর্গ সম্বন্ধে বহু সন্ধানই আমরা পাই—যার কথা আগেই বলেছি—কিন্তু প্রশ্ন জাগে এই যে—দুর্গাপূজা তো বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য—সেই বাংলায় কি কোনো কালে দুর্গ ছিল? দেখি, ইতিহাস কি বলে?

কিন্তু তার আগেই বলি ঐ যে তন্ত্রবিদ্যা, যার প্রকাশ ঘটেছে গৌড় থেকে—তার মূল কথা হচ্ছে শক্তিসাধনা; যে শক্তি বলে সাম্রাজ্য বিস্তার করা যায়। ইতিহাসে যে যুগে বাংলার নাম ছিল—গৌড়—সে যুগে সত্যিই বাঙালীর বিশাল সাম্রাজ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল। তখন বাঙালী তো ভারত-দ্বীপপুঞ্জেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল—এ কথাও প্রামাণ্য সত্য। বাংলার সেই গৌরবের দিন যদিও অস্তমিত হয়েছে—তবু শক্তিপূজার ধারা বিচ্ছিন্ন হয় নি, লুপ্ত হয় নি শক্তিলাভের অদম্য কামনা। তাই বাঙালী তথা বাংলার সম্বন্ধে অনেক কিছুই আশা করার আছে।

এখন দুর্গা ও দুর্গের সম্বন্ধবিচার নিয়ে—যা বলার আছে বলি। কোনো সাম্রাজ্য যখন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সেই দেশের অধিপতি কি ভাবে দুর্গবিন্যাস করেন—আমরা জানি। দেশের তাবৎ প্রজাকে তখন তিনি আশ্রয় দেন দুর্গ-মধ্যে, যারা কৃষি বা শ্রমজীবী, যারা বাণিজ্যজীবী, যারা বিদ্যাজীবী এবং যারা যুদ্ধজীবী সবাইকে দুর্গ মধ্যে টেনে নিয়ে—দুর্গের ভিতর থেকেই শত্রুকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করেন—দুর্গা প্রতিমার মধ্যে তো ঠিক সেই সত্য প্রকটিত। গণেশ যেন ওই কৃষিজীবী-শ্রমজীবীদের প্রতীক, লক্ষ্মী বাণিজ্যজীবীদের, সরস্বতী বিদ্যাজীবীদের আর কার্তিক যুদ্ধজীবীদের প্রতীক। স্বয়ং দেবী হচ্ছেন অতন্দ্রিত রাজশক্তির প্রতীক, যিনি সবার ওপরে প্রভুত্ব করছেন। অর্থাৎ একটি দুর্গের মধ্যে সমবেত শক্তির মহিমা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেই—দেবী দুর্গার মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে—এই সত্যই তো দুর্গা প্রতিমার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

বাংলার সঙ্গে দুর্গরচনা-বিদ্যার যোগ অতি প্রাচীনকাল থেকে। তার প্রমাণ ঐ অগ্নিপুরাণ। অগ্নিপুরাণের বক্তা স্বয়ং অগ্নি, আর শ্রোতা বশিষ্ঠ। এই বশিষ্ঠ যে অথর্বার একটি উপাধি—তার আলোচনা করেছি—'বেদ পরিচয়' গ্রন্থে। সেই অথর্বাই প্রথম অগ্নিমন্থন বিদ্যা আবিষ্কার করেন। আবার অথর্ববেদ থেকেই তো তন্ত্রের উদ্ভব। পরবর্তী যুগে অর্থাৎ অথর্বা বশিষ্ঠ উপাধি পাবার পরেই তন্ত্রের বহুল প্রচার ও প্রসার হয়—তাও আমরা জানতে পাই। আরো একটি সন্দেহ করার অবকাশ আছে যে—শিব আর বশিষ্ঠ এক ও অভিন্ন। শিবের কপাল থেকে আগুন বের হয়েছিল—এই পুরাণকাহিনীর মধ্যে কি এই সত্যই নিহিত নেই যে—শিবের উদ্ভাবনী শক্তিতেই অগ্নির আবিষ্কার? শিবের আর এক নাম তো প্রমথনাথ—এর সঙ্গে গ্রীক-পুরাণের প্রমিথিয়াস নামটির যেন কেমন যোগ রয়েছে মনে হয়—সেই প্রমিথিয়াসই গ্রীস দেশে অগ্নির প্রথম আহরণ কর্তা। কিন্তু সে কথা থাক।

আসলে অগ্নিই হচ্ছে প্রকৃত শক্তি। এই অগ্নিকে মানুষ ইচ্ছামত জ্বেলে নিয়ে কাজে লাগাতে পারে—তাই অগ্নি-আবিষ্কারের ফলে মানুষ হয়ে উঠলো আরো শক্তিমান। মণ্ডুক উপনিষদে তো অগ্নিরই এক জিহ্বার নাম 'কালী'। সেই অগ্নি আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যেই অবস্থিত—সে সত্যও প্রকটিত হয়েছে উপনিষৎ ও তন্ত্রের মাধ্যমে। আর বশিষ্ঠই তো তন্ত্রের প্রবক্তা।

সেই বশিষ্ঠগোত্রের মানুষরাই যে একদিন বাংলায় প্রাধান্য লাভ করেছিলেন—তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। কে জানে—তাঁদের চেষ্টাতেই বাংলার সর্বত্র শিব ও পঞ্চানন্দের মন্দিরের এতো ছড়াছড়ি কিনা? বাস্তবিক বাংলায় যত শিবমন্দির আছে এতো আর কোন প্রদেশেই নেই। প্রসঙ্গত এসে পড়ে তারাপীঠের কথা। বীরভূমের সেই ক্ষেত্রটি স্বয়ং বশিষ্ঠের স্থাপিত বলে জানা যায়। আবার ওদিকে কামরূপ কামাখ্যায়ও একটি বশিষ্ঠ-আশ্রম আছে। সেদিনের বাংলার যে সমগ্ররূপ ছিল—তাতে তো বিহার, বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসাম বিরাজ করতো এক ছত্রতলে। আর নেপালের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বাংলার। বাংলার ছেলে অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান তো সেদিন দুস্তর হিমালয় পার হয়ে পৌছেছিলেন তিব্বতেও। তন্ত্রমতে যে একান্নটি পীঠস্থান তীর্থরূপে গণ্য তার মধ্যে একুশটি অবস্থিত নেপাল, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে। সব থেকে রহস্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, তন্ত্রমতে যতগুলি পীঠস্থানের উল্লেখ পাই—সেগুলির ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করলে বেশ বোঝা যায় যে—তার প্রত্যেকটি হচ্ছে দুর্গনির্মাণের যোগ্য স্থান। যেমন মরুতীর্থ হিংলাজ—সে তো চমৎকার সীমান্তদুর্গের স্থান, কালীঘাট নাদেয় দুর্গের স্থান, কামাখ্যা পার্বত্যদুর্গের স্থান—ইত্যাদি।

॥ পীঠস্থানউৎপত্তির রহস্য ॥

স্বভাবতই এখানে মনে জাগে তন্ত্রোক্ত পীঠস্থানগুলির উৎপত্তিসম্বন্ধে যে উপাখ্যান পাই তন্ত্রাদিতে, তার কথা। উপাখ্যানটি এই—

প্রজাপতি বা রাজা দক্ষের কন্যা ছিলেন সতী। তিনি ছিলেন কৃষক প্রজা শিবের প্রতি আসক্ত, শেষে বিয়েও করেন শিবকে। শিব কিন্তু সামান্য ব্যক্তি ছিলেন, রাজা দক্ষের মতে। তাই তিনি শিবকে অপমান করার জন্যে মুনিগোষ্ঠীর ভৃগুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেন। বিনা নিমন্ত্রণেই সতী এসে বাপকে এ অনুচিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বললেন। দক্ষ তাঁর কথা কানে নিলেন না। উলটে নানা কটূক্তি করতে লাগলেন শিবের সম্বন্ধে। পতিনিন্দা শুনে সতী করলেন দেহত্যাগ। শিব তখন সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেন। দক্ষযজ্ঞ তো ধ্বংস হলোই, দক্ষের মুণ্ডও ছিন্ন হলো।

তখন বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে সতীর মৃতদেহ একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত করলেন। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খণ্ডগুলি যেখানে যেখানে পড়লো, সেখানে সেখানে জেগে উঠলো তান্ত্রিক পীঠস্থান।

এর থেকে বেশ রহস্যের আভাস পাওয়া যায়। সতী বা দেবী যে স্বয়ং পৃথিবী, তা আমরা জানতে পেরেছি—প্রজাপতি বা রাজা দক্ষ তাঁর শাসক বা পিতা ছিলেন বটে—কিন্তু গণপতি বা কৃষক শিব ছিলেন পৃথিবীর প্রকৃত ভর্তা বা স্বামী। দক্ষ চেষ্টা করলেন আর্যমতে কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে কৃষককে বাদ দিয়ে—তার ফলে পৃথিবী গেল মরুভূমি হয়ে। সেই শস্যহীনা পৃথিবীকে শিব চাইলেন নিজ শক্তিতে সঞ্জীবিত করতে। কিন্তু বিষ্ণুচক্র বা আর্যচক্রান্তে শিবের সেই প্রাগার্য চেষ্টা হলো খণ্ডিত। তবু সেই খণ্ড নিয়ে তান্ত্রিকজনেরা তথাকথিত বৈদিক ধর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে নানাস্থানে দুর্গরচনা করেছিলেন। কালবশে সেই শেষচেষ্টাও ব্যাহত হয়। সমগ্রদেশ আর্যদের অধিকারে আসে। লুপ্ত হয়ে যায় সেই অনার্য বা প্রাগার্য তন্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু সেই পূর্বস্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার অবচেতন চেষ্টা এখনো হিন্দুরা করে চলেছেন তান্ত্রিক পীঠস্থানগুলিকে তীর্থরূপে গণ্য করে। অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

কিন্তু কালীঘাটে দেবীর পাদাঙ্গুষ্ঠ আর মরুতীর্থ হিংলাজে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল এর অর্থ কি? এই কি তবে সত্য যে তান্ত্রিকজনের বা গণশক্তির অভ্যুত্থানের সেই পদসঞ্চার দক্ষিণ-পূর্ব কালীঘাটে শুরু হয়ে উত্তর-পশ্চিমে হিংলাজে পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল? থাক ও কথা।

তন্ত্রোক্ত পীঠস্থানগুলি নিয়ে তো বিশেষ চর্চা করার কোনো সুযোগই নেই প্রত্নতাত্ত্বিকদের—কারণ সেই সব তীর্থস্থানে খননবিদ্যা প্রয়োগ করতে দিতে কিছুতেই সম্মতি দেবেন না হিন্দু জনসাধারণ। তা যদি সম্ভব হতো—তা হলে আরো ঐতিহ্য জানা যেতো তন্ত্রসাধনার। কিন্তু সেভাবে কোনো প্রত্নতত্ত্বাদি সন্ধান করা আদৌ সম্ভব নয়।

এখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছে হয়, কার্ল মার্কস্ ক্যাপিট্যালিষ্ট্ প্রোডাক্‌শান্-এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে "মেশিনারী অ্যাণ্ড্ মডার্ণ ইণ্ডাস্ট্রি" অধ্যায়ে যা বলেছেন—

"ক্যাপিটালিষ্ট্ প্রোডাকশান্, দেয়ারফোর, ডেভেলেপ্স্ টেকনোলজি, অ্যাণ্ড দ্য কম্‌বাইনিং টোগেদার অব্ ভেরিয়াস প্রসেস্ ইন্‌টু এ সোস্থাল হোল্, ওন্‌লি বাই স্যাপিং দ্য অরিজিন্থাল সোর্সেজ্ অব্ ওয়েলথ্—দ্য সয়েল্ অ্যাণ্ড দ্য লেবার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ শুধু কর্মীকে নয় ভূমিকেও নষ্ট করে অতি-বৈজ্ঞানিক উৎপাদন পদ্ধতি। তাই কি দক্ষ করতে চেয়েছিলেন শিবকে বাদ দিয়ে ?

॥ তান্ত্রিক যন্ত্র ॥

এখানে তন্ত্রশাস্ত্র দর্শিত যন্ত্রগুলির কথারও উল্লেখ করতে হয়। যাঁরা স্থাপত্যবিদ্যার রেখাচিত্রবিশারদ–তাঁরা যদি নিরীক্ষণ করে দেখেন তান্ত্রিক যন্ত্রগুলির রেখাচিত্রকে—তা হলে ভালই বুঝতে পারবেন যে, সেগুলি দুর্গনির্মাণের নকশা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই যন্ত্রের প্রত্যেকটির চতুর্দিকে চতুর্দ্বার সমন্বিত—সম্মুখ প্রশস্ত গোপুরের তুল্য—মধ্যে হ্রস্ব—আর ক্রমে যতই অভ্যন্তরের দিকে যাওয়া যায়—দেখা যায় কি বিচিত্র পথের মধ্যে দিয়ে মূলকেন্দ্রে পৌঁছতে হয়। আমরা জানি—দুর্গনির্মাণের কৌশলও ঠিক তাই—যাতে দুর্গদ্বার ভেঙে ফেললেও শত্রু সহজে দুর্গের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছতে না পারে—তার জন্যে বিশেষ বিশেষ পথ ও সুড়ঙ্গাদি দিয়ে দুর্গকেন্দ্রকে যুক্ত করতে হয়।

এখানে আবার একবার প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের শরণ নিচ্ছি। তাঁর লেখা "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস"—গ্রন্থে চণ্ডীমঙ্গল পাঞ্চালীর ভূমিকায় পাচ্ছি—

"দুর্গ শব্দের মানে বদলাইবার ফলে দেবী দুর্গার দুই রূপ দেখা গেল। এক, পর্বত-দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী, যোদ্ধ্রী—দুই, মরুকান্তারবাসিনী, পালয়িত্রী।"

॥ দুর্গগঠন—অনার্য বা প্রাগার্য পদ্ধতি ॥

এই দুর্গগঠনের পদ্ধতি কিন্তু আর্যদের অজ্ঞাত ছিল বলেই মনে হয়। কারণ আর্যরা তো ছিলেন যাযাবর জাতি, তাঁরা বুঝতেন শিবির বা স্কন্ধাবার। একস্থান থেকে অন্য-স্থানে যাঁদের চলে বেড়াতে হতো, তাঁদের পক্ষে স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করার প্রয়োজনই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ভূমির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তাঁরা সেইটুকুই মাত্র সঙ্গে রাখতেন আশ্রয় হিসেবে—যা তাঁরা কাঁধে করে বা পালিত পশুর পিঠে চাপিয়ে সহজেই একস্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারতেন। কোনো গৃহ বা মণ্ডপ বা দুর্গ সে ভাবে স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আর্যরা তো ছিলেন দুর্গ মাত্রেরই, গৃহ মাত্রেরই শত্রু। তাঁদের প্রধান দেবতা পুরন্দর তো পুর বিদারণ করেই ওই উপাধি লাভ করেছিলেন। সেই তো ছিল আর্যদের ইন্দ্রত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত স্বভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসঙ্গতই মনে পড়ে যায় দ্রাবিড়দের কথা। ঐতিহাসিকরা তো মনে করেন যে—আর্যরা ভারতে আসার ঢের আগে থেকেই দ্রাবিড়রা এই খানে বাস করতেন, তাঁরা জানতেন নগর বা পুর নির্মাণ করতে—তাঁরাও ছিলেন আদিকালের সুমেরিয়াবাসীদের মত কৃষিজীবী। ইওরোপেও তো কৃষিজীবী গ্রীকরাই প্রথম স্থাপত্যবিদ্যার চর্চা করেন বলে শোনা যায়। যাই হোক, এই ভারতবর্ষে দ্রাবিড়সভ্যতার অবদান পুর ও দুর্গ প্রভৃতিকে আর্যরাই যে ধ্বংস করেন প্রথম দিকে, ঐতিহাসিকরা তাই বিশ্বাস করেন। অথচ মজা এই যে—অবশেষে সেই অনার্যসুলভ স্থাপত্যকে আর্যরাও ক্রমে গ্রহণ করেন—অর্থাৎ বিজেতেরা বিজিতদের কাছেই স্থাপত্যবিদ্যার পাঠ নেন। ঠিক যেমন নিয়েছিলেন রোম্যানরা গ্রীকদের কাছে।

কিন্তু গৃহের মূল প্রয়োজন কি তার কথাও এখানে বলতে হয়। গৃহ শব্দের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে - যেখানে সব কিছু গ্রহণ করা হয়। কি গ্রহণ বা রক্ষণ করা হতো সেই আদিযুগের গৃহে ? বেশ মনে হয় কৃষিজীবীরা উৎপন্ন শস্যকে সুরক্ষিত করার জন্যেই গৃহের প্রয়োজন অনুভব করেন। শস্য অনাবৃত স্থানে পড়ে থাকলে রৌদ্র, জল ও বায়ুর প্রভাবে আর খাদ্য থাকে না। তাই শস্যকে সঞ্চয় করে রাখার জন্যে আবৃতস্থান বা গৃহের উদ্ভাবন করেন প্রথমে কৃষিজীবীরাই। আমরা জানি সেকালে গৃহের বাতায়ন বলতে থাকতো শুধু ছোট ছোট গবাক্ষ—যা কেবল শস্য রক্ষার উপযোগী আলো ও হাওয়ার চলাচলের পথ ছিল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষ তো বদ্ধ ঘরের মধ্যে রাত্রি যাপন করার চেয়ে—বেশী আনন্দে থাকেন ঘরের বাইরেই শয়ন করতে পেলে। তাই প্রথম যুগের গৃহ ঠিক মানুষের বাসের উপযোগী করে তৈরি হতো না। ক্রমে অবশ্য গৃহ-নির্মাণপদ্ধতির বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে—এ তথ্য জানেন স্থাপত্যবিদ্যার অধিকারীরা।

মোটকথা—আদিযুগে স্থাপত্যবিদ্যার চর্চা যে অনার্য বা প্রাগার্য মানুষরাই করতেন—তার প্রমাণ কেবল ঐ মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পার খননে প্রাপ্ত পুর ও নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই নেই—আমাদের দেশের পুরাণ-কাব্যাদিতেও আছে।

রামায়ণে পাই রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁর সুরক্ষিত দুর্গ লংকায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। হনুমান যখন প্রথম লংকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন—তাঁকে লংকিনীর সম্মুখে পড়তে হলো। সেই লংকিনী কে ? বাল্মীকি যেভাবে লংকিনীর বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তো বেশ বোঝা যায়—লংকিনী হচ্ছে লংকাদুর্গের সদা জাগ্রত শক্তি—রাত্রেও যে শক্তি অবহিত হয়ে লংকাগড় রক্ষা করতো। সেই লংকাদুর্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাল্মীকি তার তোরণাদির যে যান্ত্রিক সাজ-সজ্জার বিবরণ দিয়েছেন—তা থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালই জানা যায় যে—স্থাপত্যবিদ্যায় কতো উন্নত ছিলেন রাক্ষসেরা। শেষ পর্যন্ত রাম যখন সসৈন্যে লংকায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে লংকার চার দিকের চারটি দ্বার অবরোধ করে বেশ কয়েকদিনই প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছিল—শেষে নানা কৌশলে রাবণকে তিনি দুর্গের বাইরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। তাও তো দেখা যায় যে, প্রথম দিকে যুদ্ধ হয়েছিল দুর্গের প্রাকারে সজ্জিত রাক্ষসসেনাদের সঙ্গে। এর থেকে কি এই সত্যই প্রকটিত হয় না যে দুর্গপ্রাকার কেমন বিস্তৃত ছিল—যার ওপরে সৈন্যসমাবেশ করাও সম্ভব ছিল? তুলনা করতে ইচ্ছে হয় না কি বিশ্ববিখ্যাত চীনের প্রাচীরের সঙ্গে?

মহাভারতের যুদ্ধে কিন্তু লড়াই হয়েছিল বিস্তৃত, অবারিত রণভূমি কুরুক্ষেত্রে—দুর্গের কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। হয়তো আর্যনীতি অনুযায়ী যুদ্ধ হয়েছিল বলেই অমন ব্যবস্থা। কিন্তু সেই যুদ্ধও শেষ হয়েছিল অকাল বা দক্ষিণায়নের সময়—তাই উত্তরায়ণের অপেক্ষায় ভীষ্মকে শরশয্যায় পড়ে থাকতে হয়েছিল সেই উন্মুক্ত রণস্থলেই। দুর্যোধনও গদাহত হয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। দুর্গের কোনই উল্লেখ তো পাই না। শুধু তাই নয়—যখন ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবরা নতুন প্রাসাদ তৈরি করাতে চাইলেন—তার ভার দিলেন তাঁরা দানবশিল্পী ময়কে! অর্থাৎ স্থাপত্যবিদ্যা তখনও ছিল দানব বা অনার্যদের অধিকারে। ওদিকে কিন্তু মগধের রাজা জরাসন্ধের দুর্গ ছিল। তিনি ছিলেন কৃষ্ণের বৈরী। ধর্মসংস্থাপন করার জন্যে কৃষ্ণ তো শেষ পর্যন্ত ছলনা করে জরাসন্ধকে বধ করেন কেন না কৃষ্ণের মতে তিনি ছিলেন অধার্মিক বা অনার্যেরই আর এক সংস্করণ। মনে রাখা দরকার যে, মগধ ছিল বহুযুগ ধরে বৃহৎ বঙ্গের রাজধানী।

বিভিন্ন পুরাণেও তো দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ পাই।

এতো কথা বলার পরে এই প্রশ্নই তো মনে জাগে যে—বাঙালীরা কি ভাবে পেল দুর্গের তথ্য? বাঙালির কি কোন দিন রাজ্য ছিল, সৈন্য-সামন্ত ছিল, দুর্গাদির প্রয়োজন ছিল? বর্তমান যুগে তো এই প্রবাদই রটে গিয়েছে যে—'বাঙালীরা কেবল কাঁদতে জানে'। কিছুদিন আগেও তো ইংরেজরা বলে গিয়েছে যে—বাঙালী দুর্বল, ভীরু, স্বার্থপর, হীন আরো কত কি! তবে তাদের পক্ষে কি করে সম্ভব হলো দুর্গের কল্পনা তথা সমবেত শক্তির প্রতীকরূপে দুর্গার পরিকল্পনা করা? কি করেই বা রটে গেল যে—'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা ॥'?

কিন্তু বাঙালীর কি শক্তি ছিল তার পরিচয় তো ক্রমশই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিকদের নানা খননে প্রাপ্ত 'পাথুরে' প্রমাণ থেকে। আজকে জানা যাচ্ছে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিমালয়ের থেকে বিন্ধ্য যেমন প্রাচীনতর পর্বত, তেমনি অন্যান্য প্রদেশের থেকে এই বাংলা শক্তিমত্তর ও আদিমতম ভূসংস্থান, তার প্রমাণ কয়লার খনিই। দুঃখ এই যে বাঙালী আত্মবিস্মৃতি জাতি। পলিমাটির দেশ বাংলা যেমন অতীতের ওপর কেবলি পলির আস্তরণ ঢেলে দিচ্ছে—এ প্রদেশের অধিবাসী বাঙালীও তেমনি নিত্য নতুনের আগ্রহে মেতে পুরাণকে ভুলে যাচ্ছে। দেখা যাক—প্রাচীনকালের ইতিহাস ঘেঁটে বাঙালীর কি পরিচয় জানতে পারা যায়।

॥ দুর্গের তথা তন্ত্রের তথ্য বিচার—ইতিহাস মতে ॥

প্রথম বলি ঐ গৌড়ের কথা। আমরা জানি, বাংলাদেশের গৌড় নাম বিখ্যাত হয় পালযুগে। সেই পাল বংশ কি ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তার কথা জানতে পাই ইতিহাসে। তখন বাংলায় চলছিল মাৎস্যন্যায়—প্রবলের অত্যাচারে দুর্বল পীড়িত হচ্ছিল সর্বত্র। সেই ঘোর অন্ধকার যুগে বাংলার মানুষ সবাই একত্রিত হয়ে নায়ক নির্বাচন করলেন গোপাল দেবকে। সংহত শক্তি, যাকে বর্তমান কালের নানা বুদ্ধিবাদী 'দ্য মব্' বা 'অ্যাংরী ইয়ং মেন' বলে বিদ্রূপ করেন—সেই তথাকথিত জনতার কি শক্তি, তারি বিচিত্র তথ্য জেগে আছে ইতিহাসে ঐ গোপাল দেবের নির্বাচনকাহিনীর মধ্যে।

সেই পালবংশ ছিলেন বৌদ্ধধর্মবিশ্বাসী—কিন্তু অন্য কোনো ধর্মের প্রতি কোনো বিদ্বেষ তাঁরা পোষণ করতেন না। সংহতির মূল মন্ত্র যে সমন্বয় তা তাঁরা ভাল করেই বুঝতেন, তাই তো পালযুগ বাংলার স্বর্ণযুগ বলে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেই যুগের স্থাপত্য-বিস্তার কিছু পরিচয় আজও তো জেগে আছে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের ভগ্নস্তূপের মধ্যে। ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে—অমন স্থাপত্যকীর্তি ভারতের অন্যত্র অল্পই আছে। সব থেকে বড় কথা সেই বিহারের নির্মাণরীতি দুর্গনির্মাণের রীতি থেকে একেবারেই অভিন্ন। সেই যুগেই তো বাঙালী সমুদ্রশাসন করে বেড়াতো তারও প্রমাণ ইতিহাসে পাই। সেই সূত্র ধরেই কি ঐ "গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা॥"—প্রবচনটি জেগে উঠেছে? এ প্রশ্ন রাখছি বিশেষজ্ঞদের সামনে—তাঁরা দয়া করে এর সমাধান করুন।

কিন্তু পালযুগ তো খ্রীষ্টীয় শতকের ইতিহাস। খ্রীষ্টজন্মের পূর্বযুগে বাংলার কি পরিচয় ছিল তাও যে জানতে সাধ হয়।

সে পরিচয়ের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন, 'বাংলার ব্রতচারী সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য পুরুষ স্বর্গত শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত। তাঁর রচিত 'ব্রতচারী পরিচয়' গ্রন্থে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমী ও ডিওডোরাসের দেয়া বিবরণ থেকে যা জানিয়েছেন—তা এই—

"সেকেন্দর অবগত হলেন যে সেই (শতদ্রু) নদীর পূর্বে বহু বিস্তৃত মরুভূমি আছে, যা পার হতে এগার দিন লাগবে। তারপরে ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী—গঙ্গা। গঙ্গার অপর পারে দু'টি জাতি বাস করে—তাদের নাম গঙ্গারিডী (গঙ্গারাঢ়ী) ও প্রাশী। তাদের রাজা 'অর্গমের' দেশরক্ষার জন্যে ২০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ২ লক্ষ পদাতিক সৈন্য ও ২০০০ চতুরশ্ব রথ তো আছেই, তা ছাড়া এদের চেয়েও ভীষণ তিন সহস্র হস্তীবাহন একটি মহতীবাহিনী আছে।

"ইহা শ্রবণ করে সেকেন্দার তাঁর সৈন্যগণকে আহ্বান করে এই গঙ্গারাঢ়ী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করবার জন্যে একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। কিন্তু তাঁর ম্যাসিডোনিয়াবাসী সৈন্যদল কোনক্রমেই তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁকে এই অভিযান হতে বিরত হতে হল।"

ঐ গ্রন্থে তিনি আরো জানিয়েছেন যে—

"এই জাতি নিশ্চয়ই পরম প্রতাপশালী ছিল, তা বোঝা যায় প্লিনীর বর্ণিত তাদের সৈন্যদলের পরিমাণ থেকে। প্লিনী আরও বলেছেন যে, এরা কেবলমাত্র সুন্দরবনের জলাজমিতে আবদ্ধ ছিল না ; বর্তমান বাংলা প্রদেশের অনেকটা জায়গায় তারা বাস করত। এবং প্লিনী যে রাজধানীর নাম 'পার্থলিস' উল্লেখ করেছেন তা নিশ্চয়ই 'বর্দ্ধন' —যা অতীতযুগে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল এবং যার বর্তমান নাম 'বর্দ্ধমান'।"

এই প্রসঙ্গে তিনি কুইণ্টাস কার্টিয়াস ও প্লুটার্ক থেকেও নানা তথ্য আহরণ করেছেন। বাহুল্য ভয়ে তা আর এখানে তুলে দিলাম না। আরো তুলে দিই নি এই কারণে যে, উদ্ধৃতি যা দিয়েছি—তার সাহায্যেই আমরা বুঝতে পারবো গঙ্গাবাঢ়ীদের সংহত শক্তি ও বীরবত্তার কথা। এই গঙ্গাবাঢ়ীদের উল্লেখ করেছেন স্বর্গত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর প্রণীত—'বৃহৎ বঙ্গ'—গ্রন্থে গঙ্গারাঢ় নামে। এঁদের নাম থেকেই স্বর্গত কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি" শব্দটি সৃষ্টি করেন।

ঐ গঙ্গারাঢ়ীদের বীরত্বকাহিনী কেমন ভাবে 'জার্জিক' কাব্যে রোমের কবি ভার্জিল বর্ণনা করেছেন, তাও সর্বজনবিদিত। শোনা যায় ভার্জিল বলেছিলেন যে—ঐ অদ্ভুত বিক্রমশালী যোদ্ধাদের নামে তিনি একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করে যাবেন। তাদের বিশেষ বীরত্ব ছিল নৌযুদ্ধে। পৃথিবীর সর্বত্রই তারা অর্থের বিনিময়ে নৌযুদ্ধ করে বেড়াত। তাদের অস্ত্র ছিল জাল ও ত্রিশূল। ভার্জিল তাদের নামে স্মৃতিসৌধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্মাণ নাই করুন—তিনি যে তাদের বেশ ও অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার রীতি গ্ল্যাডিয়েটারদের মধ্যে প্রচারিত করেন, তা স্বভাবতই মনে হয়। তখনকার দিনে তো রোমের রাজাপ্রজাদের একটিশ্রেষ্ঠ আনন্দ-অনুষ্ঠান ছিল অ্যামফিথিয়েটারে গ্ল্যাডিয়েটারদের আমরণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখা। অন্য নানা যুদ্ধসজ্জার মধ্যে গ্ল্যাডিয়েটারদের মধ্যে বাঙালীদের মতো মলকচ্ছ বেঁধে জাল ও ত্রিশূল নিয়ে কেউ কেউ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতো। সে যুগের যে সব চিত্র পাওয়া যায় ঐ দ্বন্দ্বযুদ্ধের—তার মধ্যে গঙ্গারাঢ়ীদের সজ্জাধারী যোদ্ধারও দর্শন পাওয়া যায়। তারা বাম হাতে জাল ও ডান হাতে ত্রিশূল নিয়ে যুদ্ধ করতো। ঠিক এই অস্ত্রধারণের বিশেষ ভঙ্গীটি দেখা যায় দেবী দুর্গার—তিনিও বাম হাতে জাল বা নাগপাশে অসুরকে বন্ধন করে, দক্ষিণ হাতের ত্রিশূল দিয়ে তার বক্ষে আঘাত করছেন। আমরা পুরাণে পাই—নাগপাশ হচ্ছে বরুণের অস্ত্র। আসলে তা মাছধরা-জাল ছাড়া আর কিছু নয়। এ বিষয়ে পরে আরও বলছি।

কিন্তু ভারি বিস্ময়ের কথা যে—গ্রীক ঐতিহাসিকরা কেউই গঙ্গারাঢ়ীদের সেই প্রবল প্রতাপ নৌবাহিনীর উল্লেখ মাত্র না করে শুধু চতুরঙ্গবাহিনীর কথা বলেই শেষ করেছেন - যদিও তাঁরা স্বীকার করছেন যে গঙ্গাবাঢ়ীদের রাজ্য ছিল নাব্য অঞ্চলে—সুতরাং নৌবিদ্যার অধিকার তো তাদের অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিকরা তার উল্লেখ করলেন না কেন? এর মধ্যে কি কোন গূঢ় কারণ আছে? স্বভাবতই তো সেই সন্দেহ জাগে।

আরো সন্দেহ হয় যখন দেখি যে—স্বয়ং দিগ্‌বিজয়ী বীর সেকেন্দারের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনেও তাঁর অনুচরেরা স্বীকৃত হলো না গঙ্গাবাঢ়ীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঅভিযানে। এও কি সত্যের অপলাপ নয়? যে সৈন্যদল দেশের পর দেশ অবাধে জয় করতে করতে এগিয়ে এসেছে—স্বভাবতই তো তাদের যুদ্ধ ও জয়ের স্পৃহা আরো বর্ধিত হয়। যেমন দেখি, কোন মুষ্টিযোদ্ধা বা কুস্তীগীর উল্লসিত হয়ে ওঠে সমকক্ষ প্রতিযোগীর সন্ধান পেয়ে। আর দিগ্‌বিজয়ী গ্রীকসৈন্য প্রতিযোদ্ধার নাম শুনেই রণে ভঙ্গ দিল—এ কি কখনো সম্ভব? কোনো বিজয়ীর পক্ষে এতো অত্যন্ত অমর্যাদার ব্যাপার।

আবার দেখি—ঐ সেকেন্দারের ভারতে আসার অব্যবহিত পরবর্তীকালে ভারতের রাজা চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করছেন গ্রীক কন্যাকে। যে দেশ বিজেতা, যে দেশের মেয়েকে কি কেউ স্বেচ্ছায় বিজিত দেশের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেয়? রাজনীতি তো জানায় যে—দুর্বল রাজাই আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে সবল রাজাকে কন্যাদান করে, অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমবলের দুই রাজার মধ্যেই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। গ্রীসের সঙ্গে ভারতের ঐ যে বৈবাহিক সম্বন্ধ দেখা দিল মৌর্যযুগে তার কারণটি কি হতে পারে?

আবার একবার ঐ গঙ্গারাঢ়ীদের তথা পূর্বাঞ্চলের রাজাদের নৌবাহিনীর কথা বলে নিই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে—মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সুগঠিত একটি নৌবিভাগ ছিল। আবার খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বাঙালী বিজয়সিংহের পোতাভিযান ও সিংহলে রাজ্যস্থাপন তো ইতিহাসবিশ্রুত কীর্তিকথা। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কদেবেরও সমুদ্রজলদুর্গ ছিল আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে। গৌড়ের পরবর্তী অধিপতি ছিলেন যাঁরা, সেই পালবংশেরও বৃহৎ নৌবল ছিল। রাজা রাম পালের যুগে তো ছিল প্রবল নৌবাহিনী। নৌমেলক বা নৌকোর তৈরী সেতু দিয়ে তখন বিশাল চতুরঙ্গবাহিনী গঙ্গা পার হতো। আরো পরবর্তীকালে তো গৌড়াধিপতি সেনবংশেও নৌবলাধ্যক্ষের সন্ধান পাই।

বাংলাদেশ যে নৌবিদ্যায় সমধিক পারদর্শী ছিল অতি আদিকাল থেকেই তার বহু প্রমাণ পাই। আরো একটি কথা মনে রাখার যে, যুদ্ধ বা ক্রীড়া বা কোন যন্ত্রাদি প্রয়োগের কৌশল কোনো জাতিই সহসা আয়ত্ত করতে পারে না। বহুযুগের সাধনাতেই তবে সেই সব কৌশল আয়ত্ত করা যায় বা সমধিক নৈপুণ্য অর্জন করা যায়। কাজেই বেশ বলা যায় যে, সেকেন্দার যখন আসেন তখনকার দিনে গঙ্গারাঢ়ীরা হঠাৎ নৌশক্তি গড়ে তোলেন নি।

কিংবা আবার দেখি, বাংলাদেশে সেই নৌবিদ্যার ধারা কি ভাবে মোগল আমলে বাংলার বারভূঁইয়ার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকট ছিল। মনে পড়ে সম্রাট আকবরের দুর্ধর্ষ সেনাপতি মানসিংহ যখন এলেন বাংলা বিজয় করতে, তখন কি বিপর্যস্ত হন প্রতাপাদিত্যের নৌবাহিনীর আক্রমণে। কে জানে, তার ফলেই সম্রাট আকবর নৌবিভাগ প্রবর্তন করে—'মীরবহর' নাম দিলেন কিনা?

তাইতো এই প্রশ্নই জেগে ওঠে যে গ্রীক ঐতিহাসিক কেন ভুলে গেলেন বাংলার নৌবাহিনীর উল্লেখ করতে, আর কেনই বা গ্রীকসৈন্য গঙ্গারাঢ়ীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলো না? এর উত্তর দিতে একটি কথাই বার বার মনে আসে যে—গ্রীক ঐতিহাসিক সত্য গোপন করেছেন। প্রকৃত সত্য হয়তো এই যে—সেকেন্দার তাঁর অশ্বারোহীবাহিনী নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন গঙ্গা পার হতে কিন্তু ঐ গঙ্গারাঢ়ীদের জাল ও ত্রিশূলের আঘাতে তাঁর সৈন্যদের দ্বিশৃংগবিশিষ্ট মুকুট, যাকে বলা হতো 'টু হর্নড্ হেলমেট'—গেল খসে জালের বন্ধনে আর তাদের বক্ষ হলো ক্ষতবিক্ষত ত্রিশূলের তীক্ষ্ণ আঘাতে। সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাজয়ের গ্লানি ভোলবার জন্তেই গ্রীকরা গঙ্গারাঢ়ীদের নৌবাহিনীর নাম পর্যন্ত করলো না—উলটে রটিয়ে দিল যে তারা যায় নি অতদূর পর্যন্ত। মানুষ যার কাছে পরাজিত হয়—সহজে তার নাম আর মুখে আনে না—এইতো সাধারণ মনস্তত্ত্বের কথা। অবশ্য পরবর্তী যুগে যেহেতু আমরা পাঠান, মোগল ও ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছি—তারপর আর ঐ উক্তি আমাদের সাজে না যে, আমরাই একদিন গ্রীক সৈন্যকে পরাভূত করেছিলাম। তাই দেখি শেষ পর্যন্ত সেই বীর গঙ্গারাঢ়ীর বংশধররা রাইবেশী নাচ নেচে বেড়াতে লাগলো নানা উৎসবাদিতে। ভুলেই গেল তারা কেন মাথায় জালের টুকরো বাঁধে, আর কেনই বা হাতে বাঁশ নিয়ে খেলা দেখায়? এ বিষয়ে আবার সবায়ের দৃষ্টি ঐ স্বর্গত শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের—"ব্রতচারী পরিচয়"—গ্রন্থটির দিকে আকর্ষণ করি।

যখন তিনি সিউড়ীর জেলাঅধিকারিক তখনি বীরভূম অঞ্চলের রাইবেশী নাচ দেখে তাঁর কৌতূহল জাগে। ক্রমে রীতিমত অধ্যবসায় প্রয়োগ করে তিনি আবিষ্কার করেন গঙ্গারাঢ়ীদের লুপ্ত ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করেন "বাংলার ব্রতচারী সমিতি"। যদিও তিনি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী - কিন্তু জড়িত হয়ে পড়েন ঐ পঞ্চ তান্ত্রিকপীঠস্থান-অধ্যুষিত বীরভূমির তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে হয়তো তাঁর অজ্ঞাতেই। তাই ব্রতচারী পদ্ধতিতে তিনি যে মূল পঞ্চশীলের প্রবর্তন করেন জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ—তার মধ্যে জেগে ওঠে দুর্গাপ্রতিমার পঞ্চ মূর্তি গণেশ, লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী ও কার্তিকের,ভাবাদর্শ। তিনিই প্রমাণ করেন যে—রাইবেশী নয় রায়বেঁশে অর্থাৎ পাকা-বাঁশ যা দিয়ে ত্রিশূলের হাতল তৈরী হতো—তাই নিয়েই বীরনৃত্য বা যুদ্ধনৃত্য করে ঐ রাইবেশী নামধারীরা। যুদ্ধের শৌর্য কি ভাবে লোকনৃত্যের রূপ নিয়ে জীবন্মৃত হয়ে গেল—এ তার অতি উজ্জ্বল উদাহরণ।

॥ দেবীর মূর্তি-বিবর্তন ॥

এবার আবার ফিরে আসি দুর্গাপ্রতিমার বিশ্লেষণে। এখন কি বলিতে পারি না যে—দেবীর পদপীড়িত অসুর হচ্ছে গ্রীকযোদ্ধার প্রতীক আর তার মস্তকচ্যুত দ্বিশৃঙ্গযুক্ত শিরস্ত্রাণটিই মহিষের ছিন্ন মুণ্ডে পরিবর্তিত হয়েছে?

জানি, এই উক্তিকে অনেকে নস্যাৎ করতে চাইবেন কালাতিক্রমণদোষে দুষ্ট বলে। কিন্তু তাঁদের কাছে শুধু বিনীত অনুরোধ জানাই একবার চিন্তা করতে যে—কি ভাবে মহিষমর্দিনীর রূপ বিবর্তিত হয়ে দেবী দুর্গার মূর্তি জেগেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম তো চণ্ডী সপ্তশতীতে দেখি—দেবী মহিষাসুরকে কেবল খড়্গাঘাতেই ছেদন করেন। অর্থাৎ তখন অন্য অস্ত্র আবিষ্কৃতই হয় নি—তাই দেবীর অস্ত্রও ছিল খড়্গ ও চর্ম। এই রীতিতে সিংহবাহিনী খড়্গচর্মধারিণী মূর্তিই সে যুগে প্রচলিত ছিল, যেমন দেখা যায় মহাবলীপুরম্-এ। বাংলার বাইরে ঐ রীতির বহু মূর্তিও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা নানাস্থান থেকে খনন করে পেয়েছেন। সে মূর্তি সবই প্রস্তর গঠিত।

অথচ বাংলায় গেল দেবীর নাম ও রূপ বিবর্তিত হয়; শুধু তাই নয় তাঁর হাতে যদিও দিলাম দশটি প্রহরণ তুলে কিন্তু প্রয়োগ করলেন তিনি শুধু জাল বা নাগপাশ ও ত্রিশূল। এর থেকে বেশ বোঝা যায় নাকি যে, দেবীকে বাংলা তার আপন শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী বিবর্তিত করে নিয়েছে। মূর্তিনির্মাণেও তো ব্যবহার করেছে সহজলভ্য মৃত্তিকাই। বলাই বাহুল্য এ মূর্তি-রচনার মূলে আছে বাস্তব ঘটনার প্রভাব।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে এই শতকেই একবার পূর্ববঙ্গে দেবী দুর্গার একটি অপূর্ব মূর্তি রচনা করা হয়েছিল। তাতে দেবীকে ভারতমাতা, কার্তিককে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও অসুরকে ইংরেজ যোদ্ধা রূপে গঠন করা হয়। এখনো তো বহুজন জীবিত আছেন, যাঁরা সেই প্রতিমাপূজা দেখে আনন্দ করেছিলেন আর কি বিষম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তার, ইংরাজ শাসকদের মনে তার কথাও বিস্মৃত হন নি। এই ভাবেই তো যুগে যুগে দেবীর মূর্তি বিবর্তিত হয়েছে পরিবেশের প্রভাবে, এ কথাটি মনে রাখার।

রাঢ় দেশেই যে দুর্গাপ্রতিমার প্রথম কল্পনা জেগেছিল গ্রীকদমনের পরে একথা স্বভাবতঃই মনে আসে। আরো এই কারণে যে রাঢ় অঞ্চলেই তন্ত্রসাধনার রীতি বহুকাল থেকে প্রচলিত। মুনি অষ্টাবক্র, যিনি অতি প্রাচীনকালের সাধক, তাঁর সাধন-পীঠ ছিল বক্রেশ্বরে ঐ রাঢ় অঞ্চলে। মুনি বশিষ্ঠের কথা তো আগেই বলেছি। পরবর্তীকালের চণ্ডীমঙ্গল পাঞ্চালীর রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও ওই রাঢদেশের অধিবাসী। শুধু তাই নয় অনেকে মনে করেন যে—বর্ধমানের সন্নিকট দুর্গাপুরেই প্রথম দুর্গোৎসব হয়েছিল—রাজা লক্ষ্মণসেনের আগ্রহে। এ সম্বন্ধে মতানৈক্যও আছে। আবার অনেকে তো মাইথনকেই আদি মাতৃস্থান মনে করেন—এখানে সেখানে দেবীর বেদীস্থান আছে—তবে সেটিকে আবার কেউ কেউ মনে করেন সাঁওতালদের প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা তো আগেই জেনেছি যে, দেবী চণ্ডীকে আমরা পেয়েছি সাঁওতালদের কাছে থেকেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাই হোক, একটি সত্য এতোক্ষণে বোধ হয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, দুর্গাপ্রতিমার মধ্যে কি ভাবে গ্রীকবিজয়ের ঘটনাটি বিবৃত হয়ে আছে। গ্রীকরাই তো এসেছিল বাংলার শক্তির রাজত্বে বাধা সৃষ্টি করতে। কিন্তু অপূর্ব সংহত শক্তি ছিল সেদিন বাংলায় সদা-জাগ্রত—সেই বাংলার রূপ ছিল তখন দশভুজা দুর্গার মতই জ্ঞানে, শ্রমে, সত্যে, ঐক্যে ও আনন্দে দেদীপ্যমান। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও বোধ হয় সে তথ্য ভাল করেই জানতেন, তাই তাঁর 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে দেশবন্দনা করতে গিয়ে মন্ত্র রচনা করলেন—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্॥

* * * *

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং॥ ইত্যাদি

সে মন্ত্র ছিল সত্যের দর্শনে প্রাপ্ত। তাই সমস্ত দেশবাসীকে একদিন সেই মন্ত্র এমনি উদ্‌বুদ্ধ করেছিল যে—তাঁরা হাসিমুখে জীবন বিসর্জন করতে পরাঙ্মুখ হন নি।

॥ উপসংহার ॥

এবার আলোচনা করা যাক—দুর্গাপূজার পদ্ধতির মধ্যে যে বিশেষ প্রকরণ আছে তারি সম্বন্ধে। ঐ পদ্ধতির মধ্যেও পাই বাঙালীর জাতিগত ঐক্যের অপূর্ব পরিচয়, বিভিন্ন দিক থেকে বাঙালী মনের নানা প্রকাশ। আজকের দিনে যা উদ্‌ঘাটিত করে দেখানোর বিশেষ উপযোগিতা আছে তো বটেই, তার কারণ শুধু বাঙালীর কাছে নয়, সারা বিশ্বের কাছে আছে তার শাশ্বত আবেদন। সেই কথাই বলার চেষ্টা করি।

প্রথমেই বলতে হয় প্রতিমাগঠনের রীতির কথা। প্রতিমাটি তৈরী হয় মূলত মাটি দিয়ে। এই মাটির সঙ্গে বাঙালীর যোগ একেবারে অবিচ্ছেদ্য। অন্য সমস্ত প্রদেশে তো দেবমূর্তি নির্মিত হয় পাথরের, নয় কাঠের। বাঙালীর মতো মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে আর কোনো প্রদেশবাসী পূজো করেন না। তার থেকে এই কথাই কি মনে আসে না যে, বাঙালীর সঙ্গে মাটির যেন নাড়ীর টান আছে—তাই দেবমূর্তি গঠন করতেও সে ব্যবহার করে মূলত মাটি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মৃত্তিকা বা পৃথিবীকে বাঙালী কি চোখে দেখে তারই তো পরিচয় রয়েছে 'চণ্ডী সপ্তশতী'তে। সেখানে দেখি, দেবতারা স্তব করছেন দেবীর—

মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ॥—বলে। অর্থাৎ সেই দেবী পৃথিবী রূপেই অবস্থিত। কে জানে, দেবী পৃথিবীরূপে অবস্থিত অথবা পৃথিবীই দেবীর রূপে উন্নীত? এ প্রসঙ্গে প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মশায়ের লেখা—'বাংলার লোকশ্রুতি' বইখানির শেষভাগে দুর্গোৎসবে ধরিত্রীপূজার বিবরণটির দিকে সবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না। অবশ্য জাতিগতভাবে যে বাঙালী কৃষিজীবী তাদের পক্ষে মাটি বা মহীকে তো এই চক্ষে দেখাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। আগেই আমরা নবপত্রিকার প্রসঙ্গে বলেছি যে - কৃষিলক্ষ্মীর পূজা হচ্ছে দেবী দুর্গার পূজার মূল উদ্দেশ্য।

॥ পূজার আয়োজনে বৈশিষ্ট্য ॥

এবার দেখি পূজার আয়োজনে কি কি দ্রব্য প্রয়োজন। বিস্মিত হতে হয় দেখে যে দুর্গাপূজার জন্যে মৃত্তিকা কতো স্থান থেকে আহরণ করতে হয় আর জলই বা কতো স্থান থেকে। বল্মীকমৃত্তিকা থেকে বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা পর্যন্ত সংগ্রহ করতে হয় ঐ পূজার জন্যে। কেন তা দরকার? একটু চিন্তা ক'রলেই বুঝতে পাই যে—যে যে স্থলে গণসংযোগের অতি সামান্য মাত্র নিদর্শন বর্তমান—সেখানকার মাটিই আনতে হয় মায়ের পূজার জন্য। এই মৃত্তিকা সংগ্রহের ব্যাপার থেকে এও বেশ বোধগম্য হয়—বাঙালী সেইকালে কতো মাটি মাড়িয়ে চলা ফেরা করতো নির্ভয়ে।

আর জল? কতো বিচিত্র জলই না ঐ পূজায় প্রয়োজন—শিশির জল, বৃষ্টি জল থেকে শুরু করে নির্ঝর জল, সর্ব নদী ও সর্ব তীর্থের জল, সমস্ত সমুদ্রের জলও চাই। সেদিনের বাঙালী তো সমস্ত নদ-নদী-সমুদ্রে অবাধে বিচরণ করতো, তার বাণিজ্যতরী, রণতরী নিয়ে তার পক্ষে আর দুর্গম বা দুরূহ তো ছিল না নানাস্থানের জল সংগ্রহ করে আনা। কিন্তু তারও মধ্যে ঐ মূল সূত্রটি রয়েছে যে—বাঙালী বুঝতো মনে-প্রাণে সংহতশক্তি। মাটি ও জল সংগ্রহের মধ্যে তার সেই পরিচয়টি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে।

এবার আসে বিলাসবৈভবের কথা। কতো উপচারই না যোগাড় করতে হয় পূজার। তখনকার দিনে বাঙালী কি বিলাসবৈভবের মধ্যে জীবনযাপন করতো—তারি প্রমাণ পাই পূজার মধ্যে ওই বিলাসবৈভবের আয়োজন দেখে। স্মৃতিকারেরা বলেন কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ নেই, তারি বিকল্প হচ্ছে দুর্গোৎসব—বাস্তবিকই এ পূজা অতীব রাজসূয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার যদি সমাজ চেতনার দিক দিয়ে বিচার করি, দেখতে পাই বাঙালী সমাজের সর্বস্তরের সর্ব শ্রেণীর মানুষেরই যোগ রয়েছে এ পূজায়। অশুচি অস্পৃশ্য যে মুচি, কাওরা, ডোম, তারা না এলে মায়ের পূজায় ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাঁশি বাজাবে কে? বাংলায় ওরাই তো ছিল যুদ্ধের বাদ্যকর। ছেলেভুলানো ছড়ার—

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে।

ডান মেরদং ঘাগরোল বাজে ॥—থেকেই তো আভাস পাই কি ভাবে ওই মুচি, ডোম প্রভৃতিরা সাজতো সেনাবাহিনীর সঙ্গে। এর থেকেও তো আবার মনে হয় দেবী দুর্গা যুদ্ধজয়ের দেবী—তাঁর পূজায় যুদ্ধবাদ্যই তো অবশ্য যোজনীয়।

প্রসঙ্গত বলতে হয় যে—দুর্গাপূজার প্রতিটি মন্ত্র কোন্ রাগে কোন তালে গান করতে হবে তার নির্দেশও আছে শাস্ত্রে। কিন্তু বর্তমানে তো পুরোহিতরা সে সমস্ত আর প্রয়োজন বোধ করেন না, হয়তো ভুলেই গিয়েছেন তাঁরা তার প্রয়োগ—তাই সংক্ষেপে সারবার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন—মন্ত্রের আদিতে 'ওঁ' শব্দ উচ্চারণ করে—বিধানও তৈরী হয়েছে সর্বনাদময়ঃ প্রণবঃ ॥ অর্থাৎ ওঁ উচ্চারণ করলেই সব সুরের কাজ হয়। কিন্তু বাস্তবিক তা কি হয়? যে মন্ত্র প্রকৃতপক্ষে নৃত্যগীত ও বিজয়বাদ্য সহ-যোগে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হবার কথা—তাকে ঐভাবে মাত্র একটি পুরোহিতের কণ্ঠে ওঁ-যুক্ত করে অস্ফুট অর্ধোচ্চারণে কি অভীষ্ট ফল লাভ করা যায়? কিন্তু সে আবার অন্য কথা।

কিন্তু বাঙালী যে বহুকাল থেকে গীতবাদ্যাদিতে বিশেষ পারদর্শী ছিল—তার অতি উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে আছে বাংলার বিখ্যাত পদাবলীকীর্তন রীতি। সে কীর্তনে চারটি রীতি আছে—রেনেটি, গরাণহাটী বা গড়ের হাটী, মন্দারিনী ও মনোহরসাহী নামে। শোনা যায়, বিভিন্ন পরগনার নামেই বিভিন্ন রীতির নামকরণ হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি রীতিতে যে সমস্ত সুর ও তালের ব্যবহার হয়, তা আয়ত্ত করা স্বল্পশিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে দুরূহ।

দেবীপূজার আরো বৈশিষ্ট্য যে কর্মকার যে খড়্গ দিয়ে পশুর মুণ্ডচ্ছেদ করে—তারও পূজা হয়। দেবীর সমস্ত অস্ত্রের পূজা তো করতেই হয়। কে জানে, সেকালে হয়তো দেবীপূজায় পশু বলিদান করেই অস্ত্রের দৃঢ়তা ও তীক্ষ্ণতারই পরীক্ষা হতো। মোট কথা, সর্ব বর্ণের সর্ব শ্রেণীর সর্ব স্তরের লোক একত্রিত না হলে দেবীপূজা সম্পূর্ণ করা যায় না আজো। প্রয়োজন আছে পটুয়ার দেবীকে সাজাবার জন্যে, মোদকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য, তন্তুবায়ের প্রয়োজন বস্ত্রাদির জন্য, সূত্রধরের প্রয়োজন মণ্ডপাদি রচনার জন্য। অতি অন্ত্যজ সমাজবহির্ভূত যে সেও পারে দেবীর পূজায় পদ্মাদি পুষ্প সংগ্রহ করে আনতে। এমন সার্বজনিক সার্বভৌমিক পূজার কল্পনা বোধ হয় একমাত্র এই বাংলা দেশেই সম্ভব। এই বাংলার থেকেই প্রথম জেগেছিল গণতন্ত্রের বোধ—তার প্রমাণ পাই প্রাচীন বৃহৎবঙ্গের ইতিহাসে। তখন বাংলার প্রসার ছিল পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত। পূর্বে, দক্ষিণে ও উত্তরে তার বিস্তৃতিও ছিল বহুদূর। এই সেদিন পর্যন্তও তো বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যা-আসাম ছিল পরস্পর সংযুক্ত। সেই প্রাচীনকালে বৃহৎবঙ্গেই বুদ্ধদেবের মাতৃবংশীয় লিচ্ছবীরা ভারতে প্রথম গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন—এ কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

তারপর কালক্রমে বাঙালীর তো সবই নষ্ট হয়েছে—হয় নি শুধু তাদের কৃষ্টি নষ্ট, তাদের দুর্গাপূজার অপূর্ব পরিকল্পনাটি নষ্ট। ঐ দুর্গাপ্রতিমার মধ্যে যে মূর্তি সংস্থানগুলি আছে তার থেকে আরো যা ফুটে ওঠে, তাও তো লক্ষ্য করবার।

॥ ধর্মসমন্বয় ॥

প্রথমেই মনে আসে ধর্মসমন্বয়ের কথা। ভারতে তো পঞ্চ দেবতাউপাসনার ফলে পঞ্চ সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে—গাণপত্য, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ও সৌর। সেই গাণপত্যের দেবতা গণপতি, বৈষ্ণবের দেবতা লক্ষ্মী, যিনি বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপা, শাক্তের দেবতা শক্তি বা দুর্গা, শৈবের দেবতা সরস্বতী, যিনি বাস্তবিক পক্ষে সরস্বান বা শিবের শক্তি, আর সৌরের দেবতা কার্তিক, যিনি সূর্যের প্রতীক বলেই সপ্তবর্ণচিহ্নিত ময়ূরে বাহিত—সবাই একই চালচিত্রের তলে বিরাজ করছেন। তাই আদৌ অদ্ভুত মনে হয় না যে—রামকৃষ্ণদেব সেই শক্তির উপাসনা করে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা আরো উচ্চকণ্ঠে আমাদের শোনালেন।

আর এক কথা যাঁরা হিন্দুধর্মের নানা সম্প্রদায় সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা করেন, তাঁরা ভাল করেই জানেন কি পর্যায়ে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় জেগে উঠেছে। ঠিক সেই ক্রমপরিণতির পর্যায়টি বিধৃত হয়ে আছে ঐ প্রতিমার মধ্যে। প্রথম গাণপত্য, দ্বিতীয় বৈষ্ণব, তৃতীয় শাক্ত, চতুর্থ শৈব ও পঞ্চম সৌর—এই পর্যায়েই তো জেগেছে ভারতের পঞ্চ সম্প্রদায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ পরিবারবন্ধন ॥

আবার মনে হয় বাঙালীর প্রাচীন পরিবারবন্ধনের মূল কথা যে একান্নবর্তিতা তাও প্রকটিত হয়ে রয়েছে ঐ প্রতিমার মূর্তিসংস্থানের মধ্যে। ইকুইডিষ্ট্রীবিউশান্ অব্ ওয়েলথ্-এর সেই তো শেষ কথা এই আজকেকার যুক্তিবাদী যুগেও।

আরও একটি বিচিত্রতা পাই ঐ মূর্তিগুলির কথা ভাবতে গিয়ে। ঐ দুর্গাপ্রতিমার তথা শিবের সংসারে যাঁরা একত্রিত হয়েছেন—নানা পুরাণাদিতে তাঁদের প্রত্যেকের যে পরিচয় পাই তাতে তো জানতে পাই যে—ওঁরা কেউ কারো সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধে বা ঐ ধরনের কোনো সম্বন্ধেই যুক্ত নন।

প্রথম ঐ শিব। শোনা যায় তাঁর জন্ম আদ্যাশক্তি কালীর গর্ভে অথবা ব্রহ্মার ললাট থেকে। জন্ম থেকেই তিনি যোগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি কিছুই প্রার্থনা করেন না কারো কাছে—তবু তার সংসারে কোনো অপ্রতুল নেই। বাংলার লৌকিক কাব্যে তো শিবকে জানি কৃষির আদিকর্তা বলে। কিন্তু সে কথা এখানে অবান্তর। শিবের যে পরিচয় বিভিন্ন তন্ত্র পুরাণে পাই—তার সম্বন্ধেই এখন বলি—সেদিক থেকে শিবের সংসার তো একটি রহস্য। এইতো গেল সংসারের কর্তা বাপের পরিচয়।

দ্বিতীয় ঐ দেবী। শোনা যায় তাঁর জন্ম সমস্ত দেবতার সংহতবীর্য থেকে। তিনি তো সর্বদাই ব্যস্ত পরের বাধা ও দুঃখ দূর করতে—সেই যেমন অন্নদামঙ্গলে পাই—

যে ডাকে আমারে আমি
তারি ঘরে যাই ॥

তাহলে তাঁর নিজের ঘরে থাকার সময় কোথায়? ওদিকে পুরাণাদিতে দেখি, তিনি কেবলি বাধা দূর করার জন্যে অসুরের পর অসুরকে সংহার করছেন—তিনি কারো কাতর আহ্বান না শুনে পারেন না। মহানায়িকা তিনি, প্রাণবাণিজ্যের অধিষ্ঠাত্রী পরমা বৈশ্যা। এই তো গেল সংসারের গৃহিণী বা মায়ের অবস্থা।

এবার পুত্রকন্যারূপে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কথা বলি, প্রথম পুত্র গণেশ তো শিবের পুত্রই নন, দেবীর গাত্র মল থেকেই তাঁর উৎপত্তি—আবার এও জানা যায় যে, শিবের জটা থেকেই তার জন্ম—কাজেই দেবীর পুত্র নন তিনি। কিন্তু সবাই বলে তিনি শৈলসুতা-সুত আর দেবীকেও সবাই ডাকে গণেশজননী বলে। এ তো বেশ সমস্যার কথা।

দ্বিতীয় পুত্র কার্তিক তাঁকে শিবের পুত্র বলা হলেও তো দেখি—অগ্নির ঔরসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাহাদেবীর গর্ভে তাঁর জন্ম। স্বাহাদেবী তাঁকে বিসর্জন দেন শরবনে। সেখানে ছ'জন কৃত্তিকা তাঁকে স্তন্য পান করান—তাঁদের নামানুযায়ী তাঁর নাম কার্তিক। তবে কি করে মানা যায় যে, তিনি শিবদুর্গার সন্তান?

কন্যা দু'টির একটি হলেন লক্ষ্মী—তাঁর জন্মবৃত্তান্ত বেশ অন্ধকার। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সমুদ্রের কন্যা বলেই স্বীকার করা হয়েছে পুরাণে। আর দ্বিতীয় কন্যা সরস্বতী তো মূলে ব্রহ্মার কন্যা—বাপের দৌরাত্ম্যে বাধ্য হন শিবদুর্গার আশ্রয় নিতে।

অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে—শিবের আত্মীয় কেউই নন ওই স্ত্রীপুত্রকন্যাদি—তবু সবাই শিবকে নির্ভর করে আছেন একই সংসারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। এর থেকে তো এই সত্যই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে—অতি অনাত্মীয় নিঃসম্বন্ধ সবাই কি ভাবে এক পরিবারভুক্ত হয়ে পরম সখ্যে কালাতিপাত করতে পারেন—তারি আদর্শ ঐ প্রতিমায় বিধৃত শিবদুর্গার সংসার। সেই পরম ঐক্যকে রূপায়িত করার জন্যেই কি দেবীর দশ হাত দেখানো হয়েছে—দু'টি তাঁর নিজস্ব—বাকী আটটি তাঁর চারটি ছেলেমেয়ের? তবে ক্রিয়াশীলতা দেখাবার জন্যেই যে—দেবীকে দশ বাহুযুক্তা দেখানো হয়েছে—তার একটি সুন্দর প্রমাণ দেখা যায় ফটোগ্রাফীতে—যখন সাধারণ ক্যামেরায় কোনো চলন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তুর ছবি তোলা হয়—তখন সেই বস্তুটির চিত্র ঐ ভাবে বহুগুণিত হয়ে যায়। কিন্তু সে কথা থাক।

সত্য হচ্ছে এই যে—যখন কোন নায়কের পিছনে কোন দল সমবেত হয়—তখন তো সেই নায়কের কণ্ঠে, বাহুতে, চরণে সেই সমগ্র দলের ভাষা, কর্ম ও গতি ফুটে ওঠে। দেবীও তো মহানায়িকা সুতরাং তাঁর যে দশখানা হাত প্রকাশ পাবে, সে আর বিচিত্র কি? সেই সত্যই তো বাণীভূত হয়ে রয়েছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মহা-মন্ত্রটিতে—

সপ্ত-কোটি-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে।
দ্বিসপ্ত-কোটি-ভুজৈর্ধৃত-খর-করবালে॥

এই তো তন্ত্রের পথ, যোগের পথ। এই পথেই তো আমরা পারি অহিংসা ও সহাবস্থান নীতির অনুশীলন করতে। এরই সম্বন্ধে অপূর্ব তথ্য উদ্ঘাটন করেছিলেন রাশিয়ার পণ্ডিত ক্রোপট্‌কিন্ তাঁর রচিত—'দি মিউচুয়াল এড্'—বইখানিতে। বর্তমান যুগকেই তো সবাই বলেন সহাবস্থানের বা কো-এক্‌জিস্‌টেন্সের যুগ। কিন্তু দুর্গা প্রতিমার তত্ত্ব ও তথ্য বিচার করতে গিয়ে তো দেখছি, বাঙালী বহু যুগ আগে থেকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ সত্যকে উপলব্ধি করে তাকে মূর্তি দিয়ে অভীষ্ট দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করে আসছে—স্মরণ করছে সেই সত্যকে—এই পরম মন্ত্রে—

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দ-নন্দ স্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

আমাদের গৃহ, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ, এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু ব্যক্তি ও বস্তু, তা সে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক যাই হোক—সব কিছুকেই ওই যোগের দ্বারা একান্ত আত্মীয় বলে অনুভব করতে পারাই তো মানুষ জীবনের পরম সংসিদ্ধি। এই বোধ বাঙালীরাই লাভ করেছিল অতি প্রাচীনকালেই—আবার জাগুক আমাদের মধ্যে সেই পরম বোধ, মূর্তির মধ্যে থেকে প্রকাশ পাক সেই জীবন্ত ভাবধারা, নূতন দৃষ্টি খুলে থাক আমাদের প্রত্যেকের। সেই তো হবে প্রত্যক্ষ দর্শন। কোনো মূর্তি বা প্রতীকের আড়ালে আর ঢাকা পড়ে থাকবে না বিশ্বেশ্বরীর মহিমা। সেই প্রত্যক্ষ দর্শনের আবেগে বিভোর হয়ে সবাই মিলে একত্রে উচ্চারণ করতে পাব—

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবিমুক্তিহেতুঃ॥

আর পরম কৃতার্থতায় সাষ্টাঙ্গে ধূলায় লুটিয়ে জানাব—হে আমাদের জননী, আমাদের প্রণাম নাও; হে আমাদের জন্মভূমি, আমাদের প্রণাম নাও; হে আমাদের বিশ্বজননী আমাদের প্রণাম নাও।

যা দেবী সর্বভূতেষু
শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী পাঠের রহস্য

শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী পাঠ করার রীতি ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বহুকাল থেকে প্রচলিত। বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে দুর্গোৎসবকালে চণ্ডীপাঠ করা একেবারেই অপরিহার্য। কিন্তু যাঁরাই চণ্ডীপাঠ করেন বা সেই পাঠ শ্রবণ করেন তাঁরা অনেকেই বিভ্রান্ত হন এই দেখে যে, চণ্ডীপাঠের সূচনাতে অর্গলাস্তোত্র (যার মধ্যে তো কেবলি আছে 'দেহি দেহি' শব্দ), কিংবা কীলকস্তব (যার মধ্যে আছে, 'দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি'র কথা) আর তার শেষে দেবীকবচ (যাতে দেখানো হয়েছে যে দেবী সর্ব অঙ্গে অবস্থান করে পাঠক বা সাধককে রক্ষা করছেন) পাঠ করতে হয়। এই অর্গলা, কীলক ও কবচ সম্বন্ধে কিছু নিগূঢ় রহস্য আছে—সেটুকু বলারই চেষ্টা করছি।

॥ আর্গলাস্তোত্ররহস্য ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী যদিও মূলতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত অংশ বিশেষ—কিন্তু তন্ত্রসাধনার সঙ্গে এর যোগ অবিচ্ছেদ্য। সেই তন্ত্রমতে তিন ভাবে সাধনার উল্লেখ পাই, যথা—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। তন্ত্র বলেন জীব বা মানুষ মাত্রেই পশু, সে চায় কেবল আত্মতৃপ্তি আর নিজের উন্নতি। সেই হচ্ছে তার জীবনে অর্গল—যা তাকে আটকে রেখেছে পরম বিস্তারের পথ থেকে। সেই অর্গল বা দ্বারের খিলটি খোলবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—মা সর্বমঙ্গলার কাছে সর্বদা প্রার্থনা জানানো। পশু তো কেবলই ভাবে যে, সে বুঝি এখানে সব কিছু পায় নি, তাই কেবলি নানা ভাবে জানায় তার অভাবের কথা। এই সত্যই তো প্রকটিত হয়ে আছে অর্গলাস্তোত্রের 'দেহি দেহি' রবের মধ্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রার্থনার বলেই খুলে যায় তার দ্বারের অর্গল—অগ্রসর হয় সে ধীরে ধীরে বহির্জগতে বিস্তারের পথে—তন্ত্রের ভাষায় যার নাম পুরশ্চরণ। এই স্তোত্রের ঋষি হচ্ছেন বিষ্ণু—তিনি তো কর্মশক্তির প্রতীক। বাস্তবিকপক্ষে কর্মের দ্বারাই পশুর শ্রীবৃদ্ধি বা লক্ষ্মীলাভ ঘটে এই তো পশুভাবে সাধনার সার্থকতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ কীলকস্তবরহস্য ॥

এবার কীলকস্তবের কথা বলি। কীলক শব্দের অর্থ হচ্ছে ছিট্‌কিনি। সাধারণত দেখা যায় যে—যে কোন দ্বারের মধ্যভাগেই থাকে অর্গল—আর কীলক বা ছিটকিনি থাকে দ্বারের মাথায়। তাই অর্গল বা খিল খোলার জন্যে কাউকে বেশী উন্নত হতে হয় না, কিন্তু ছিটকিনি খোলার জন্যে রীতিমত মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়। অর্গলাস্তোত্র ও কীলকস্তবের তুলনা করলেও দেখা যায় অর্গলায় অনুন্নত অবস্থার ভাব প্রকাশিত প্রার্থনার রূপে—কিন্তু কীলকস্তবের ভাবটি ঢের উন্নততর অবস্থার। তখন সাধক আর পশু নন, মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি পেয়ে তিনি হয়েছেন বীর। বুঝে নিয়েছেন তিনি যে, দেহে-প্রাণে-মনে তিনি লাভ করেছেন তাঁর যা কিছু প্রাপ্য, আরো বুঝেছেন যে মা কেবলই যে দিচ্ছেন তা নয়, ফিরিয়েও নিচ্ছেন—দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি। এই দান ও গ্রহণের ব্যাপারটুকু বেশ বোঝা যায় শ্বাসের গতি লক্ষ্য করলে। এই শ্বাস যেমন ভিতরে আসে, তেমনি বেরিয়েও যায়। এই বোধ যাঁর জেগেছে তিনিই তো যথার্থ বীর। তাঁর পক্ষে তখন সম্ভব হয় কীলকটি খুলে ফেলার। সে কীলক বন্ধ করে রেখেছেন স্বয়ং শিব। কীলকস্তবের ঋষিও হচ্ছেন সেই শিব, তিনিই তো জ্ঞানশক্তির প্রতীক। বাস্তবিকপক্ষে কর্ম করতে করতেই তো লাভ করি আমরা জ্ঞান। সেই তো বীরভাব সাধনের সার্থকতা।

॥ দেবীকবচরহস্য ॥

কিন্তু সাধনার শেষ সেখানে নয়। তাই দরকার দেবীকবচের। তখনি সাধক জানেন যে, মা স্বয়ং নানারূপ ধারণ করে রক্ষা করছেন তাঁর সর্ব অঙ্গ। পরম অভয় লাভ করেন তিনি। কর্ম আর জ্ঞানই হচ্ছে বর আর ভক্তিই হচ্ছে অভয়। কর্ম ও জ্ঞান সংহত হয়ে জেগে ওঠে ভক্তি। তখন আর কোথাও কোনো ভয় থাকে না। দর্শন করা যায় মাকে বরাভয়রূপিনীরূপে, যাঁর দিব্য জ্যোতিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ। দেবী কবচের ঋষি হচ্ছেন ব্রহ্মা—সেই ব্রহ্মার থেকে জগতে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়েছে—এ সত্য ভাগবতপাঠক মাত্রেই জানেন। আর সেই ভক্তিলাভই হচ্ছে দিব্যভাবসাধনার সার্থকতা—তখন মাকে আর এ দেহের কোনো অংশে স্থান দিতে ভয় বা সংকোচ জাগে না।

এখন বোধ হয় বলতে পারি যে অর্গলাস্তোত্র পাঠ করে পশুভাবকে, কীলকস্তব পাঠ করে বীরভাবকে আর দেবীকবচ পাঠ করে দিব্যভাবকে জয় করতে পারেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক, তখনই লাভ করেন তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতীর মূলে প্রবেশ করার যোগ্যতা। অথবা অন্য কথায় বলা যায় যে—যখন কর্ম ও জ্ঞান পূর্ণ সমন্বয় লাভ করে ভক্তিরূপে—তখনই সাধকের চণ্ডীপাঠ করার অধিকার জন্মায়।

॥ শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্র রহস্য ॥

এবার বলি মূল চণ্ডীর মধ্যে কি শিক্ষা নিহিত আছে। প্রথম চরিত্র বা রূপে দেখি—মধু ও কৈটভ সংহার করতে উদ্যত হয়েছে ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মাই হচ্ছেন দেহ—ভক্তির মূল আধার এই দেহটি—সেটি গেলে আর কে কাকে ভক্তি করবে? মধু ও কৈটভ হচ্ছে কাম ও মোহ—তারা দেহের পরম শত্রু। সেই শত্রুকে দমন করেন বিষ্ণু শক্তির কৃপায়। সেই দমন করার বা বধ করার উপায়টি ভারি বিচিত্র। প্রথম তো পাঁচ হাজার বছর ধরে বিষ্ণু ওই দুই অসুরের সঙ্গে বাহু যুদ্ধ করলেন—তবু তারা পরাজিত হলো না। তবে দুর্বুদ্ধি দেখা দিল তাদের—তাই বিষ্ণুকে বর দিতে চাইলো। বিষ্ণু বললেন—"তোমরা আমার বধ্য হও—এই বর চাই।"

সেই বরই দিল তারা বিষ্ণুকে—শুধু এই শর্তে যে—"যেখানে পৃথিবী জলাপ্লুত নয় সেইখানে আমাদের বধ করো।"

বিষ্ণু আপন জঙ্ঘাদেশে রেখেই তাদের দু'জনকে চক্রের দ্বারা ছেদন করলেন।

এই চক্র হচ্ছে কর্মচক্র। এর ব্যাখ্যা পাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোকে। কর্মের চক্রেই দুরাসদ রিপু কামকে তার সহায়সমেত দমন করা যায়। এ সত্য আরো পরিস্ফুট হয়েছে দেখি—এই চরিত্রের দেবতা মহাকালীতে যাঁর বীজমন্ত্র হচ্ছে ক্রীং—মা মহাকালীই তো ক্রিয়াময়ী।

॥ মধ্যম চরিত্র রহস্য ॥

মধ্যম চরিত্রে বা রূপে দেখি—মহিষাসুর ইন্দ্রকে সমস্ত দেবতা সমেত স্বর্গচ্যুত করে—নিজেই ইন্দ্র হয়ে বসেছে। একশো বছর যুদ্ধ করেছিল সে। এই মহিষাসুর হচ্ছে ক্রোধ—তার মহিষরূপের আবরণটাই হচ্ছে মদ। সেই ক্রোধের আক্রমণে ইন্দ্র বা প্রাণ পরাস্ত, বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তখন সমস্ত দেবতার একত্রিত শক্তি থেকে রূপলাভ করেন দেবী চণ্ডিকা। তিনি মহাঅসি বা খড়্গাঘাতে বিনাশ করেন মহিষাসুরকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খড়্গাই তো জ্ঞান—তা লাভ করতে হয় সর্ব দেবের একত্রিত শক্তি অর্থাৎ অনন্য মনে সাধনার দ্বারা। জ্ঞানের বলেই নিরাকৃত হয় ক্রোধ। যার জ্ঞান নেই, সেই পারে না ক্রোধকে দমন করতে। এ সত্যই তো প্রকটিত হয়েছে এই চরিত্রের দেবতা মহালক্ষ্মী থেকে। তাঁর বীজমন্ত্র হচ্ছে হ্রীং-মা মহালক্ষ্মীই তো হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, সর্বজ্ঞানের আধারস্বরূপা।

॥ উত্তর চরিত্র রহস্য ॥

সর্বশেষ চরিত্রে দেখি—শুম্ভ ও নিশুম্ভ মহাদম্ভে ত্রিলোকের সব কিছুই আত্মসাৎ করলো। আর্ত দেবতারা স্মরণ করলেন দেবীকে। তিনি দেখা দিতে শুম্ভ তো তাঁকেও নিজের আয়ত্তে আনতে চাইলো। কিন্তু দেবী তো মা অপরাজিতা—তাঁকে কে আয়ত্তে আনতে পারে? বাধলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। শেষে দেবী নিশুম্ভকে শূল ও খড়্গ সাহায্যে আর শুম্ভকে কেবল শূল সাহায্যেই বধ করলেন।

শুম্ভ আর নিশুম্ভই হচ্ছে লোভ আর মাৎসর্য। মনকে তারা নষ্ট করে। কাম-ক্রোধাদি গেলেও লোভের শেষ হয় না। তাই প্রয়োজন হয় ভক্তির। শূলই হচ্ছে সেই ভক্তি। কিন্তু মাৎসর্য কেবল শূল বা ভক্তিতে দূর হয় না, তাকে শেষ পর্যন্ত প্রহার করতে হয় খড়্গ বা জ্ঞান দিয়ে। মাৎসর্যহীন লোভ ভক্তির বা শূলের আঘাতেই শেষ হয়ে যায়। এ সত্যই প্রকাশ পেয়েছে এই চরিত্রের দেবতা মহাসরস্বতী থেকে। তাঁর বীজমন্ত্র হচ্ছে ঐং—মা মহাসরস্বতীই তো ঐক্যময়ী। কর্ম ও জ্ঞান সংহত করে তিনিই তো করেন ভক্তির বিকাশ।

॥ সাধনতত্ত্ব ॥

এই কাম, ক্রোধ আর লোভই হচ্ছে প্রত্যেকের জীবনের পরম শত্রু—এরাই ঘটায় সর্বনাশ। গীতায় তাই পাই—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং
দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্
তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—কাম, ক্রোধ, আর লোভ তিনটি হচ্ছে নরকের দ্বার—এই দ্বার দিয়েই আত্মনাশ বা নিজের সর্বনাশ ঘটে। তাই এদের ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

চণ্ডীর মধ্যে সেই তিনটিকে দমন করার পথই দেখানো আছে। সেখানে দেখি—মা আমাদের নরক থেকে উদ্ধার করার জন্যে সর্বদাই উদ্যত হয়ে আছেন—প্রণাম করি সেই মাকে—

শরণাগতদীনার্ত—
পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি
নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ॥

শ্রীশ্রীদশ মহাবিদ্যা রহস্য

ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু মাত্রেই প্রাতঃকালীন কর্তব্যরূপে দশ-মহাবিদ্যার এই স্তোত্রটি পাঠ করেন—

কালী তারা মহাবিদ্যা
যোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ
বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ
মাতঙ্গী কমলাত্মিকা ।
এতা দশমহাবিদ্যা
সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতা ॥

এই স্তোত্রটি সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথম তো মনে হয় দশ মহাবিদ্যা এই নামে কেন এঁরা খ্যাত? ওগুলি তো শাক্তদেবীর নাম—তবে কেন মহাশক্তি বা মহাদেবী বলা হলো না? সত্যই কি এঁদের সঙ্গে বিদ্যালাভের কোনো বিশেষ সম্বন্ধ আছে? তা যদি হয়, সে কী ও কতখানি? আরো দেখি, ওই স্তবের মধ্যে প্রথম চারটি যথা, কালী, তারা, যোড়শী ও ভুবনেশ্বরীকে মহাবিদ্যা বলা হয়েছে; পরের তিনটি যথা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা ও ধূমাবতীকে বিদ্যা; আর শেষের তিনটি যথা, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলাত্মিকাকে সিদ্ধবিদ্যা বলা হয়েছে—তারই বা কারণ কী? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো সব ক'টিকেই মহাবিদ্যা তথা সিদ্ধবিদ্যা বলেই মেনে নেয়া হয়েছে। তাই তো জানতে ইচ্ছে হয়, কিসের থেকে ওই নামগুলি এবং তার বিশেষণগুলি এলো?

॥ অথর্ববেদ ও তন্ত্র ॥

আমরা জানি, ঐ নামগুলি প্রচার করে গিয়েছেন তান্ত্রিক সাধকরা। কিন্তু তাঁরা কী ভাবে নামগুলি পেলেন, আর নামগুলির নিগূঢ় অর্থই বা কী? এ প্রশ্নের বিচার করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে যে—তন্ত্রকে "বিদ্যা" নামেই অভিহিত করা হয়, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বিদ্যার চর্চা করেই লাভ হয় অমৃতত্ব। আবার ঐ তন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে অথর্ববেদ —এ কথাও পণ্ডিতজনেরা স্বীকার করেন। দেখা যাক, অথর্ববেদের মধ্যে কোনো নির্দেশ পাই কি না ঐ দশ মহাবিদ্যা সম্বন্ধে। খুঁজতে গিয়ে দেখছি, অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকউপনিষদে প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ শ্লোকে 'কালী' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। সেই শ্লোকটি এই—

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ॥

এই শ্লোকটিতে পাচ্ছি, অগ্নির সাতটি জিহ্বার বা সাতটি শিখার নাম। কিন্তু অগ্নির সঙ্গে কি শক্তি বা দেবীর কোনো সম্বন্ধ আছে? হ্যাঁ, আছে। সেই শক্তি অগ্নিরূপেই আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে বিরাজমান—তাঁরি সাতটি ঊর্ধ্বশিখা আমাদের দেহের সপ্ত দ্বার দিয়ে প্রকাশ পায়। এখানে একবার স্মরণ করে নিই যে—তন্ত্রের সাধনার মূল হচ্ছে দেহতত্ত্ব। কাজেই এই দেহের কোন্ দ্বার দিয়ে সেই শক্তি বা অগ্নি আমাদের কী বিকাশ ঘটাতে চাইছেন, তার আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

এখন আগে একটু মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করি, বেদান্তের ঐ অগ্নির সপ্তজিহ্বার নামগুলির সঙ্গে তন্ত্রের মহাবিদ্যার নামগুলিকে। কালী নামটি তো উভয় ক্ষেত্রেই প্রকাশিত। করালী যে তারার অন্য নাম, তা সাধকরা জানেন। মনোজবা বলতে তো বোঝায়—মনকে যিনি দোলা দেন। তন্ত্রে তাঁকেই কি ষোড়শী বলা হয়েছে? সেই ষোড়শী বা ষোল বছরের কন্যার অন্য নাম তো শ্যামা, যাকে দেখলে প্রত্যেকেরই হয় কন্যাভাব, নয় পত্নীভাব আর না হয় মাতৃভাব বা ভগ্নীভাব মনে উদিত হয়—যার ফলে মনে দোলাও জাগে প্রচুর। সুলোহিতা বলতে বোঝায়, অতি রক্তিমবর্ণের নারী; তাঁর সঙ্গে তো ভুবনেশ্বরীর সাদৃশ্য পাই। কারণ ভুবনেশ্বরীর অপর নামই হচ্ছে জগদ্ধাত্রী—যাঁর বর্ণনা হচ্ছে "বালার্কসদৃশীং তনুং"। সুধূম্রাবর্ণার সঙ্গে যে ধূমাবতীর মিল আছে, তা বোধ হয় না বললেও চলে। স্ফুলিঙ্গিনীর সঙ্গে মাতঙ্গীকে মেলাতে কোনই অসুবিধা নেই। যখন অগ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গ বের হয়, তখন হস্তিশুণ্ডের মতোই তা অধিক বায়ু প্রকাশ করে। আর বিশ্বরুচী তো মনে হয় বগলামুখী। কারণ রুচির কথা ওঠে আহার সম্পর্কেই—সেই আহার তো মুখের ক্রিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ অগ্নির সপ্ত জিহ্বা ও সপ্ত মহাবিদ্যা ॥

সাতটি শিখার বা জিহ্বার নামের সঙ্গে সাতটি মহাবিদ্যার নামের সমতা পেলাম বটে, কিন্তু বাকি রইল আরো তিনটি মহাবিদ্যার নাম—এঁরা কারা ? মূল শ্লোকে এই তিনটির মধ্যে ভৈরবী আর ছিন্নমস্তাকে বিদ্যা, এবং কমলাত্মিকাকে সিদ্ধবিদ্যা নামে বিশেষিত করা হয়েছে। এঁদের পরিচয় জানা যায় কী করে ? আগেই বলেছি, তন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে দেহতত্ত্ব। সেই দেহতত্ত্ব বিচার করে যদি আমরা ঐ প্রথম সাতটি দেবীর অবস্থান জানতে পাই আমাদের শরীরের মধ্যে, বাকি তিনটিকেও চিনে নেবার সুযোগ পাব বলেই মনে হয়। দেখা যাক্, ওই সাতটি দেবীর সম্বন্ধে কী জানতে পাই।

॥ দেহতত্ত্ব ও সপ্ত মহাবিদ্যা ॥

দেহতত্ত্ব—যার সূত্রপাত হয়েছে অথর্ববেদে—আমাদের অষ্টচক্র ও নবদ্বার সম্বন্ধে চেতনা দিয়েছে। চক্রের কথা এখানে বিচার করার নয়—দ্বারের কথাই বিচার্য। আমাদের শরীরে যে ন'টি দ্বার বা রন্ধ্র আছে, তার সাতটি উর্ধ্বে আর দু'টি নিম্নে অবস্থিত। উর্ধ্ব সাতটি দ্বার হচ্ছে—দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র ও মুখগহ্বর। এই সাতটি দ্বার দিয়ে প্রকাশ পায় আমাদের অন্তরস্থিত শক্তি বা অগ্নির ক্রিয়া। সাধক মাত্রেই জানেন যে—সাধনমার্গে দক্ষিণকর্ণের স্থান হচ্ছে সর্বপ্রথম। তাই গুরু যখন শিষ্যকে মন্ত্রদান করেন—তা করেন শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে। কালীকেও সর্বদাই দক্ষিণা বলে উল্লেখ করা হয় শাস্ত্রে। তবে কি তিনিই আমাদের দক্ষিণকর্ণের অধিষ্ঠাত্রী ? এ কথা আরও এই কারণে মনে হয় যে—কালীর যে অক্ষরমালা জপ করতে হয়, তার নিয়ম 'অ' থেকে 'ক্ষ' অর্থাৎ বাম থেকে দক্ষিণে যাওয়া। আবার যে সমস্ত সাধক নাদশ্রবণের অধিকারী হয়েছেন, তাঁরাও ঐ দক্ষিণকর্ণেই তা শ্রবণ করেন। এর পরে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, 'তারা' হচ্ছেন আমাদের বামকর্ণের অধিষ্ঠাত্রী ; তাঁর অক্ষরমালাজপের নিয়ম হচ্ছে 'ক্ষ' থেকে 'অ' অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে বামে যাওয়া। এই তারার অপর নাম 'বামা', তাও সাধকরা জানেন। এই বামকর্ণেই ধ্বনিত হয় অন্তরের শব্দ—যা নাদের ওপরে অবস্থিত, যার নাম বিন্দু। কিন্তু এ তো হলো সাধনমার্গের কথা। অতি সাধারণ ক্ষেত্রেও দেখি, আমাদের সবায়ের জীবনে বিদ্যাশিক্ষার প্রথম পাঠ নিতে হয় শোনার ওপর নির্ভর করে। বেশী কথা কী বলব, সদ্যোজাত শিশুদেরও প্রথম প্রকাশ পায় শ্রবণশক্তি। কিন্তু সেই শব্দের কোনই রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই। তাই কালী ও তারা হচ্ছেন অবর্ণা—তাঁদের মূর্তি তৈরি করে পূজা সম্ভব নয়। কিন্তু এই দুই দেবীর কণ্ঠে মুণ্ডমালা আছে—তা পঞ্চাশৎ বর্ণ অর্থাৎ অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত অক্ষরেরই মালা 'পঞ্চাশদ্‌বর্ণমুণ্ডালি'। এই বর্ণগুলিকে বলা হয়—মাতৃকা।

॥ পূজা হয় কোন্ মহাবিদ্যার ॥

পূজা হয় তাঁদের—যাঁদের চোখে দেখা যায়, রূপ আছে যাঁদের, এঁরাই হচ্ছেন ষোড়শী বা শ্যামা আর ভুবনেশ্বরী বা জগদ্ধাত্রী। এঁরা দর্শনের বিষয়—এঁদের অধিষ্ঠান যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম চক্ষুতে। শ্যামা তো আমাদের মনোময়ী, হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে দোলা খান। তাই তাঁর রূপ নবঘনশ্যাম—যা দেখেই প্রাণ পুলকিত হয়। আর জগদ্ধাত্রী তাঁর রক্তিম রূপের ছটায় বিশ্বভুবন আলোকিত করেন, দূর থেকে আকৃষ্ট করেন আমাদের চিত্তকে। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, লোহিতবর্ণ ই বহুদূর থেকে আমাদের চোখে পড়ে। সারা পৃথিবীতে তাই লোহিতবর্ণ পতাকা বা আলোক পথ-চলাচলের নিয়ন্ত্রণে অপরিহার্য।

॥ মহাবিদ্যা নাম কেন ॥

এই দু'টি কান ও দু'টি চোখই তো আমাদের প্রত্যেককে শব্দ ও রূপ সম্বন্ধে সচেতন করে উত্তরোত্তর পরাজ্ঞানের পথে নিয়ে চলে। তাই কি কালী, তারা, ষোড়শী ও ভুবনেশ্বরী—এই চারিটিকে মহাবিদ্যা বলা হয়েছে? বিদ্যালাভের তো অন্য কোনো পথই নেই ওই চারটি ছাড়া। বাকী ছ'টি দেবী হচ্ছেন এঁদেরই সহায়ক—কী ভাবে তা, ক্রমেই বলছি। আর তাঁরা সহায়ক বলেই মনে হয় তাঁদেরকে বিদ্যা ও সিদ্ধবিদ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঐ মূল শ্লোকে—যদিও শেষে সবাইকে বলা হয়েছে মহাবিদ্যা, কারণ কোনো একটির অভাব ঘটলে আর পরাবিদ্যা লাভ করা সম্ভব হয় না।

॥ অবশিষ্ট মহাবিদ্যা কোন্ অঙ্গে অবস্থিত ॥

এখন দেখি, ওই বাকী ছ'টি দেবীর অধিষ্ঠান কোথায় আমাদের শরীরে? কর্ণ ও চক্ষুর অবস্থান তো আমাদের শরীরে প্রায় সমরেখাতেই। তার ঠিক নিচে রয়েছে দু'টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসারন্ধ্র। প্রাণায়ামের নিয়ম হচ্ছে—দক্ষিণনাসা রুদ্ধ করে বামনাসা দিয়ে বায়ু গ্রহণ করে কিছুক্ষণ আটকে রেখে, দক্ষিণনাসা দিয়ে ত্যাগ করা। দক্ষিণনাসাই কি ধূমাবতী? পুরাণে পাই যে, তিনি একবার শিবকে খেয়ে ফেলেছিলেন ক্ষুধার্ত হয়ে। কিন্তু শিব ধূম্ররূপে লোমকূপ দিয়ে বেরিয়ে যান। তাতেই তাঁর নাম হয় ধূমাবতী। বাস্তবিক পক্ষে, শরীরের মধ্যে বায়ুকে আটকে রাখলে—যাকে যৌগিক বা তান্ত্রিক ভাষায় বলা হয় কুম্ভক—বায়ু লোমকূপ দিয়ে প্রবাহিত হয়। ধূমাবতীর কাহিনীতে সেই বায়ুকে শিব নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর যেহেতু প্রাণায়ামে দক্ষিণনাসা রুদ্ধ করেই বায়ু গ্রহণ বা আহার করতে হয়, তাই মনে হয় যে—ধূমাবতীর অধিষ্ঠান হচ্ছে দক্ষিণ-নাসায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে—বামনাসাই হচ্ছে মাতঙ্গীর অধিষ্ঠান। সেই নাসা বন্ধ করে বায়ু ত্যাগ করার সময় তা হস্তীশুণ্ডবৎ ক্রিয়া করে। আমরা জানি, এই প্রাণায়াম যতো পুষ্ট হয়, আমাদের কর্ণ ও চক্ষু ততো ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

নাসারন্ধ্রের নিম্নেই রয়েছে আমাদের মুখগহ্বর। সেটিই যে বগলামুখীর অধিষ্ঠান, তার পরিচয় তো দেবী বগলার রূপকল্পনা থেকেই জানা যায়। সেই দেবী অসুরের জিহ্বা আকর্ষণ করে তার মাথায় মুগদর প্রহার করেন। এঁরই সহায়ক হচ্ছেন ভৈরবী যাঁর অধিষ্ঠান পায়ুতে, যাঁর অপর নাম গুহ্যবাসিনী। তিনি সুষুম্না নাড়ী বিকশিত হবার পথ করে দেন। সহজভাবে বললে বলা চলে যে, বগলা ও ভৈরবী হচ্ছেন আমাদের আহার ও বাক্যসংযমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আহার ও বাক্য সম্বন্ধে সচেতন ও সতর্ক না হলে কারও পক্ষে কোনো বিদ্যাই লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু দেবীকবচে পাই যে ভৈরবী রক্ষা করেন ভার্যা। ভার্যা শব্দ এসেছে ভরণ করার থেকে। পায়ুদ্বারের সম্বন্ধে অবশ্য মুণ্ডক নীরব—কিন্তু এও যে অত্যন্ত গণ্য দ্বার, তা বলাই বাহুল্য।

বাকী আছেন এখন কমলা ও ছিন্নমস্তা—এঁদের অবস্থান কোথায়? আগে তো আটটি দেবীর আলোচনায় আটটি দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী রূপে তাঁদের জেনেছি। কিন্তু দেহে তো আছে নবদ্বার। তাহলে কি কমলাত্মিকাই সেই নবম দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী? তাঁর যে রূপের প্রকাশ আছে—তাতে দেখি, দু'টি দিক্‌হস্তী দু'টি কুম্ভ থেকে অমৃতসিঞ্চন করছে তাঁর মাথায়। এর থেকেই কি আভাস পাওয়া যাচ্ছে না যে, দেবী কমলাত্মিকা উপস্থ-দ্বারের অধিদেবতা? আর তাঁর সহায়ক হচ্ছেন ছিন্নমস্তা—যিনি দশমদ্বার বা সহস্রার অধিষ্ঠাত্রী। যাঁরা আয়ুর্বেদচর্চা করেছেন তাঁরা জানেন, মস্তিষ্ক বা মস্তক থেকেই দেহী মাত্রেরই বীর্য উদ্ভূত হয়, আর তার শেষ সঞ্চয়স্থান অণ্ডে। ওই অণ্ড দু'টিকেই কি দু'টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুম্ভরূপে কল্পনা করা হয় নি? আর দেবী ছিন্নমস্তা তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তারি প্রতি কি সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন না? তাইতো মনে হয় যে, দেবী কমলা ও ছিন্নমস্তা প্রকাশ করেছেন যে, বীর্যসঞ্চয় করার ফলেই বিকশিত হয় সহস্রার পদ্ম, উন্মুক্ত হয়ে যায় সেই দশম দ্বার – যার ফলে সাধক মুক্তিলাভ করেন।

॥ সাধনতত্ত্ব ॥

এতোক্ষণ যা আলোচনা করা গেল, তা আর একটু বিশদ করে বলতে গেলে এই পাই যে—কালী ও তারা আমাদের আন্তর ও বাহ্য শ্রবণশক্তিকে বিকশিত করেন; সেই ভাবে ষোড়শী ও ভুবনেশ্বরী আমাদের আন্তর ও বাহ্য দর্শনশক্তিকে বিকশিত করেন। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন আমাদের তিনটি পথ—বায়ু, স্থল ও জল। তা যথাক্রমে রক্ষা করেন ধূমাবতী-মাতংগী, বগলা-ভৈরবী ও কমলা-ছিন্নমস্তা। তাই এঁরা সকলেই হচ্ছেন মহাবিদ্যা—এঁদের সবায়ের কৃপায় সাধক লাভ করেন পরাবিদ্যা ও সর্বার্থসিদ্ধি।

এঁরা যে সকলেই বিদ্যা তার একটি কথার প্রমাণ এই যে—কালীর গলার মুণ্ড-মালাটি হচ্ছে আসলে পঞ্চাশটি অক্ষর স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়ে, তা আগেই বলেছি। আবার বিভিন্ন তন্ত্র ও সংহিতার মধ্যে জানতে পাই – প্রত্যেক মানুষের দেহে কোন স্থানে কোন কোন অক্ষর সন্নিবিষ্ট—এতো তাই সবই বিদ্যার ব্যাপার। ঐ মহাবিদ্যারা যে ভাবে সবাইকে সাহায্য করেন, তার কথা ভাবতে গেলেই জেগে ওঠে এই গানখানি —

দক্ষিণে শুধু শুনিব রে কালী
বামে শুনিব রে তারা।
তখনি জানিব কূল পেয়েছে রে
আমার জীবন-ধারা॥
দেখিব ষোড়শী দক্ষিণ ভাগে
ভুবনেশ্বরী বামে মোর জাগে
পরাৎ শ্রবণে পরা দর্শনে
হয়ে যাব আমি হারা॥

০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথ করে দেবে মোরে ধূমাবতী
মিলে মাতঙ্গী সাথে।
সেই বায়ুপথে অবাধে যাব রে
চলে চলে দিনেরাতে ॥
স্থলপথ দেবে ভৈরবী মোরে
বগলামুখীর সনে দিশা ধরে
জলপথে লবে ছিন্নমস্তা
কমলাত্মিকা সারা ॥

[ভৈরবী—একতালা]

॥ সমাপ্ত ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi